তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

প্রথম ভাগ।

১৮২৯ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৪। সম্বৎ ১৯৬৪। কলিগতাব্দ ৫০০৮। ১ চৈত্র শনিবার।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

বৈশাখ ৭৬৫ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৭৬৬ সংখ্যা।

আষাঢ় ৭৬৭ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৭৬৮ সংখ্যা।

ভাদ্র ৭৬৯ সংখ্যা।

আশ্বিন ৭৭০ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৭৭১ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৭৭২ সংখ্যা।

পৌষ ৭৭৩ সংখ্যা।

মাঘ ৭৭৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৭৭৫ সংখ্যা।

চৈত্র ৭৭৬ সংখ্যা।

অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালের প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং, তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্‌গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠা-পড়া, কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি, কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাত-চিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি-না। সংসারের অনন্ত চলাচল, অনন্ত কোলাহলের মর্ম্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। যিনি শান্তং, তাঁহারই আনন্দমূর্ত্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই "শান্তং" যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কি উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতি ক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকা-

ময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কি করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড় করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানাদিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এপথে একবার ওপথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া, সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে, তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তিত মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি ত লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সঙ্গীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতু-সংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায় তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্ত্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্ত্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞলোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্ত্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি এই সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্ম্মের মধ্যে পরিণামটা কি। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে· তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শাক্তরূপে বিভীষিকা, 'শান্তং' তাহাকেই ফলে ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্য্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত।

তাহা ধাত্রীর মত নিখিলজগৎকে অনাদি-কাল হইতে অনিদ্রভবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলি-তেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষ-যোজনদূরবর্ত্তী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে না-ড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারো পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার, এক বিরাট্ কলেবররূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ, তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি, সেই পালনী শক্তি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, সকলেরই মধ্যেই "শিবং" শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ সকল ভার এক মুহূর্ত্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত! যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহ-তারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে,যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট্ প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মত নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেম্‌নি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখি-লের সকল আকর্ষণ, সকল সম্বন্ধ, সকল কর্ম্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া, নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেম্‌নি কর্ম্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্ম্ম-সমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালমন্দের দ্বন্দ্ব, দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভকর্ম্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ্ ক্ষোভ-বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে নিজের অপরাজিত হৃদ-য়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনি জগতের সকল কর্ম্মের, সকল উত্থান-পতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং, যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব, সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক্ করিয়া, বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু ত সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা ত চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপ-রিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে ত একটা ব্যবহা-

রিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে ত প্রতিমুহূর্ত্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে ত আমরা এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে ত কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন ত একেবারে পিষিয়া যায় না? কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকেই, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদান-প্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই, তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটবড় বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেই-জন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথক্‌রূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়—খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক্। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ, মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে, সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই সেই জন্য তাহাতে দুঃখ দেই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকেই যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেই জন্য স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে শান্তকে, শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্য্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে

কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্য্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কত ভয়, কত সংশয়, কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তি-রূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষন পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে স্থলে-আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদি অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম অশ্রম ব্রহ্মচর্য্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালমন্দ, যত পাপপুণ্য, যত আঘাত প্রতিঘাত। শান্তি যেমন নানা শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়—তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎ প্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানব-সমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসঙ্কুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসঙ্কুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্ম্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ,—প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্ম্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্ম্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও ত তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্ব্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্ম্মের সাধনায় যখন কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহঙ্কারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্ম্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসঙ্গত, অসমাপ্ত, অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও, আমাদের দুঃখের মধ্যেও, আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্ব্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে,

আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া হে অন্তর্যামিন্ আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ কর যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের উপাসনা।

আমারা প্রতি সপ্তাহে এই সমাজ মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সম্মিলিত হই—ঘরে ঘরে প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহার উপাসনা করি। এই উপাসনা কিসের জন্য? ইহার অর্থ কি? তাৎপর্য্য কি? এই বিষয়ে আজ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ইহা বলা আবশ্যক যে ঈশ্বরের উপাসনা বক্তৃতার বিষয় নহে—সাধনার জিনিস; জ্ঞানের কথা নহে, ভাবের উচ্ছ্বাস।

প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চনের গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহরে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে,
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি
যে জন যায় নাহি ফেরে।

ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে চাওয়া, তাঁর ভাবের ভাবুক হওয়া, তাঁর ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছাকে মিলিত করা, এই তাঁহার উপাসনা। কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী হওয়াই তাঁর উপাসনা। সকল ঘটনাতে তাঁর হস্ত দেখা—তাঁর নিকট সুখ দুঃখ নিবেদন, পাপ বিমোচনের জন্য তাঁর নিকট ক্রন্দন—তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ; তাঁর যা আদেশ আমার তা কর্ত্তব্য, যাহা কর্ত্তব্য তাহাতেই আমার আনন্দ, এইরূপে তাঁহার সহিত আত্মার সম্পূর্ণ যোগই তাঁহার উপাসনা। সুখের সময় সেই সর্ব্বসুখদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দুঃখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর—এই তাঁহার উপাসনা। আমরা অতি দুর্ব্বল; আপনার উপরেই নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। আপনার বুদ্ধিবলে, আপনার পুণ্যবলে, আমার জীবনের পরমলক্ষ্য সম্পন্ন করিতে পারি না। "যখন আপনাকে এই প্রকার ক্ষীণ, হীন, মলিন মনে হয়, তখন স্বভাবতই আমাদের আশ্রয়দাতা পিতাকে আহ্বান করি, তখন তাঁর প্রতি আমাদের সমুদয় নির্ভর যায়, তখন আপনাকে নিতান্ত অনন্য গতি জানিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি। তখনই তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা যায়, আমার ক্রন্দন যায়। তখন দেখিতে পাই, তিনিই আমার আশা, তিনিই আমার ভরসা, তিনিই আমার একমাত্র নির্ভরের স্থান। তখন আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা সহজে উদয় হয় "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও;" এই আন্তরিক নির্ভরের ভাবের প্রকাশই উপাসনা। এক কথায় ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের আত্মার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস—তাহাই উপাসনা।

সহজেই ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুহুরে করে পঞ্চমান—
মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী,
মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

উপাসনার সময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। ঈশ্বর যিনি অতীন্দ্রিয় নিরাকার তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা কঠিন এ কথা সত্য; অব্যক্তের উপাসনা দেহধারীর পক্ষে অতি কষ্টকর—এই যে গীতার বচন ইহা ঠিক—কিন্তু যদিও ইহা বহু সাধনা সাপেক্ষ তথাপি ইহা না হইলেই নয়। বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব নহে—মৃত ব্যক্তির সহিত কি কখন কাহারো আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয়?

উপনিষদ বারম্বার উপদেশ দিতেছেন—

তমাত্মস্থং যে হনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

তাঁহাকে যখন আমরা নিকটস্থ, আত্মস্থ করিয়া দেখি, তখন আমাদের পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহ, পাপের ভয় হয়—তখন তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

ঈশ্বরের এই যে উপাসনা ইহা মৌখিক, বাহ্যিক নহে—মৌখিক উপাসনায় কোন ফল নাই। উপাসনার সময় অকপট সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে হয়। ছদ্মবেশে মানুষ ভুলিতে পারে কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের কাছে মুখে এক মনে এক, এরূপ কপটতা রক্ষা পায় না।

এইরূপ উপাসনার জন্য যখন আমরা প্রস্তুত হই তখন অতীতের জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে পাপ প্রবৃত্তি দমন করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বল প্রার্থনায় আত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে দিবাবসানে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এখানে আসিয়াছি আমাদের মনে কি ভাব উদয় হইতেছে? অতীত দিবসের জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনাকে কি ক্ষুদ্র মনে হয়—আপনার প্রতি কতই ধিক্কার উপস্থিত হয়। দেখিতে পাই আমার যে মহান্ আদর্শ তাহার কত নীচে পড়িয়া আছি! যে চিন্তা মনে স্থান দিবার নহে তাহা দিয়াছি, যে বাক্য বলিবার নহে তাহা বলিয়াছি—যে কর্ম্ম করিবার নহে তাহা করিয়াছি। প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছি—প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছি, এই ত আমাদের হীনদশা! তাই এখন ঈশ্বরকে ডাকিতেছি—

আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
প্রভু না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।

হে প্রিয়মিত্র! এই করুণাগুণে যদি ভবিষ্যতে তোমার চিরপোষিত পাপ প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে পার—যদি বিষয়ের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তোমার অন্তরের সাধু প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পার, তোমার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে বল পাও, সাহস পাও, উৎসাহ পাও, তবে তোমার উপাসনার ফল ফলিয়াছে বুঝিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে মহাকবি সেক্সপিয়রের Hamlet নাটকের একভাগ উল্লেখ যোগ্য মনে করিতেছি।

আপনারা অনেকে ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটক পড়িয়া থাকিবেন। তার গল্পটা সংক্ষেপে এইঃ—হ্যামলেটের পিতা ডেনমার্ক দেশের রাজা ছিলেন।

হ্যামলেটের পিতৃব্য Claudius আপনার ভ্রাতাকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছেন—মৃত রাজার মহিষীকে—আপন ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতেছেন। এই সূত্রে রাজা আর রাজকুমার হ্যামলেট—ইঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বাদবিবাদ চলিতেছে। রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন হ্যামলেটকে দেশান্তরে নির্ব্বাসিত করিবেন—রাজকুমার ও একটা সুযোগ খুঁজিতেছেন, কখন্ রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। এই সুযোগ উপস্থিত। রাজা প্রাসাদের এক ঘরে আছেন—হ্যামলেট গিয়া দেখেন তিনি তখন পূজায় ব্যস্ত। তাই তাঁর নিজের অভিসন্ধি হইতে বিরত হইলেন—ভাবিলেন ও অবস্থায় হত্যা করাটা ঠিক হয় না, কেন না উহাতে হতব্যক্তির পরকালে সদ্গতি হইবারই সম্ভাবনা। এদিকে রাজা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন—সেই সময়ে তাঁহার মনে যে নানা ভাব তরঙ্গিত হইতেছে নাটকে তার একটি সুন্দর চিত্র আছে—এটি আমার আলোচিত বিষয়ের উপযোগী তাই আপনাদের শোনাইবার ইচ্ছা করিতেছি। মূল এবং বাঙ্গলা অনুবাদ দুই বলিব। যাঁরা মূল ভাষা না জানেন তাঁহারা অনুবাদে তার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রাজার আত্মপরীক্ষার বর্ণনা এইরূপ :—

রাজার আত্মগ্লানি।

হায় কি বিষম পাপ দহিছে আমায়!
পূতিগন্ধ উঠে তার স্বর্গ অভিমুখে।
সৃষ্টির আদিমকালে পড়ে অভিশাপ
যার পরে—ভ্রাতৃহত্যা!—সেই মহাপাপ।
প্রভুপদে এ বেদনা চাহি নিবেদিতে—
কিন্তু নাহি পারি। ইচ্ছা যতই প্রবল,
অপরাধ গুরুতর রোধে তার বেগ।
দুনৌকায় পদক্ষেপে উভয় শঙ্কট
উপস্থিত! কোন্ দিকে যাই—নাহি জানি;
কোন দিকে নাহি গতি—দাঁড়াই স্তম্ভিত!
ভ্রাতৃরক্ত-কলঙ্কিত এই পোড়া হাতে
পড়ে যদি আরো ঘোর কলঙ্ক-কালিমা,
কি তাহাতে? নাহি কি রে স্বর্গের অমৃত
ধারা হেন, হয় যাহে কলঙ্ক-মোচন?
তুষার-ধবল পুন? প্রভু কৃপাগুণে
কি না হয় ভবে? পাপভয় পরিহরি
পাপী যদি তার গুণে তরিয়া না যায়,
কিসের সে? প্রার্থনার বলই বা কিসের,
দ্বিবিধ কি নহে তাহা? পাপের আশঙ্কা হেরি
হয় তাহা আগু হতে করে সাবধান,
নহে ত পতিত জনে তাঁর ক্ষমাগুণে
করে পরিত্রাণ। চাহ তবে মুখ তুলি,
অপরাধ এ আমার হয়েছে মার্জ্জনা।
কিন্তু হায়! কি কথায় করি এ প্রার্থনা?
"ক্ষম প্রভু ভ্রাতৃহত্যা-অপরাধ মোর"?
বিহিত প্রার্থনা এ কি? নহে তা সম্ভব।
যে উদ্দেশে হত্যা এই করেছি সাধন—
ঐশ্বর্য্য-আকাঙ্ক্ষা, রাজ্য, মহিষী আমার,—
সকলি রয়েছে মোর ভোগে। হায়, হায়,
মার্জ্জনা কেমন পাব ভুঞ্জি পাপ ফল?
পঙ্কিল সংসার স্রোতে দেখা যায় বটে,
অর্থবলে ধর্ম্ম কভু হয় পরাহত;
অন্যায় অর্জ্জিত যাহা, সেই অর্থ দানে
অপরাধী বিচার কিনিয়া লয় কভু;
সে বিচারে চোর হয় সাধু বলে গণ্য।
হোথা ওসবার কিন্তু ব্যর্থ মন্ত্রবল।
সেই যে অন্তরযামী তাঁর ন্যায়াসনে
ছলনার নাহি ফল। নিজ মূর্ত্তি ধরি
করম যাহার যাহা হয় প্রকাশিত;
এমন কি, অপরাধী আপন বিপক্ষে
আপনিই দেয় সাক্ষ্য তন্ন তন্ন করি।
কি রহিল তবে? অনুতাপ—অনুতাপ—
কি না হয় অনুতাপে? কিন্তু কি উপায়,
অনুতাপ অণুমাত্র মনে নাহি যবে?
হায়, হায়, একি দশা হলরে আমার!
মৃত্যুর কালিমাপূর্ণ রে দগ্ধ হৃদয়!
রে প্রমত্ত মন মম, বিহঙ্গম যথা
পলাবার তরে করে যতই প্রয়াস
জালে তত পড়ে জড়াইয়া, ওরে সেই
দশা তোর!
দেবতারা রক্ষা কর দীনে।

শেষ চেষ্টা করি দেখি কি হয় এবার।
আড়ষ্ট এ জানু মোর হোক্ অবনত!
হৃদয় বজ্র-কঠিন, হোক্ তাহা এবে
কোমলাঙ্গ নবজাত শিশুর সমান!
পূর্ণ হোক্ মোর মনস্কাম! শুভমস্তু।
উর্দ্ধে উঠে বাণী মম, ভূতলে পড়িয়া রহে মন,
না যায় প্রভুর কাছে, অন্যমনা শূন্য সে বচন।

HAMLET ACT III.

(Seen III.)

Oh' my offence is rank, it smells to Heaven;
It hath the primal, eldest curse upon't—
A brothar's murder.—Pray can I not!
Though inclination be sharp as t'will,
My stronger guilt defeats my strong intent,s
And like a man, to double business bound,
I stand in pause where I shall first begin,
And both neglect. What if this curse d hand,
Were thicker than itself with brother's blood?
Is there not rain enough in the sweet heaven
To wash it white as snow? Whereto serves mercy,
But to confront the visage of offence?
And what's in prayer but this two-fold force—
To be forestalle'd ere we come to fall
Or pardon'd being down? Then I'll look up—
My fault is past.—But oh what form of prayer
Can serve my turn? "Forgive me my foul murder?"
That cannot be, since I am still possess'd
Of those effects for which I did the murder—
My Crown, my own ambition and my Queen—
May one be pardon'd and retain the offence?
In the corrupted currents of this world,
Offence's gilded hand may shove by justice,
And oft 'tis seen, the wicked prize itself
Buys out the law. But 'tis not so above;
There's no shuffling, there the action lies
In its true nature. and we ourselves compell'd,
Even to the teeth and forehead of our faults,
To give in evidence—What then? What rests?
Try what repentance can and what can it not?
Yet what can it when one cannot repent?
O wretched state! O bosom black as death!
O lime d soul, that struggling to be free,
Art more engaged! Help angels! Make assay!
Bow stubborn knees, and heart, with strings of steel,
Be soft as sinews of the new-born babe!
All may be well—
My words fly up, my thoughts remain below,—
Words, without thoughts, never to Heaven go.

আমরা এই নাট্যাংশ হইতে কি উপদেশ পাইতেছি? প্রথম এই, যে মৌখিক বাহ্যিক প্রার্থনার কোন ফল নাই। প্রার্থনা হইতে যদি কোন ফল প্রত্যাশা কর তবে সরল হৃদয়ে, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করা চাই। মুখে এক, মনে এক, এরূপ কপট ব্যবহারে লোকে ভুলিতে পারে কিন্তু সেই অন্তর্যামী পুরুষকে ভোলান যায় না।

আর কি, না প্রার্থনার ফল দুইপ্রকার। হয় তাহা প্রলোভন সম্মুখে দেখিয়া আগেই আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, নয় ত পাপে পড়িবার পর ঈশ্বরের ক্ষমাগুণে পতিতকে উদ্ধার করে। কিন্তু আমরা সেই ক্ষমার কখন্ অধিকারী হই? শুধু মৌখিক অনুতাপে নহে—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ হইতে বিরত হওয়া এবং পাপের ফলত্যাগ করা—ইহা ব্যতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, অনুতাপ কখনই ফলদায়ী হয় না। ইচ্ছানুরূপ পাপের ফলও ভোগ করিব, ক্ষমা ও লাভ করিব, ইহা কখন সম্ভবে না।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমার দর্শন লাভের জন্য তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। যদি তোমায় আমায় কোন ব্যবধান থাকে তাহা উন্মোচন কর। যদি তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন উপদেবতাকে পূজা করিয়া থাকি, লোভে পড়িয়া কাহারো প্রতি অন্যায় করিয়া থাকি, স্বার্থসাধনের জন্য পরপীড়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, লোকভয়ে ধর্ম্ম বিমুখ হইয়া থাকি, কুৎসিত কার্য্যে এই জীবনের উপর কলঙ্ক আনিয়া আপনি আপনার বিনাশ করিয়া থাকি, তবে হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! তুমি তাহার বিচার কর। আমরা যদি তোমার নিকটে অপরাধী হই, তবে আমাদিগকে সহস্র দণ্ড দাও কিন্তু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। যাহাতে এই সকল পাপ তাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারি এরূপ বল দেও। তুমি বল দেও, বীর্য্য দেও, ধৈর্য্য শিক্ষা দেও, ক্ষমা শিক্ষা দেও। আমরা যেন তোমার প্রসাদে নবজীবন লাভ করিয়া তোমার পুণ্য পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি, এইরূপ অনুগ্রহ কর।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দেও হে।
হীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্য সদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দেও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হতে
শান্তির ক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ তোমাতে মোর নূতন জনম
দেও হে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শিখ-ধর্ম্ম।

ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইয়ত্তা নাই। আজ আমরা শিখগুরু বাবা-নানকের ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষেপ আভাস দিব। বাবা-নানক লাহোরের সান্নিধ্যে রাবিতীরে টালবন্দী গ্রামে ক্ষেত্রী বংশে ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার বাস করিতেছিলেন, একদিন নদীস্নানে গমন করিলে, কথিত আছে, অকস্মাৎ দেবদূত কর্ত্তৃক ভগবানের সম্মুখে নীত হন এবং তাঁহারই নিকট হইতে দৈবজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। ঈশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া নানক স্ত্রীপুত্র সকলই পরিত্যাগ করিয়া মর্দ্দানা নামক জনৈক অনুচর লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহার ফকিরী জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না ঘটিলেও তাঁহার নাম—তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবে। সম্রাট বাবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিলে, বাবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। শিখ অর্থাৎ শিক্ষার্থী এই উপাধি নানক তাঁহার মতাবলম্বিগণকে প্রদান করেন। শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থের বহুল অংশ নানকের রচনা। তাঁহার রচিত জপু বা জপজি ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষে অতীব মনোরম। ভাষাকে সমুন্নত করিবার জন্য নানকের প্রাণগত চেষ্টা ছিল। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন, নানকের রচনার সহিত অন্যান্য সাধুগণের উক্তি সংযোজিত করিয়া যে আকারে শাস্ত্র প্রকাশ করেন,তাহাই আদি-গ্রন্থ বলিয়া বিদিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে নানক কর্ত্তারপুরে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই ১৫৩৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পঞ্জাবী ভাষায় আদিগ্রন্থ লিখিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র সমান নহে। পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত-অংশে ভাষার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই আদিগ্রন্থে দুই-

জন মারহাট্টা কবির রচনা দেখিতে পাওয়া যায়; উহাঁদের নাম নামদেব ও ত্রিলোচন। কবির ও ফরিদের অনেক অমূল্য উক্তিও এই আদি-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। নানক-প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মের সঙ্গে গোবিন্দ বা দশম-গুরু গোবিন্দ সিংহের নামের ঘনিষ্ঠতম যোগ। গোবিন্দের বয়স ১৫ বৎসর, যখন তাঁহার পিতা সম্রাট আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্দয়-রূপে নিহত হয়েন। বালক গোবিন্দ পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করিয়া শিক্ষা-লাভ করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে পার্শী হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। ৩০ বৎসর বয়স হইতেই তিনি অদম্য-উৎসাহ প্রখর বুদ্ধি ও স্থির লক্ষ্যের সহিত সমগ্র বিচ্ছিন্ন শিখ-সমাজকে ঐক্যে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি নিজে বীর ও অস্ত্রনিপুণ ছিলেন। পঞ্জাবে কিসে মুসলমান শক্তির ধ্বংস হয়, কিসে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ সাধিত হয়, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে শিখ-গণ নেতৃত্বে স্বীকার করিল। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষার জন্য গোবিন্দ নয়না-দেবীর পর্ব্বতে গমন করিলেন। গোবিন্দের ভক্তি ও ঐকান্তিকতা দৃষ্টে প্রসন্ন হইয়া, কথিত আছে, দেবী তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া নররক্ত চাহিলেন। গোবিন্দ মনুষ্য শোণিতে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া শিখগণকে সামরিক জাতিতে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন, ও সকলকে পাহুল বা দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। জলে শর্করা গুলিয়া তরবারির অগ্রভাগ দিয়া আলোড়িত করিয়া ঐ জল দীক্ষার্থীর দেহ-মস্তকে সিঞ্চন করিয়া ও কিয়দংশ তাহাকে পান করাইয়া জপজি হইতে-অংশ বিশেষ পাঠান্তে দীক্ষা কার্য্য সমাধা হইত। দীক্ষান্তে গুরু-শিষ্য উভয়-কেই "ওয়া গুরুজি কি খালসা" "গুরু অর্থাৎ ঈশ্বরের খালসার জয় হউক" একথা সজোরে উচ্চারণ করিতে হইত। (খালসা শব্দের অর্থ ডাক্তার ট্রুপের মতে সাধারণ তন্ত্র (common wealth.)।

গুরু-গোবিন্দ প্রথমতঃ পাঁচ জনকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, এই পাঁচ জন মিলিয়া যে মণ্ডলী হইল, ইহার ভিতরে আমার আত্মা বিচরণ করিবে। তিনি দীক্ষা দিয়া নিজেকে দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন এবং নিজে দীক্ষিত হইয়া স্বয়ং সিং এই উপাধি গ্রহণ করি-লেন।

নানক-প্রবর্ত্তিত শিখ-ধর্ম্মকে নিজমতের অনুরূপ করিয়া লইবার জন্য এক্ষণে গুরু-গোবিন্দের প্রয়াস হইল। "আদি গ্রন্থ" এই সময়ে গুরু রামদাসের বংশাবলীর নিকট কর্ত্তারপুরেই থাকিত। গুরু-গোবিন্দ ঐ আদি-গ্রন্থ তাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজ-মত উহাতে সংযোজিত করিতে চাহিলে অদিগ্রন্থরক্ষকেরা কিছু-তেই সম্মত হইল না। অধিকন্তু যখন তাহারা বুঝিল যে নানক-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে ইতর-লোক-সকলকে আনি-বার চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহারা গোবিন্দকে গুরু বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিল। বলিল যদি গোবিন্দ গুরু হইতে চাহেন, তিনি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিতে পারেন। গোবিন্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্রন্থ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজমত ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে হিন্দী কবিগণের সাহায্যে শাস্ত্রাকারে প্রকাশ করিলেন। বাবা-নানকের প্রবর্ত্তিত মত বিপর্য্যস্ত বা পরিবর্ত্তিত করা গুরু-গোবিন্দের অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু শিখজাতিকে উত্তেজিত

করিয়া মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে এক সামরিক-জাতি গঠন করাই গুরু গোবিন্দের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

গুরু-গোবিন্দের অনুচর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অচিরে খাঁগ্রা শৈলের রাজপুতগণ তাঁহাকে আনন্দপুরের নিকট আক্রমণ করিল। যুদ্ধে তাঁহার পুত্র অজিত সিং ও জোহার সিং নিহত হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ-প্রেরিত সৈন্য আসিয়া গুরু গোবিন্দকে আনন্দপুর হইতে বিতাড়িত করিল এবং তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া আরঙ্গজেবের আদেশ ক্রমে সিরহিন্দ নগরে মৃত্তিকাগর্ভে জীবন্ত প্রোথিত করিল। কিন্তু ধন্য গুরু গোবিন্দ! তিনি টলিবার নহেন। তিনি তখনও শতদ্রু নদীর দক্ষিণ-তীরে মরুভূমির মধ্যে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ইহার পরে গোবিন্দ পাতিয়ালার অন্তর্গত টালবন্দীতে আসিয়া স্থিতি করিলেন, এবং হিন্দুদিগের বারাণসী তীর্থের ন্যায় টালবন্দীকে পবিত্র স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এই টালবন্দীতে অনেক প্রসিদ্ধ গুরুমুখী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাটিণ্ডা ও আর একটি পবিত্র-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

গুরু-গোবিন্দ এক্ষণে রাজা। তাঁহার কর্ম্মচারীগণ রাজস্ব আদায়ে বিব্রত। অনেক অলৌকিক-কার্য্য এক্ষণে তাঁহাতে আরোপিত। গোবিন্দসিং সিরহিন্দ দিয়া আনন্দপুরে চলিলেন। গোবিন্দের পুত্রদ্বয়ের নির্দ্দয় হত্যার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ সিরহিন্দ ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলে গোবিন্দ সিং অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি ঐ নগরকে অভিসম্পাত দিয়া কহিলেন, যখনই তোমরা গঙ্গাস্নানে গমন বা তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, প্রত্যেকে ঐ নগর-প্রাচীরের দুইখানি ইষ্টক সতলজ বা যমুনা জলে নিক্ষেপ করিবে। পাদচারী যাত্রিগণ অদ্যাপিও গুরু-গোবিন্দের ঐ আদেশ পালন করিয়া থাকে।

কি কারণে বুঝা যায় না, গুরু-গোবিন্দ তাঁহার নিজ পূর্ব্ব আচরণের বিরুদ্ধে শেষ-জীবনে সম্রাট বাহাদুরসাহের অধীনে—মুসলমানেরই চাক্রী স্বীকার করিয়া,তাঁহারই নির্দ্দেশে জনৈক সেনানীরূপে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। ঐ খানেই তাঁহার জীবনে যবনিকা-পাত হইল। একজন আফগানকে তিনি ইতিপূর্ব্বে নিহত করিয়াছিলেন। তাহারই জনৈক আত্মীয়ের হস্তে ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭০৮ অব্দে গোদাবরী তীরে নাদের নামক স্থানে অতর্কিতভাবে তিনি নিহত হইলেন। ঐ স্থান আবচাল নগর বলিয়া খ্যাত ও শিখ-তীর্থে পরিণত। আবচাল শব্দের অর্থ প্রস্থান বা তিরোভাব।

শিখদিগের নিকটে আদি-গ্রন্থ বেদের ন্যায় শ্রদ্ধেয়। কবিরপ্রমুখ অনেক ভক্তের উক্তি হইতে বাবা-নানক বহুল পরিমাণ সত্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানকের জীবনের ব্যাপক-কাল বৈরাগ্যে কাটিয়াছিল। গুরু-গোবিন্দের ভাব কতকটা রাজ্য ও রাজনীতির দিকে ; কিন্তু নানকের দৃষ্টি ধর্ম্মের দিকে চরিত্রের উৎকর্ষতার দিকে ও একেশ্বরবাদের দিকে এবং ভ্রান্ত-সংস্কার ও বহুদেবতাপূজার প্রতিকূলে। বাবা-নানক প্রকৃত পক্ষে একজন উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন।

গুরুভক্তি দান ও নিরামিষ-ভোজনে অনুরাগ, এবং মিথ্যা-কথন ব্যাভিচার ক্রোধ লোভ স্বার্থপরতা ও অনাস্তিকতায় বিরাগ আদি-গ্রন্থের বিশেষত্ব। সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগ নানকের মতে তাদৃশ ফলপ্রদ নহে; সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনেই মহত্ত্ব। তাঁহার মতে বাহ্যিক

অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম নাই, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম অন্তরে।

উদাসী ও অকালী নামধেয় বৈরাগী সম্প্রদায় শিখদিগের ভিতরে পরে আবির্ভূত হইয়াছিল। আদি-গ্রন্থ যদিও ব্রাহ্মণজাতির অভিমানের বড় অনুকূল ছিল না, তথাপি উহা জাতি-ত্যাগ সাক্ষাৎভাবে ঘোষণা করে নাই। জাতিনির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই ধর্ম্মে অধিকার দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নানক-ধর্ম্ম নিজ উচ্চ-আদর্শে ও জ্ঞানের আধিক্যে পৃথিবীর উন্নততম ধর্ম্ম সকলের ভিতরে স্থান পাইবার অধিকারী। নানকের নৈতিক জীবনে ও শিক্ষায় বুদ্ধদেবের ভাবের ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

বাবা-নানক বলিতেন "ঈশ্বর এক, কাহাকে আর দ্বিতীয় বলিব; সকলের ভিতরেই অকলঙ্ক এক। হিন্দু ও মুসলমানের পন্থা দুই অর্থাৎ বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। সেই এক ঈশ্বরকে ব্রহ্ম হরি রাম গোবিন্দ যাহাই বল, তিনি জ্ঞানের অতীত অদৃশ্য অকৃত ও অনন্ত। প্রকৃত সত্তা এক তাঁহারই। তিনি আদিকারণ, মনুষ্য ও জগৎ এই সকলই তাঁহা হইতে বাহির হইয়াছে। শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি নহে। তিনি আপনাকে অনন্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। আদিগ্রন্থে আছে—

১। সেই এক সকলেতেই বিস্তারিত হইয়া সকলকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকেই দেখি, দেখি তিনি।

মায়া-ভ্রমে সকলে বিভ্রান্ত। দুই একজনেই প্রকৃত-সত্য বুঝিতে পারে। সবই গোবিন্দ—সবই গোবিন্দ। গোবিন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। যেমন একটি সূত্র শতসহস্র (beads) দানার ভিতরে থাকে, তিনি তেমনি সকলেরই ভিতরে রহিয়াছেন।

২। জলের তরঙ্গ কখনই ফেনা বুদ্‌বুদ্ বিরহিত হইতে পারে না।

৩। এই যে জগৎ—ঈশ্বরেরই লীলা; তিনি ক্রীড়া করিতেছেন, তিনি অন্য হন না।

নানক বহুদেবদেবী পূজার বিরোধী হইলেও বলিতেন, ক্ষুদ্র দেবতারা সেই ভূমা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। যাহাতে আর জন্মাইতে না হয়, তাহারই জন্য চেষ্টা কর। নানকের প্রচারিত বৈদান্তিক ভাবে ও গুরু-গোবিন্দের মতে সামান্য পার্থক্য আছে। বহু-ঈশ্বরবাদের দিকে গোবিন্দের একটু ঝোঁক ছিল। হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কতক পরিমাণে জাতিবর্ণ ঘুচাইয়া শিখগণকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র মণ্ডলী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে খাড়া করা গোবিন্দের লক্ষ্য ছিল। এই কারণে গুরু-গোবিন্দের উপর ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের বিরাগ পড়ে। গুরু-গোবিন্দ বলিতেন যুদ্ধে মৃত্যু মুক্তির নিদান। গুরু গোবিন্দ প্রত্যেক শিখকে পাঁচটি সামগ্রী আমরণ ধারণ করিতে আদেশ দেন। কেশ, কণ্ডা—ক্ষুদ্র তরবারি, কঙ্গা—কাষ্ঠের চিরুণী, কড়া—লৌহ-বলয়, কচ্—হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত পায়জামা। হিন্দুরা ধুতি পরিধান করে তামাকু সেবন করে, কিন্তু গোবিন্দ সিং শিখগণকে ধুতি-পরিধান ও তামাকু সেবন করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ফলে শিখদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে গাঁজা ও অহিফেনসেবী হইয়া দাঁড়ায়। তৎকালে প্রচলিত শিশু-কন্যা-হত্যা গোবিন্দ সিং নিষেধ করিয়া যান এবং বিবাহে পণ লইবার পক্ষেও তাঁহার নিষেধ ছিল। মুসলমান হইতে শিখগণকে পৃথক করিবার জন্য টুপির পরিবর্ত্তে পাকড়ী ব্যবহার করিবার তাঁহার আদেশ শিখগণের উপর

থাকে। এক আঘাতে ছিন্নমুণ্ড-ছাগাদির মাংস ভক্ষণে তাঁহার নিষেধ ছিল না। শিখগণের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বিধায় তিনি ধর্ম্মযাজকের মুখে ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণের ব্যবস্থা রাখিয়া যান।

গুরু গোবিন্দের মত এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। নিতান্ত অধিক দিন নহে, রাওলপিণ্ডীর জনৈক উদাসী ফকির উহার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্য লুদিয়ানা জেলার রাম সিং পরে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তাঁহার শিষ্যগণ কুকা নামে পরিচিত। তাহাদের পরিচ্ছদে একটু বৈচিত্র আছে। ইঙ্গিতবাক্যে তাহারা পরস্পরকে চিনিয়া লয়। কতক পরিমাণে তাহাদিগকে রাজনৈতিক সম্প্রদায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা মধ্যে ব্রিটিশ-শক্তিকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে ইংরাজের হস্তে দলপতিগণ নিহত ও বন্দীকৃত হয়েন। বর্ত্তমানে তাহারা ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে শিখগণ হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত। বিবাহ সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে। শিখ-রমণীগণ বীর্য্যে ও রাজ্য পরিচালনে যে পুরুষগণ হইতে হীনতর নহেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ ধর্ম্মে স্বামী মৃত হইলে দেবরের সহিত বিবাহেরও ব্যবস্থা আছে; ইহাকে "চাদর দালনা" অর্থাৎ চাদর দেওয়া বলে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শিখগণের ভিতরে ঐরূপ বিবাহের পরিচয় বড় মিলে না। সতীদাহও শিখগণের মধ্যে অপরিচিত নহে। কিন্তু বৃটিশ শাসনে এক্ষণে উহা নিষিদ্ধ। দায়াধিকার সম্বন্ধেও শিখদিগের একটু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। *

* Rulers of India.
Ranjit Sing by Sir Lepel Griffin, K, C. S, I.

নানা-কথা।

ধর্ম্মে উদারতা।—রাজা রণজিত সিংহের অমাত্যগণের মধ্যে ফকির আজিজুদ্দীনের (Azizuddin) নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি রণজিতের (Foreign Minister) পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে হইত। আজিজুদ্দীনের মূল্যবান পরামর্শে রণজিত অনেক সময়ে পরিচালিত হইতেন। দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে আজিজুদ্দীনেরই অধিকার ছিল। লর্ড বেণ্টিক, লর্ড আকলণ্ড, লর্ড এলিনবরা এবং কাবুলের দোস্ত মাহম্মদের নিকট দৌত্যকার্য্যে আজিজুদ্দীন আপন প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দেন। মুসলমান হইলেও রণজিত তাঁহার উপর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে নানাবিধ উপহার দিয়া তাঁহার গুণের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে আজিজুদ্দীন সুফী ছিলেন। সকল ধর্ম্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতে তিনি ধর্ম্মহীন হইলেও অন্যান্য সুফীগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় উদার ও সরস ছিল। একদিন রণজিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মটি তোমার ভাল লাগে। আজিজুদ্দীন উত্তরে বলিলেন "মহারাজ আমি এখন সুবিস্তীর্ণ নদীর মাঝখানে ভাসিতেছি, দুই পাশের উপকূলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাইতেছি না"। রণজিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই যখনই কোন সাধক ধর্ম্মের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করেন, সম্প্রদায় গত ক্ষুদ্র মতভেদ তাঁহাকে নিজগণ্ডীর ভিতরে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আজিজুদ্দীন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। তিনি লাহোরে নিজঅর্থে পারস্য ও আরব্য-ভাষা শিক্ষার জন্য এক কালেজ সংস্থাপন করেন। কবি বলিয়া আজিজুদ্দীনের প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁহার রচিত কবিতা হইতে কয়েক পংক্তির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্থির-দৃষ্টিতে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ কর, বুঝিবে ছায়ার ন্যায় ইহা চঞ্চল। বৃথা বাসনা লইয়া কেন অস্থির হইতেছ, যখন পূর্ণ করিবার তোমার শক্তি নাই। আপনাকে ভোল; ঈশ্বরের উপর তোমার কার্য্য সমর্পণ কর। তাঁহাকে সকল হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস কর। শান্ত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রতীক্ষা কর। যাহা কিছু পাইয়াছ, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। সংসারের কোলাহল তোমার কর্ণকে যেন বধির না করে। তাঁহাতেই উৎফুল্ল হও। আশ্বস্ত হও, তিনি তোমাকে দয়া করিবেনই। আমি আছি বলিতে চাও, কি মূর্খতা?

হইতে পারে, তুমি একজন মহাবীর। কিন্তু তোমার স্থায়ীত্ব কি জলবুদ্বুদের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী নহে? তোমার চিন্তা তোমার কল্পনা, হায়, উর্ণনাভের জালের ন্যায় নিতান্ত ক্ষীণ ও অস্থির। আমি এই মাত্র বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে"।

আশ্বাস বাণী। আগামী বৎসরের জন্য ভারতের বার্ষিক-আয় ব্যয়-নির্দ্ধারণ সভায় লর্ড মিণ্টো আপনী বক্তৃতায় বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভারতবাসিগণের অন্তরে বর্ত্তমানে যে নব ও সঙ্গত উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা স্থান পাইতেছে, তাহা প্রতীতি করিয়া উহার পূরণকল্পে গবর্ণমেণ্টকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ এক্ষণে ঘোর পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইতি মধ্যে লবণের শুল্ক ও ডাকমাশুল হ্রাসে এবং ভবিষ্যতে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা-বিধানের আশ্বাসদানে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছেন। চীনদেশীয়গণ অহিফেনকবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাতে ভারতের রাজস্ব-বিভাগের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেও মিণ্টোর সহানুভূতি চীনের দিকে পড়িয়াছে। হায়! স্বার্থজলাঞ্জলি দিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার সৎ-সাহস কয়জনার কুলায়।

পুনরুত্থান। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান স্মরণে রাখিবার জন্য ইষ্টার পর্ব্বের প্রবর্ত্তনা। ক্রুশে খ্রীষ্টের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর তৃতীয় দিবসেই কবর হইতে তিনি সশরীরে স্বর্গ-ধামে প্রয়াণ করেন। ইহার ভিতরে অন্ততঃ এই টুকু সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে যে মানবাত্মার বিনাশ নাই। মৃত-দেহকে সমাহিত বা অগ্নিসাৎ কর, অমর-আত্মা পাপপুণ্যের ফলাফল লইয়া উন্নত-লোকে গমন করিবেই। যাঁহারা আপনার জীবন দিয়া—প্রতি রক্ত-বিন্দু দান করিয়া অচল ও অটলভাবে ঈশ্বরের পথ—ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিলেন, অমৃত লোকের—অনন্ত স্বর্গধামের অভয় দ্বার যে তাঁহাদের সম্মুখে চির প্রমুক্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

পরমাণুতত্ত্ব। পরমাণুগণ বস্তুমাত্রেরই যে অবিভাজ্য চরম-অংশ,এ ধারণা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বড় আর স্থান পাইতেছে না। বিখ্যাত প্রফেসর ল্যা-সন বলেন যাহাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তাহার অতি-সূক্ষ্ম প্রতি কণিকার ভিতরে এত শক্তি (energy) রহিয়াছে, যে তাহারা বাহির হইতে শক্তি না পাইলেও আপনা হইতে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন কোন বড় জড়বস্তু কোন কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার পরমাণুর এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সূর্য্যের তেজ, তাড়িত এই ভাবেই উদ্ভূত। জড়বস্তু (matter) ও শক্তি (force) একই পদার্থের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। যখন পরমাণুগত শক্তি (intra atomic energy) অচল ভাবে বিরাজমান, তখন তাহা জড়পদার্থ; যখন তাহা সচল ভাবে বিরাজমান, তখন তাহা তেজ আলোক তাড়িত ইত্যাদি।

বিজ্ঞান-বার্ত্তা। তারবিহীন টেলিগ্রাফের অত্যাশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ডানিশ আবিষ্কারক পাউলসেন তারের বিনা সাহায্যে ইউরোপ হইতে আমেরিকায় সংবাদ প্রেরণের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল বাহির করিয়াছেন। আগামী ছয় মাসের ভিতরে কার্য্য চলিবে এইরূপ আশাও দিয়াছেন।

শত-বর্ষী। ইয়র্কসায়ার হেরাল্ডে প্রকাশ যে লণ্ডনের নিকট ব্রিক্সটন নগরবাসী রিচার্ড বাইমাক নামক ধর্ম্মযাজক ১৮০৯।২৫ এ ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছেন। ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে তিনিই স্থবিরতম চলিয়া অনুমিত। এদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও সাত্ত্বিক আহারপ্রযুক্ত প্রায়ই সবল সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী।

সম্মিলন। বিগত ৯ই মার্চ্চ তারিখে খ্রিষ্টিয়ান লাইট নামক সংবাদ পত্র বিলাতের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নসম্প্রদায়ের সম্মিলন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উদারতার কাল আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে আমাদের বলবীর্য্য—শক্তি-সামর্থের বহুঅংশ দল আঁটিতে ও নিজ সংস্কার পোষণার্থ যুক্তি-তর্ক উদ্ভাবনে অপব্যয়িত হয়; শান্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে গিয়া অনেক সময়ে অশান্তি ক্রয় করিয়া আনি; ধর্ম্মজগতে আপনাকে প্রচার করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। হৃদয়ের বিশালতা ও ধর্ম্মমতের উদারতা এই সকল মহাব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। লোকে নিজের মত লইয়া এতই উন্মত্ত, যে সে অপরের মত স্থির-বুদ্ধিতে বুঝিবার বা নিজমত অপরকে বুঝাইবার সহিষ্ণুতা একেবারেই হারাইয়াছে। হায়! ঈশ্বরের নিকট সে আলোক ভিক্ষা করে না। নিজের নিষ্প্রভ আলোকে সে এমনই ঘোর অন্ধকার রচনা করে, যে সে নিজে পথ খুঁজিয়া পায় না।

ব্রাহ্ম-সমাজ। ব্রাহ্মসমাজ মুষ্টিমেয় লোকের সংহতি হইতে পারেন, কিন্তু অনুবর্ত্তী লোকসংখ্যা সত্যের পরিমাপক নহে। জগতে জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সংখ্যা অতিবিরল। তাই বলিয়া জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য

উড়াইয়া দিবার সামগ্রী নহে। হইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার বক্তব্য বিষয় সাধারণের উপযোগী করিয়া বলিতে বা লোকভবে প্রচার করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। সত্য জয় যুক্ত হইবেই, এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস যেন আমরা জীবনের কোন মুহূর্ত্তে হারাইয়া না ফেলি। হায়! সত্যের বক্তা ও ধারয়িতা উভয়ই জগতে নিতান্ত দুর্লভ।

হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দভার্কার। কনগ্রেস উপলক্ষে আহুত সেদিনকার ধর্ম্মসম্মিলনীতে চন্দভার্কার ঠিকই বলিয়াছেন, যে "ব্রাহ্মসমাজের উপরে সমস্ত ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে"। বস্তুতঃ ভারতে এতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন আর একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হইয়া না দাঁড়ায়। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে, যে সকল-জাতি সকল-ধর্ম্মকে আপনার বিশাল ব্যাপকতার মধ্যে আনিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, সকলকে এক করিয়া লও। সদয়ভাবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি নিরীক্ষণ কর। যাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অন্যান্য বিষয়ে সামান্য দুর্ব্বলতা থাকিলেও তাহাদিগকে আপনার উদার ক্রোড়ের ভিতর গ্রহণ কর। গণ্ডী দিয়া কাহাকেও বাহিরে রাখিও না। কেবলমাত্র উন্নত-মত-পোষণের ভাণ করিলে ভাবী জাতীয় সৌভাগ্যের পত্তন হয় না। কিন্তু আপনার চারিত্রে ও কার্য্যে যতদিন না জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারিবে, তত দিন আশানুরূপ ফল লাভের প্রত্যাশা কোথায়? উদ্‌গ্রীব হইয়া শ্রবণ কর, পরস্পরের প্রতি সদয়ভাব রক্ষা করিয়া সমবেতচেষ্টায় আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও দেশের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে আহ্বান আসিতেছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪১০৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৪৩২।৵৩
সমষ্টি	...	২৮৪২॥৴৩
ব্যয়	...	৪৪৬৮/৯
স্থিত	...	২৩৯৫॥৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৯৫॥৶৬

২৩৯৫॥৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩০৪৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের এক্‌জীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

কোম্পানীর কাগজ ক্রয়
১০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার
২৲

৩০৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২১৮৵০
পুস্তকালয়	...	।৶০
যন্ত্রালয়	...	৭১।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৮০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৮০
সমষ্টি	...	৪১০৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৯৬৮/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৮ ৬
পুস্তকালয়	...	৮/০
যন্ত্রালয়	...	৮১।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৯৲
সমষ্টি	...	৪৪৬৮/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প

প্রথম ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

৭৬৬ সংখ্যা

১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে,—বর্ণ, ধ্বনি, আকার, গতি এই সমস্তই সৌন্দর্য্য-রস উদ্বোধনে সমর্থ। সকারণেই হউক, অকারণেই হউক—এই জাতীয় সৌন্দর্য্য, ভৌতিক-সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে যদি আমরা আধ্যাত্মিক জগতে, সত্যের জগতে, বিজ্ঞানের জগতে আরোহণ করি, সেখানে অপেক্ষাকৃত একটু কঠোর ভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব, যদিও সে সৌন্দর্য্য-বাস্তবতায় কিছুমাত্র ন্যূন নহে। যে সকল সার্ব্বভৌমিক নিয়মে জড়পিণ্ডসমূহ নিয়মিত হয়, যে সকল নিয়মে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীবসমূহ পরিশাসিত হয়, সুদীর্ঘ সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সকল মূলসূত্র বিদ্যমান, এবং যে সকল মূলসূত্র হইতে সিদ্ধান্তসমূহ উৎপন্ন হয়, গুণী, কবি, ও দর্শনবেত্তার যে প্রতিভা নূতন জিনিসের সৃষ্টি করে,—তৎসমস্তই সুন্দর, প্রকৃতির মতই সুন্দর। ইহাকে তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য বলে।

পরিশেষে, যদি আমরা নৈতিক-জগৎ ও উহার নিয়মাদির আলোচনা করি,—স্বাধীনতা, সাধুতা, সেবানিষ্ঠার আলোচনা করি,—অ্যারিস্‌টাইডিসের ন্যায়পরতা, লিওনিডাসের বীরত্ব, দানবীর ও স্বদেশনিষ্ঠ মহাত্মাদিগের কথা আলোচনা করি—এই সমস্তের মধ্যে আমরা তৃতীয় জাতীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিব; এই সৌন্দর্য্য অপর দুই জাতীয় সৌন্দর্য্যকেও অতিক্রম করে; ইহা নৈতিক সৌন্দর্য্য।

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই সমস্তের মধ্যেও সুন্দর ও মহানের ভেদ আছে। অতএব, কি প্রকৃতি-রাজ্যে, কি মনোরাজ্যে, কি জ্ঞানে, কি ভাবে, কি কার্য্যে, সুন্দর ও মহান সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি অসীম বৈচিত্র্য!

এই সমস্ত ভেদ নির্ণয় করিবার পর, উহাদের সংখ্যা কি আমরা কমাইয়া আনিতে পারি না? এই সমস্ত বৈষম্য অকাট্য হইলেও উহার মধ্যে কি সাম্য নাই,

একটি মূল-সৌন্দর্য্য নাই—এই বিশেষ-বিশেষ সৌন্দর্য্য যাহার ছায়া, যাহার আভা, যাহার উচ্চনীচ ধাপ মাত্র ?

Plotin তাঁহার "সুন্দর"-সম্বন্ধীয় সন্দর্ভে, এই প্রশ্নটিই উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ—সুন্দর জিনিসটা স্বরূপতঃ কি ? এই আকারটি সুন্দর, কিংবা ঐ আকারটি সুন্দর,—এই কার্য্যটি সুন্দর, কিংবা ঐ কার্য্যটি সুন্দর বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি; কিন্তু বিভিন্ন হইয়া এই দুই পদার্থ ই কি করিয়া সুন্দর হইল ? এ দুয়ের মধ্যে সাধারণ গুণটি কি যাহার দরুণ উভয়ই সুন্দর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ?

এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে, সৌন্দর্য্যের সমস্যাটি আমাদের নিকট গোলকধাঁধার মত থাকিয়া যায়—উহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বস্তুর একই নাম দেওয়া হইতেছে, অথচ, যাহার বলে উহাদিগকে একই নামে অভিহিত করা হয় সেই বাস্তবিক ঐক্যস্থলটি কোথায় তাহা আমরা অবগত নহি।

অথবা, সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সকল বৈষম্য আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি সে এরূপ বৈষম্য যে তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার যোগ-সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব; অথবা এই সকল বৈষম্য শুধু বাহ্যিক, উহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব—একটা একতার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন এই একতা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, তাহা হইলে এ কথাও বলিতে হয় যে, ভৌতিক সৌন্দর্য্য তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য ও নৈতিক সৌন্দর্য্য—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। তাহা হইলে,কলা-গুণী কিরূপে কাজ করিবেন ? তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে—কিন্তু তাহার মধ্য হইতে একটিমাত্র রচনার বিষয় তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইবে; কেননা, ইহাই কলাশাস্ত্রের নিয়ম। এই নিয়মটি যদি কৃত্রিম হয়, যদি প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক সৌন্দর্য্যই স্বরূপত বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে কলাশাস্ত্র আমাদিগকে ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন —তাঁহার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিরূপে একটা মিথ্যা কথা শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম হইল, আমি তাহা জানিতে চাই। তাহা হইতেই পারে না। শিল্পকলার মধ্যে এই যে একটি একতার ভাব পরিব্যক্ত হয়, ইহার একটু আভাস প্রকৃতির মধ্যে না পাইলে, কলাগুণীরা কখনই উহা তাঁহাদের রচনার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

সুন্দর ও মহানের ভেদ এবং অন্যান্য ভেদ যাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সকল ভেদ আমি প্রত্যাহার করিতেছি না; কিন্তু সেই সকল ভেদের মধ্যে কিরূপে একটা মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক। এই সকল ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে। একতা ও বিচিত্রতা যেমন সত্যের তেমনি সৌন্দর্য্যেরও একটা প্রধান নিয়ম। সমস্তই এক ও সমস্তই বিচিত্র। আমরা সৌন্দর্য্যকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ভৌতিক সৌন্দর্য্য, তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য, ও নৈতিক সৌন্দর্য্য। এক্ষণে এই তিন সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঐক্যস্থল কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এই তিন সৌন্দর্য্য আসলে একই এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যেরই অন্তর্গত।

এই মতটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সপ্রমাণ করা যাউক।

যাহাকে ভেলভেডিয়ারের অ্যাপলো

বলে, সেই অ্যাপোলো-মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া একবার দাঁড়াও, এবং সেই উৎকৃষ্ট কলারচনার মধ্যে কোন্ অংশটি বিশেষরূপে তোমার নেত্রকে আকর্ষণ করে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যিনি দার্শনিক নহেন, যিনি শুধু একজন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, কোন বিশেষ পদ্ধতির পক্ষপাতী না হইয়াও কলা-সম্বন্ধে যাঁহার সুরুচি ছিল, সেই Winkleman এই প্রসিদ্ধ Apollo মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা অতীব কৌতুহলজনক। উহার সুন্দর দেহের উপর অমর যৌবনশ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে, সচরাচর মানবশরীর অপেক্ষা একটু অধিক উচ্চ, তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে রাজমহিমা পরিব্যক্ত—এই সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে যে দেবত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে Winkleman সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ ললাট দেবতারই উপযুক্ত, উহাতে অচলা শান্তি বিরাজমান। আর একটু অধোভাগে মানবত্বের লক্ষণ আবার দেখা দিয়াছে; এবং এইরূপ মানবীয় লক্ষণ থাকাতেই এই সকল কলা-রচনার প্রতি মানব-চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টিতে তৃপ্তির ভাব, নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত, নীচের ঠোঁট্ একটু তোলা;—এই সমস্ত লক্ষণে বিজয়গর্ব্ব এবং বিজয়সাধনের শ্রান্তি প্রকাশ পাইতেছে। এই সমালোচকের প্রত্যেক কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ; দেখিবে তাহাতে একটা নৈতিক ভাবের ছাপ রহিয়াছে। এই পুরাতত্ত্ব পণ্ডিত এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহার তত্ত্ববিশ্লেষণ ক্রমে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য-ভক্তের ভক্তিবন্দনায় পরিণত হইয়াছে।

প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, এখন একজন আসল মানুষকে—একজন জীবন্ত মানুষকে নিরীক্ষণ কর। মনে কর সুখসম্পদের নিকট কর্ত্তব্যকে বলিদান দিবার জন্য কোন ব্যক্তির বলবৎ প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও সে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া নীচ স্বার্থের উপর জয়লাভ করিল এবং ধর্ম্মের জন্য সুখসম্পদকে বিসর্জ্জন করিল। যখন সে এই মহৎ সঙ্কল্পটি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল, সেই সময়ে যদি তাহাকে দেখিতে তাহার মূর্ত্তিটি তোমার নিকট নিশ্চয়ই অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কেননা, সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার আত্মার সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত। হয় ত আর কোন অবস্থায় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মানব-মূর্ত্তির মতই মনে হইবে—এমন কি, তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু এইস্থলে, আত্মার আলোকে আলোকিত হওয়ায় উহা হইতে একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে। এইরূপ, সক্রেটিসের স্বাভাবিক আকৃতির সহিত গ্রীক-সৌন্দর্য্যের আদর্শ-মূর্ত্তির তুলনা করিয়া দেখ,—উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ; মৃত্যুশয্যায় শয়ান সক্রেটিস্‌কে দেখ—যখন তিনি বিষ পান করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সহিত আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন—তাঁহার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইবে।

মৃত্যুকালে, সক্রেটিস্ নৈতিক মাহাত্ম্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তোমার নেত্রসমক্ষে শুধু তাঁহার মৃত কলেবরটি রহিয়াছে। যতক্ষণ তাঁহার মৃতদেহে আত্মার কিছু চিহ্ন ছিল, ততক্ষণই উহাতে সৌন্দর্য্যও রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমশ যখন সেই ভাবটি চলিয়া গেল, তখন দেহ আবার পূর্ব্ববৎ গ্রাম্য ও কুৎসিৎ হইয়া পড়িল। মৃতব্যক্তির

মুখমণ্ডলে হয় বীভৎস ভাব, নয় স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়।

আত্মা যখন ভৌতিক দেহকে আর ধরিয়া রাখে না, যখন দেহ হইতে পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তখনই সেই মৃতদেহ কুৎসিৎ আকার ধারণ করে; যখন উহা আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে, তখনই উহা স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে।

মানুষের অচল মূর্ত্তি একবার আলোচনা করিয়া দেখ; ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মূর্ত্তি সুন্দর, আবার সমস্ত নির্জীব পদার্থ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি সুন্দর। তাহার কারণ, ধর্ম্ম ও প্রতিভার অসদ্ভাব হইলেও, মনুষ্য-মূর্ত্তিতে জ্ঞান ও নীতির ভাব নিয়ত প্রকাশ পায়; ইতর প্রাণীর মূর্ত্তিতে অন্ততঃ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পায়; পূর্ণমাত্রায় না হউক অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আত্মার ভাব প্রকাশ পায়। যদি আমরা প্রাণীজগৎ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভৌতিক জগতে অবতরণ করি,—যতক্ষণ তাহাতে আমরা জ্ঞানের লেশমাত্র ছায়া উপলব্ধি করি, যতক্ষণ উহা আমাদের মনে, কি জানি কেন, কোন প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদ্রেক করে, ততক্ষণই তাহাতে আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। যদি কোন জড়-পদার্থ, কোন প্রকার ভাব কিংবা ভাবার্থ প্রকাশ না করে,তখন আর তাহাতে আমরা কোন সৌন্দর্য্যে দেখিতে পাই না। কিন্তু সত্তা মাত্রই সজীব। ভৌতিক পদার্থ মূক হইলেও অভৌতিক শক্তিসমূহে তাহা ওতপ্রোত; এবং উহা যে সকল নিয়মের অধীন তাহা সর্ব্বত্রবিদ্যমান জ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। মৃত জড় পদার্থে, সূক্ষ্মতম রসায়নিক বিশ্লেষণ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যাহারই কোন প্রকার দেহযন্ত্র আছে, এবং যাহা-কিছু শক্তি হইতে ও নিয়ম হইতে বঞ্চিত নহে, তাহাতেই ঐরূপ বিশ্লেষণক্রিয়া সম্ভব। কি গভীর সাগর-গর্ভে, কি উচ্চ আকাশ-তলে, কি বালুকণার মধ্যে, কি প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শিখরে,—উহাদের স্থুল আবরণ ভেদ করিয়া, ভূমা-আত্মার অমৃত কিরণ সর্ব্বত্রই বিচ্ছুরিত হইতেছে। চর্ম্ম-চক্ষুর ন্যায় আত্মার চক্ষু দিয়া প্রকৃতি-রাজ্যকে দর্শন কর,—সর্ব্বত্রই নৈতিক ভাব তোমার চোখে পড়িবে, এবং প্রত্যেক পদার্থের রূপ আমাদের চিন্তারই প্রতিরূপ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কি মনুষ্য-মূর্ত্তি, কি ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি, ভাবপ্রকাশেই উহাকে সুন্দর দেখায়। কিন্তু যখন তুমি উত্তুঙ্গ হিমালয়-শিখরে আরোহণ কর, কিংবা অসীম সমুদ্রের সম্মুখে অবস্থান কর, যখন তুমি সূর্য্যের উদয়াস্ত, আলোকের জন্ম মৃত্যু নিরীক্ষণ কর—এই সমস্ত আশ্চর্য্য গম্ভীর দৃশ্য তোমার উপর কি কোন নৈতিক প্রভাব প্রকটিত করে না? এই সকল মহান দৃশ্য অবশ্যই কোন এক পরাশক্তির অভিব্যক্তি, পরমাশ্চর্য্য পরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি—এইরূপ কি তোমার মনে হয় না? এবং তখন মানুষের মুখের মত, প্রকৃতির মুখেও কি তুমি এক প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাও না?

কোন আকৃতিই একক থাকিতে পারে না, উহা কোন-না-কোন পদার্থের আকার। অতএব ভৌতিক সৌন্দর্য্য কোন এক আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরই নিদর্শন। উহাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য; এবং উহাই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যের ঐক্যসূত্র।

আমরা সৌন্দর্য্যের যত প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমস্তই বাস্তব

সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাস্তব সৌন্দর্য্যের উপরে আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে—সেটি মনের আদর্শ-সৌন্দর্য্য। এই আদর্শ-সৌন্দর্য্য,কোন ব্যক্তি বিশেষে কিংবা ব্যক্তিসমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে না। এইরূপ সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে আনিবার জন্য, বাহ্যপ্রকৃতি কিংবা আমাদের বহুদর্শিতা শুধু এক-একটা উপলক্ষ যোগাইয়া দেয় মাত্র; কিন্তু আসলে এই সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এই প্রকার সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে একবার প্রকাশ পাইলে, কোন প্রাকৃতিক মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন,—উহা ঐ পরম সৌন্দর্য্যেরই একটা নকল বলিয়া মনে হয়; উহা কিছুতেই ঐ সৌন্দর্য্যের সমান হইতে পারে না। কোন একটা সুন্দর কাজের কথা আমার নিকট বল, আমি উহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কাজ মনে কল্পনা করিতে পারি। এমন যে অ্যাপলো মূর্ত্তি তাহারও অনেক দোষদর্শী সমালোচক আছে। আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হও, আদর্শটি ততই যেন পিছাইয়া যায়। আদর্শ-সৌন্দর্য্যের চরম অংশটি অনন্তের মধ্যে—অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত; কিংবা আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে, সেই ধ্রুব আদর্শটি, পূর্ণ আদর্শটি, স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যেহেতু ঈশ্বর সকল পদার্থেরই মূলতত্ত্ব, অতএব সেই অধিকারসূত্রে তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যেরও মূলতত্ত্ব; সুতরাং ন্যূনাধিক অপূর্ণভাবে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও তিনি মূলতত্ত্ব; তিনি যেমন ভৌতিক জগতের স্রষ্টা, তাত্ত্বিক-জগৎ ও নৈতিক-জগতের পিতা, তেমনি তিনি সকল সৌন্দর্য্যের মূলাধার।

গতি, আকার, ধ্বনি, বর্ণ প্রভৃতির বিচিত্র সম্মিলন ও সুমিশ্রনে এই দৃশ্যমান জগতে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হই; আর এই সুব্যবস্থিত বিরাট দৃশ্যের পশ্চাতে, যে নিয়ন্তা, যে বিধাতা, যে বিশ্বকর্ম্মা মহাশিল্পী রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা উপলব্ধি করিব না?

ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই এক প্রকার আচ্ছাদন।

এই সত্য-জ্যোতি, এই তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য,—ইহার মূলতত্ত্বটি কি? সকল সত্যের যে মূলতত্ত্ব, ইহারও সেই মূলতত্ত্ব।

নৈতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, দুইটি স্বতন্ত্র উপাদান বিদ্যমান,—উভয়ই সুন্দর, কিন্তু বিভিন্নভাবে সুন্দর। যথা:—ন্যায়পরতা ও উদারতা, প্রেম ও ভক্তি। যে ব্যক্তি স্বকীয় আচরণে ন্যায়পরতা ও উদারতা প্রকাশ করে, তাহার সম্পাদিত কার্য্য যার পর নাই সুন্দর। কিন্তু যিনি ন্যায়ের মূলাধাব, প্রেমের অফুরন্ত উৎস, তাঁহার সৌন্দর্য্য কি বলিয়া বর্ণনা করিবে? আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যদি সুন্দর হয়, যিনি এই নৈতিক প্রকৃতির স্রষ্টা তিনি কত না সুন্দর! তাঁহার ন্যায়, তাঁহার করুণা, আমাদের অন্তরে, আমাদের বাহিরে,—সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তাঁহার ন্যায়ব্যবস্থাই জগতের এই নৈতিক ব্যবস্থা; কোন মানববিধি তাহা রচনা করে নাই; প্রত্যুত মনুষ্যরচিত বিধি-ব্যবস্থাদি চিরকাল সেই ন্যায়কেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; এবং সেই ন্যায় নিজ বলেই এতাবৎকাল এই জগতে সংরক্ষিত হইয়াছে,স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। নিজের অন্তরে যদি অবতরণ করি, আমাদের অন্তরাত্মাই সাক্ষ্য দিবে যে, ধর্ম্মের সহচর যে শান্তি ও সন্তোষ—তাহার

মধ্যে ঐশ্বরিক ন্যায়ই বিরাজমান ; হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, পাপের অপরিহার্য্য কঠোর শাস্তিই প্রকাশ পায়। আমাদের প্রতি মঙ্গলময় বিধাতার কত করুণা, কত স্নেহযত্ন তাহার পরিচয় আমরা প্রতিপদে প্রাপ্ত হইতেছি, প্রতি মূহূর্ত্তই তাহা অভিনব জ্বলন্ত বাক্যে ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার মঙ্গলভাব,—কি ক্ষুদ্র,কি বৃহৎ,—প্রকৃতির সকল ঘটনার মধ্যেই দেদীপ্যমান। ঐ সকল ঘটনা আমাদের নিকট অতিপরিচিত বলিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই ; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উহা আমাদের বিস্ময়মিশ্র কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করে, এবং জীবের প্রতি যাঁহার অসীম প্রেম সেই প্রেমময় পরম দেবের মহিমা ঘোষণা করে।

এইরূপে, আমরা যে তিন শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছে, ঈশ্বর সেই তিনি শ্রেণীয় সৌন্দর্য্যের,—ভৌতিক, তাত্ত্বিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।

আবার এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রকার রূপ বিদ্যমান—অর্থাৎ সুন্দর ও মহান্—তাহা তাঁহাতেই আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঈশ্বরই পরম সুন্দর; কেননা, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিকে—জ্ঞান, কল্পনা ও হৃদয়কে তিনি ভিন্ন আর কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? তিনিই আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম ধারণা—যাহার পর আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই। তিনিই আমাদের কল্পনার আত্মহারা ধ্যান, তিনিই আমাদের হৃদয়ের পরম প্রেমাস্পদ। অতএব তিনিই পূর্ণরূপে সুন্দর। তিনি যেরূপ সুন্দর, সেইরূপ কি তিনি মহান্‌ও নহেন? স্বকীয় অসীম মহিমার দ্বারা তিনি যেমন একদিকে আমাদের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করিতেছেন, তেমনি আবার তিনি তাঁহার অতলস্পর্শ মহিমার মধ্যে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছেন। তাঁহার করুণা-রশ্মি যেমন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে প্রস্ফুটিত করে, তেমনি তাঁর কঠোর ন্যায় কি আমাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করে না? ঈশ্বরের স্বরূপে প্রসন্ন ও রুদ্রভাব উভয়ই বিদ্যমান। ঈশ্বর যেমন একদিকে মধুর, তেমনি আবার তিনি ভীষণ। একদিকে যেমন তিনি এই দৃশ্যমান সসীম জগতের জীবন, আলোক, গতি ও অক্ষয় শোভা, তেমনি আবার তিনি অনাদি, অদৃশ্য, অসীম অনন্ত, পরিপূর্ণ অদ্বৈত ও সত্তার সত্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঈশ্বরের এই ভীষণ উপাধিগুলি যাহা পূর্ব্বোল্লিখিত উপাধিরই মত সুনিশ্চিত—উহা কি আমাদের কল্পনায় একপ্রকার বিষাদের ভাব উৎপাদন করে না—যাহা ভীষণ গম্ভীর দৃশ্য দর্শনে আমাদের মনে নিয়ত উত্তেজিত হইয়া থাকে? ঈশ্বর, আমাদের নিকট সুন্দর ও মহান্; এই দুই প্রকার সৌন্দর্য্য-রূপেরই তিনি আদর্শ ও উৎস ; কেন না, তিনি যেমন একদিকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা, তেমনি আবার সকল প্রহেলিকার তিনিই সুস্পষ্ট সমস্যাবাক্য। আমরা সীমাবদ্ধ জীব,—আমরা অসীমকে যেমন বুঝিতে পারি না, তেমনি আবার অসীমকে ছাড়িয়াও কিছুরই সমীচীন ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের যে সত্তা আছে, সেই সত্তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সেই অসীম সত্তার কতকটা আভাস পাই ; আমাদের মধ্যে যে অসত্তা বিদ্যমান, সেই অসত্তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে বিলীন হই। এইরূপে, কোন কিছুর ব্যাখ্যা করিতে হইলেই নিয়ত তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়; এবং তাঁহার অনন্ততার ভারে প্রপীড়িত হইয়া যখন আবার আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসি,

তখন--যিনি আমাদিগকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে অভিভূত করিতেছেন, সেই ঈশ্বরের প্রতি আমরা পর্য্যায়ক্রমে অথবা যুগপৎ, একটা অদম্য আকর্ষণের ভাব, বিস্ময়ের ভাব, দুরতিক্রম্য ভীতির ভাব অনুভব করি, যাহা একমাত্র তিনিই উৎপাদন করেন এবং যাহা তিনিই প্রশমিত করিতে পারেন ; কেন না একমাত্র তিনিই ভীষণ ও সুন্দরের সাম্যস্থল।

এইরূপে সেই পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরই,—পূর্ণ একত্ব ও অসীম বৈচিত্র্যের সমবায়; সুতরাং তিনিই সমস্ত সৌন্দর্য্যের চরম হেতু, চরম ভিত্তি, চরম আদর্শ। Diotime এই চিরন্তন সৌন্দর্য্যেরই একটু আভাস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার "Le Banquet" নামক সন্দর্ভে সেক্রেটিসের নিকট সেই সৌন্দর্য্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"সেই অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য্য, অজাত অবিনশ্বর সৌন্দর্য্য, যাহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই ; যাহার এক অংশ সুন্দর ও অপরাংশ কুৎসিৎ—এরূপ নহে ; শুধু অমুক সময়ে সুন্দর, অমুক স্থানে সুন্দর, অমুক সম্বন্ধে সুন্দর, এরূপও নহে ; যে সৌন্দর্য্যের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নাই,—মুখ নাই, হস্ত নাই, শারীরিক কিছুই নাই ; অথবা যাহা অমুক চিন্তাও নহে, অমুক বিশেষ বিজ্ঞানও নহে, আপনা হইতে ভিন্ন অন্য কোন সত্তার মধ্যেও যাহা অবস্থিতি করে না ; যাহা কোন জীব, কিংবা পৃথিবী, কিংবা আকাশ কিংবা অন্য কোন বস্তু নহে ; যাহা সম্পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যবিশিষ্ট, যাহা আত্মবিকারশূন্য, অন্য সকল সৌন্দর্য্য যাহার অংশ মাত্র ; যাহার জন্মনাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, কোন পরিবর্ত্তন নাই।

এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে হইলে, এই মর্ত্ত্যলোকের সৌন্দর্য্য হইতে আরম্ভ করিতে হয় ; এবং সেই পরম সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত আরোহণ করিতে হয়, যাত্রাকালে সোপানের সমস্ত ধাপগুলা মাড়াইয়া যাইতে হয় ;—একটা সুন্দর দেহ হইতে, দুইটি সুন্দর দেহে, দুইটি সুন্দর দেহ হইতে, অন্য সমস্ত সুন্দর দেহে; সুন্দর দেহ হইতে, সুন্দর ভাবে; সুন্দর ভাব হইতে সুন্দর জ্ঞানে, এইরূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে আসিয়া, পরে সেই পরম জ্ঞানে আমরা উপনীত হই,—যে জ্ঞানের বিষয়, সুন্দর-স্বরূপ স্বয়ং। এইরূপে অবশেষে আমরা সুন্দরকে স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হই।"

"মাতিনের বিদেশী আরও এইরূপ বলিতে লাগিলেন :—প্রিয় সখা সক্রেটিস, সেই অনাদি সৌন্দর্য্যের দর্শনেই জীবন সার্থক হয় ... যে ব্যক্তি অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যকে, সরল সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছে—যে সৌন্দর্য্য নর-মাংসে, নর-বর্ণে আচ্ছাদিত নহে, যাহা নশ্বর উপাদানে গঠিত নহে,—সেই অদ্বৈত সৌন্দর্য্যের, সেই ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের যে সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছে, তাহার কি সৌভাগ্য !—সেই ধন্য ! সেই ধন্য !"

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধনা।

১। যাহা তোমার সামর্থ্যের অতীত, এরূপ কাজে যদি প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতে হইবে ; শুধু তাহা নহে, যে কাজ তোমা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত, তাহাও ফসকাইয়া যাইবে।

২। একজন জিজ্ঞাসা করিল ঃ—"আমি কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা আমি কি করিয়া জানিব ?" এপিক্‌টেটস্ উত্তর করিলেন ;—সিংহ যখন নিকটবর্ত্তী হয়, তখন বৃষ কি নিজের শক্তি বুঝে না, এবং সমস্ত গরুর পালকে রক্ষা করিবার জন্য সে কি একাকী অগ্রসর হয় না ? অতএব যাহার শক্তি আছে, নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও আছে। যেমন বলবান্ বৃষ মুহূর্ত্তের মধ্যে তৈয়ারি হয় না, সেইরূপ কোন মনুষ্যপুঙ্গবের মহৎ চরিত্রও মুহূর্ত্তের মধ্যে গঠিত হয় না। শক্তি অর্জ্জনের জন্য কঠোর সাধনা চাই, এবং বিনা-সাধনায় লঘুচিত্তে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যের দিকে ধাবমান হওয়া নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া জনিবে।

আর কত দিন ?

১। কত দিনে তুমি উচ্চতর কাজ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে ? বিবেক-বুদ্ধিকে কিছুতেই অতিক্রম করিবে না—এ শিক্ষা তোমার কবে হইবে ? উপদেশ ত অনেক পাইয়াছ, কিন্তু সেই অনুসারে কি তুমি কাজ করিতেছ ? তোমার চরিত্র সংশোধনের জন্য এখনও কোন্ গুরুর অপেক্ষায় আছ ? তুমিত বালক নহ, তুমি এখন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য। নিজ চরিত্রশোধনে এখনও যদি অবহেলা কর, শিথিলযত্ন হও, ক্রমাগত প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিতে থাক,—প্রতিদিনই যদি মনে কর, আজ না—কাল হইতে আমি কার্য্য আরম্ভ করিব, তাহা হইলে তুমি উন্নতির পদে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে না ;—যাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় আছে, সেই অপদার্থ হতভাগ্য ইতরলোকদিগেরই মত তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

২। অতএব, পূর্ণবয়স্ক পুরুষের যাহা উপযুক্ত, উন্নতিশীল মনুষ্যের যাহা উপযুক্ত—সেইরূপ কাজে এখনি প্রবৃত্ত হও। যাহা কিছু উত্তম বলিয়া জানিবে, তাহাই যেন তোমার জীবনের বীজমন্ত্র হয়। বৃথা কাল হরণ করিবে না। শুভযোগ হারাইবে না। আমাদের এই জীবন মহারণক্ষেত্র। এক দিনের যুদ্ধেই জয় কিংবা পরাজয় হইতে পারে।

৩। বিবেক ছাড়া আর কিছুরই প্রতি সক্রেটিসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না বলিয়াই তিনি এতটা মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুমি সক্রেটিস না হইতে পার, কিন্তু সক্রেটিসের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্যাতীত নহে।

স্মর্ত্তব্য কথা।

বিপদ আপদের জন্য এই কথাগুলি সর্ব্বদাই তোমার হাতের কাছে প্রস্তুত রাখিবে ঃ—"হে ঈশ্বর, হে বিধাতা, যেখানেই তুমি আমাকে যাইতে বলিবে আমি যেন নির্ভয়ে সেইখানেই যাইতে পারি। কুমতির প্ররোচনায় যদি কখন আমার অনিচ্ছা জন্মে, তবু যেন তোমার আদেশ পালনে সমর্থ হই।" "সেই ব্যক্তিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানী, সেই ব্যক্তিই দৈবব্যাপার সকল বুঝিতে সমর্থ, যে অক্ষুব্ধচিত্তে ও উদার-অন্তঃকরণে ভবিতব্যতার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে।" "দেবতাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক। মৃত্যু আমার শরীরকেই ধ্বংস করিতে পারে, আমার আত্মার কোন হানি করিতে পারে না।"

আকবরের উদারতা।

মোগলসম্রাটরবি আকবর বিশাল ও উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিতে গিয়া তাঁহাকে বিবিধ জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছিল। ফলতঃ যে সকল হিন্দু-রাজা ও রাজপুত-রাজন্যগণ তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন, হিন্দু হইলেও তাঁহাদের রাজভক্তি ও ঐকান্তিকতা সন্দর্শনে, আকবর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। আকবর নিজে রাজপুত রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রাজপুত ললনার গর্ভেই বাদসাহ জাহাঙ্গীরের জন্ম। ঐ পুত্রের পরিণয় ব্যাপারও রাজপুত-কন্যার সহিত ঘটিয়াছিল। উত্তরকালে ঐ হিন্দু-রমণীর গর্ভে সাজাহানের জন্ম হয়। এই-রূপে হিন্দুভাব হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ-বাসনা আকবরের হৃদয়ে স্বতই জাগিয়া উঠিয়াছিল। সত্য কেবলমাত্র যে মুসলমানধর্ম্মের নিজ সম্পত্তি নহে, সকল ধর্ম্মের ভিতরে অল্পাধিক পরিমাণে উহা যে বিরাজমান, ক্রমে তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় এইরূপে যতই উদার হইতে উদারতর হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্রাহ্মণ ও সুমানি পণ্ডিতগণের সহিত অসঙ্কোচে ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুনর্জ্জন্ম ও আত্মার অমরত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। ভাগ্যক্রমে তিনি বিরাটহৃদয় ও আপনার সহিত তুল্য ভাবাপন্ন ফৈজি ও আবুলফজেল দুইভাইকে আপন সভার সদস্য পাইয়াছিলেন। আকবরের জীবনের সহিত ঐ দুইজনের ঘনিষ্ঠতম যোগ। ফৈজি ও আবুল ফজেল উভয়েই সুপণ্ডিত সেখ মোবারকের পুত্র। সেখ মোবারকের পিতৃপিতামহগণ আরবদেশীয় হইলেও তাঁহারা বহুপূর্ব্ব হইতে রাজপুতানার অন্তর্গত নাগর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। যোগ্যপুত্রদ্বয় যোগ্যপিতার নিকট হইতে বাল্য হইতেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ফৈজি ১৫৪৭ খৃঃঅব্দে আগ্রার সান্নিধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়সে ফৈজি আকবর হইতে ৫ বৎসরের কনিষ্ঠ। ফৈজি সাহিত্যচর্চ্চায় ও চিকিৎসা ব্যবসায় দিনপাত করিতেন। কবি বলিয়া তাঁহার নাম ক্রমে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বিনামূল্যে দরিদ্ররোগীসকলকে চিকিৎসা করিয়া এবং দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ফৈজি নিজে সিয়া, সুন্নিগণ তাঁহার বৈরী। আকবর চিতোর অবরোধ কালে সুখ্যাতি শুনিয়া ফৈজিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুন্নিগণ ভাবিল এইবার ফৈজির আর নিস্তার নাই। তাহারা ফৈজিকে বন্দিভাবে আকবরের নিকট প্রেরণ করিল। কিন্তু বাদসাহ তাঁহার অশেষ-গুণ ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সদয়-ভাবে গ্রহণ করিলেন, এবং নিজপুত্রগণের উচ্চ শিক্ষা জন্য ফৈজিকে নিয়োগ করিলেন। সময়ে সময়ে বাদসাহের আদেশে ফৈজিকে দৌত্য-কার্য্য করিতে হইত।

ফৈজি অবসর পাইয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। ৩৩ বৎসর বয়সে ফৈজি রাজকবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সাত বৎসর পরে ফৈজির মৃত্যু ঘটে। ফৈজির কবিতাসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার নিজ পাঠাগারে সংগৃহীত হস্ত-লিখিত পুস্তক সংখ্যা প্রায় চারি সহস্র ছিল।

আইন-আকবরি রচয়িতা সেখ আবুল ফজেলের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। আবুল ফজেলের জন্ম খৃঃ ১৫৫১ সালের ১৪ই জানুয়া-

রিতে ঘটে। আবুল ফজেল এমনই বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন, যে পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই তিনি বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং ২০ বৎসর বয়সে স্বাধীন ভাবে অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতা ও সহোদরের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদারতা বাদসাহ আকবরকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে আবুল ফজেল বাদসাহ সভায় আসিয়া প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিলেন। আবুল ফজেলের বয়স ২৩ বৎসর, এই বয়সেই তিনি নিজভাষায় প্রকাশিত ও প্রচলিত যাবতীয় পুস্তক পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু আবুল ফজেল বলিতেন "আমার মনের শান্তি নাই; আমার প্রাণ মঙ্গোলিয়ার পণ্ডিত, লেবাননের সাধু, তিব্বতের লামা, পর্টুগালের পাদ্রী, পারস্যের ধর্ম্মযাজক, জেন্দাভেস্তার উন্নত উপাসকের সহিত আলাপ করিতে ব্যাকুল। নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতির গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িয়াছে।"

আবুল ফজেলের সহিত আকবরের প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আকবর কখন বা রণক্ষেত্রে কখন বা শীকারে কখন বা রাজ্য-শাসনে ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু তাহাতে তত আনন্দ পাইতেন না, যত আনন্দ সমদর্শী আবুল ফজেলের সহিত ধর্ম্মান্ধ মৌলবীদিগের বিচার-শ্রবণে। এই যে ধর্ম্মালোচনা ইহা আকবরের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাদসাহ হইয়া প্রথম ২০ বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার কাটিয়া যায়। কিসে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিসে বিভিন্ন জাতির অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে আকবর এক্ষণে প্রয়াসী হইলেন। আকবর ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, যে রাজ্যের স্থানে স্থানে সৈন্য রক্ষায় বিজিত দেশে কিছুতেই অক্ষয় শান্তি-প্রতিষ্ঠিত হয় না; কিন্তু শাসিত প্রজাগণের হৃদয়ের আশা, মনের ভাবগতি সম্যক উপলব্ধি করিয়া, যথাসম্ভব উহার তৃপ্তিদানকল্পে চেষ্টা না পাইলে, সে রাজ্যের কিছুতেই কল্যাণ নাই। বাদসাহ ঠিকই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদি কোন সমধিক কবিতাপ্রিয় ভাব-প্রধান জাতি পৃথিবীতে থাকে, তবে তাহা হিন্দুজাতি; পূর্ব্বপিতৃ-পিতামহগণের সহিত অচ্ছেদ্য যোগ—প্রাচীন-গৌরব জাগাইয়া রাখিতে যদি কোন জাতি বিশেষ ভাবে সমুৎসুক, তবে তাহা হিন্দুজাতি। চারিশতবৎসরব্যাপী বিদেশীয় কর্ত্তৃক ভারতবিজয় কাহিনী আকবর সন্ধান লইয়াছিলেন। বিদেশীয় শাসন কেন যে এতকাল ভারতে স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণও পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। আকবর দেখিলেন, বিজিতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে চলিবে না; বিজিতকে সম্মান করিতে হইবে, তাহাদের জাতি ধর্ম্মের ও প্রাচীনত্বের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে, সকলকে এক ভাবে বাঁধিতে হইবে এবং ধর্ম্মে ও মতে উদারতা স্থাপন করিতে হইবে।

আবুলফজেলের সহিত আকবরের পরিচয় হইবার পূর্ব্বে বাদসাহ উপরুক্ত নিজ অভীষ্ট সম্পাদনে একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ উপদেশ দিবার তাঁহার কেহই ছিল না। মুসলমান সাঙ্গোপাঙ্গগণ বিজিতগণের উপর নির্য্যাতনের উপদেশ দিত। বাদসাহের উপর ধর্ম্মান্ধ মৌলবীগণের প্রভুত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। আবুলফজেলকে পাইয়া তিনি ঐ সকল ক্ষীণদর্শী মৌলবীর হিন্দু-বিদ্বেষ কলুষিত পরামর্শ ও যুক্তি পরিহার করিতে লাগিলেন। বিজিত হিন্দুগণকে দায়ীত্বপূর্ণ

রাজকার্য্যে নিয়োগের মূল্যবত্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। ফতেপুর সিক্‌রির এবাদাৎখানা প্রাসাদে বসিয়া প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে বাদসাহ পণ্ডিত-মণ্ডলী লইয়া বিচার ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। বাদসাহ দেখিলেন, মুসলমান ধর্ম্মের ভিতরেও নানা সম্প্রদায়, পরস্পরের মধ্যে কেবলই বিবাদ-বিসম্বাদ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত, অবসর পাইলে তাহারা পরস্পরকে অপদস্থ করিতেও বিশেষ ব্যগ্র। আকবর আদেশ করিলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভবিষ্যতে এইরূপ অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তদ্দণ্ডেই রাজদরবার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এক বৃহস্পতিবার রজনী মুখে এবাদাৎখানায় সভা হইয়াছে। আবুল ফজেল প্রস্তাব তুলিলেন, যে বাদসাহ যে কেবল সাম্রাজ্যের রাজা তাহা নহে, প্রজাবর্গের ধর্ম্ম-বিষয়ে—আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তাঁহাকে গুরু ও নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাদসাহ জানিতেন, কোরাণের এমন অনেক স্থান আছে, মৌলবীরা যাহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন; এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা হজরত মহম্মদের নৈতিক জীবনে দোষারোপ করিতে অসঙ্কুচিত। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এরূপ সাব্যস্ত হইল, বাদসাহ যে কেবল রাজ্যের ন্যায়বান রাজা তাহা নহে, কিন্তু তিনি "মুজতাহিদ" অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে অভ্রান্ত। মোলবীগণ গত্যন্তর না দেখিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে আকবরের নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইতে স্বীকার পাইল এবং অঙ্গীকার-পত্রে কেহ বা ইচ্ছায় কেহ বা অনিচ্ছায় নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিল।

আবুল ফজেল বলেন যে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফল অতীব কল্যাণগর্ভ হইয়াছিল। এক উদারতার যুগ আবির্ভূত হইল। রাজদরবারে অবাধে বিভিন্ন ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল, বিভিন্ন ধর্ম্মের মনোজ্ঞ উপদেশাবলী অবাধে গ্রাহ্য হইতে লাগিল। মতের ঔদার্য্যের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ভিতরে মৈত্রী স্থাপিত হইতে চলিল, অনুদার ও ক্রূরভাবাপন্নগণ তদ্দৃষ্টে লজ্জায় অবনতমস্তক হইতে লাগিল। আবুল ফজেলের প্রাজ্ঞ বৃদ্ধপিতা পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার সময় বলিয়া ছিলেন, হায়! যে উদার যুগের জন্য আমি সারা জীবন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই শুভসময় আসিয়া উপস্থিত।

আকবর এক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন। তিনি তাঁহার হৃদ্গত শুভ কামনা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্ব্ববিষয়ে উদারতা তাঁহার রাজ্যের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু পার্শী খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার রাজদরবারে যাতায়াত করিবার অধিকার পাইয়াছে। আকবর নিজ ঔদার্য্যে বীরহিন্দুরাজগণকে টানিয়া আনিয়া সাম্রাজ্যকে অচলপ্রতিষ্ঠ করিতেছেন।

বাদসাহের সহিত আবুলফজেলের মৈত্রী অক্ষুণ্ণ দেখিয়া ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত। এই বিদ্বেষফলে আবুল ফজেলকে পরে প্রাণ হারাইতে হয়। আকবর তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ কৃত করিলেন। তাঁহার প্রধান বিচারক সুন্নি ছিলেন, তিনি সিয়াগণকে নির্য্যাতন করিতেন বলিয়া বাদসাহ তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন। আদেশ দিলেন হিন্দু মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, রাজদ্বারে

সমান বিচার প্রাপ্ত হইবে। প্রভুত সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ ফৈজি ও আবুল ফজেল উভয়েই বাদসাহের আদেশে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা বাদসাহের সঙ্গে বিভিন্ন দেশজয়ে গমন করিয়া অবসর মতে বাদসাহকে রাজস্ব বিভাগে এবং বিভিন্ন সংস্কার-কার্য্যে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

আকবর অতঃপর নিজ ধর্ম্মমত দেশকালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্টিত। "দিন ই ইলাহি" বলিয়া উহা খ্যাত। বাদসাহ নিজে ধর্ম্মের রক্ষক, এবং ঈশ্বর এক, ইহা বিঘোষিত হইল। নেমাজের জন্য নূতন মন্ত্র রচিত হইল। কিছু কিছু ভাব হিন্দু ও পার্শী ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইল। পার্শীদিগের শকাব্দা বাদসাহ দপ্তরখানায় প্রচলিত হইল। ভগবান দাস, মানসিং, টোডারমল, বীরবলের মত অসামান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল। আকবর ফৈজিকে দিয়া নূতন বাইবেল পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইলেন, এবং গোয়া হইতে পাদ্রী রোডোফো একোয়া ডিভাবেকে আগ্রায় আনাইলেন। ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, য়িহুদি ও পার্শী পণ্ডিত-মুখে ইবাদতখানায় বাদসাহ বিভিন্ন ধর্ম্মমত শুনিতে লাগিলেন। সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন ও প্রতিপন্ন করিতে ব্যাকুল। কেহ বা রোষ ভরে অধীর; তাহা দেখিয়া বাদসাহ বলিলেন "অন্তরে বিশ্বাস সুদৃঢ় না হইলে বাহিরে ধর্ম্মের ভাণে কি হইবে। আমি অনেক ব্রাহ্মণকে ভয় প্রদর্শনে মুসলমান করিয়াছি; কিন্তু সত্যালোকে আমার অন্তর এক্ষণে আলোকিত। তোমরা নিজ নিজ মতের অভিমানে অন্ধ। কিন্তু প্রমাণ না পাইয়া একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। যে পথ যুক্তিবলে প্রতিপন্ন, তাহাই ঠিক। কেবল প্রার্থনা আবৃত্তি, ত্বকচ্ছেদ, ভূমিতে মস্তক অবনত করিলে কি হইবে। ঐকান্তিকতা অভ্যাস কর।" তিনি মুসলমানদিগের প্রতি কঠোর ছিলেন; তিনি জানিতেন, বিজেতা বলিয়া তাহারা হিন্দু-নির্য্যাতনে রত। ধন্য উদারতা! হায় সভ্যতাভিমানী আমাদের বর্ত্তমান বিজেতাগণ, আকবরের এই অতুল্য সমদৃষ্টি বিংশ শতাব্দীতেও প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না।

আকবরকে অনেকে জোরোয়াষ্টার-ধর্ম্মী বলিত, কেন না তিনি সূর্য্যের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে ভাল বাসিতেন। বাদসাহ অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বৈরী হইয়া, যাহাতে সে ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করিতে না পারে, সেই দিকে আকবরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজ্যের ভিতরে আকবর ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মের নামে নর-হত্যা না হয়, তাহার দিকে তাঁহার খর দৃষ্টি ছিল। যে হিন্দু ললনা মৃত-স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে অনিচ্ছুক, যাহাতে তাহার উপর বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ না হয়, তদ্বিষয়ে আকবরের বিশেষ শাসন ছিল।

ক্রমশঃ।

নানা-কথা।

নবধর্ম্ম।—আমরা গত চৈত্রের পত্রিকায় রেভাঃ ক্যাম্বেলের প্রচারিত নবধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, এবং তাঁহার মতের কতক আভাসও দিয়াছি। তিনি বলেন "সাধারণ লোকের ধারণা এইরূপ, যে পরমেশ্বর জগতের কোন অতীত প্রদেশে স্থিতি করিয়া সেখান হইতে তাঁহার সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং জগজ্জীবী

মনুষ্যের কুকার্য্যে বিরক্ত হইয়া উহার প্রতিবিধান মানসে আপন পুত্র ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, যে ঈশার কষ্ট-ভোগে ও ক্রুশে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ঈশা যে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। বিশ্বাসে অনুরাগে ও সেবাতেই ঈশ্বরের সমীপস্থ হওয়া যায়। আমরা সকলেই যে ঈশা—তাঁহারই পুত্র, ঐই রূপেই তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারি। ঈশার হত্যাকারী সকলেই জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিল। বিচার-দোষেই ঈশার ক্রুশদণ্ড ঘটে। ঐরূপ জঘন্য প্রকৃতির লোক সকল দেশে সকল সময়েই আছে। ঈশা যদি আপন পরিচয় না দিয়া আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ঐ রূপ নৃশংস-ভাবে তাঁহার মৃত্যু যে পুনরায় না ঘটিবে, তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে। অনেকে বলেন, ঈশার মৃত্যুতেই আমাদের পরিত্রাণ সম্ভবপর হইয়াছে। পরিত্রাণ! এ কি কথা! ঈশ্বর কি আমাদের ঘোর শত্রু, যে তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ চাই। তিনি কি আমাদের পিতা, জীবনের উৎস, পরমধাম, একমাত্র গম্যস্থান নহেন। তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ কি? কেনই বা আমরা তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ চাহিব। খৃষ্টধর্ম্মের কথিত মুক্তি, বিচার দিন, মুক্তিদানে ঈশার ক্ষমতা ও অধিকার, এ সকলই অর্থহীন জল্পনা। কে উহা বিশ্বাস করিতে চায়। ঐ সমস্ত ভ্রান্ত-ধারণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

জাপান-টাইম্‌স।—জাপান টাইম্‌স নামক সংবাদ পত্র বলেন যে "ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-সংখ্যা সামান্য হইলেও আমেরিকার একেশ্বরবাদী এবং জাপানের নব-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। শিক্ষা-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বর্ত্তমানে অনেকগুলি যুবা স্বদেশীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছেন। এই জাপানেই তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। ধর্ম্মসংস্কার ও শিল্পের উন্নতি-লইয়া লোকের মনে যে আগুন জ্বলিয়াছে, ক্রমে তাহা রাজনীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভারতে বিভিন্ন জাতিবর্ণ থাকিলেও সকলে একতার জন্য বিশেষ লালায়িত। এক্ষণে ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশে যাতায়াতের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। লর্ডকর্জ্জনের প্রবর্ত্তিত শাসননীতির উপর ভারতবাসীর বিরাগ-ফলে সকল চেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ছায়া পড়িয়াছে। শান্ত ভাবে আন্দোলন চলে, ইহাই প্রার্থনীয়।"

শিল্প-শিক্ষা।—বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা সমিতির আনুকূল্যে এ বৎসর ৯৮ জন ছাত্র শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছে। এই সভা চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিল। প্রথম বর্ষে এই সভা হইতে ১৬টি ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হয়, দ্বিতীয় বর্ষে ৪০টি ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ কয়েকটি ছাত্রকে উৎসাহ দিবার জন্য যে সান্ধ্য-সমিতি টাউনহলে বসিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গের ছোট-লাট উপস্থিত ছিলেন। এ সভা হইতে বাস্তবিকই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। শিল্প-শিক্ষা ও উহার বিকাশ ভিন্ন আমাদের দৈন্য কিছুতেই ঘুচিবে না। উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আগামী মার্চ্চ মাসে ৯১টি যুবাকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনি, আমেরিকা ও জাপানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। উক্ত সভার সঙ্কল্প যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত। সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য ও অর্থ-সাহায্য ভিন্ন ঈদৃশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হওয়া বড় কঠিন। জাহাজওয়ালা আপকার কোম্পানি ও বি আই এস এন কোম্পানি ঈদৃশ পাঠার্থী যুবকগণের জন্য ভাড়াও কম করিয়া দিয়া সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাত যাত্রা।—বরোদার গাইকবাড়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আলোয়ারের মহারাজা বিলাতযাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বরোদাপতি বিদেশ ভ্রমণে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অথচ জাতীয়-ভাব পরিহার করেন নাই, ইহাই আমাদের বিশেষ আনন্দের।

প্রাচীন-কীর্ত্তি-রক্ষা।—লর্ড কর্জ্জনের অন্যান্য ত্রুটি থাকিলেও এদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। লর্ড কর্জ্জনের ঐ ভাব ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আফগানস্থান এক সময়ে ভারতের অন্তর্ভূত এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সকলেরই লীলাভূমি ছিল। এখনও তথায় বৌদ্ধ ও হিন্দু সময়ের নিদর্শন ও শিখ-মন্দির বিদ্যমান। অমৃত-সরের প্রধান খাল্‌সা দেওয়ান, প্রাচীন শিখ-মন্দির অনুসন্ধান করিবার জন্য, ভাই করম সিংকে আফগানস্থানে পাঠাইতেছেন।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি।—সংবাদপত্রে প্রকাশ যে মাঞ্চেষ্টার হইতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিগত বৎসরেরই ভিতরে দেশীয় মূলধনে ১৫টি ব্যাঙ্ক, ৫টি নৌ (navigation) কোম্পানি, ৪০টি স্বদেশী দ্রব্য ভাণ্ডার, ১টি দেশলাইএর কল, .টি

কাচের কল, ২২টি সূতার কল, ২টি পাটের গাঁইট-বাঁধা কল, তৈল ও চিনির অনেকগুলি কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের মোট মূলধন-পরিমাণ ছয় ক্রোরের অধিক হইবে। এ সকলই ভারতের প্রকৃত সৌভাগ্য সূচনা করে।

মৎস্য-তত্ত্ব-শিক্ষা।—মৎস্য-তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য সার ফ্রেডারিক নিকলসনের(Sir Frederick Nicholson K. C. I. E.) প্রস্তাবে মান্দ্রাজ হইতে দুই জন ভারতবাসীকে জাপানে পাঠাইবার হইতেছে এবং সমুদ্রকূলে (Fishery Station) মৎস্য ধরিবার আড্ডা স্থাপনের কথা চলিতেছে।

মৃত্যু-সংখ্যা।—ভারতের স্বাস্থ্য-বিভাগের (Sanitary Commissioner, India) প্রধান কর্ম্মচারীর বিবরণীতে প্রকাশ যে ভারতবর্ষে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িতেছে। প্রতি সহস্রে ১৯০১ সালে ২৯ জন, ১৯০২ সালে ৩১ জন, ১৯০৩ সালে ৩৫ জন, ১৯০৪ সালে ৩৩ জন এবং ১৯০৫ সালে ৩৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ১৯০১ সালে গোরাসৈন্যের ভিতরে রোগে প্রতি সহস্রে ১০ জন ও দেশীয় সৈন্য ৮ জন মারা গিয়াছে। আতঙ্কের কথা বলিতে হইবে।

নিরামিষ-ভোজন।—জুনাগাড়ের লাভশঙ্কর লক্ষ্মীদাস (Anglo-Indian temperance Association, London) লণ্ডনের এংগ্লোইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স সভাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে বিলাতে মদ্যের ব্যবহার প্রতি বর্ষে কমিতে থাকিলেও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশে খৃষ্টিয়ানগণের ভিতরেও মদ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বোম্বাই-মিউনিসিপালিটির বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ,যে বান্দোরা সরকারি হত্যাশালায় ১৮৯৫ সালে গোহত্যার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার, ৯৬ সালে প্রায় ৩২ হাজার, ৯৮ সালে প্রায় ৩৫ হাজার, ৯৯ সালে প্রায় ৩৬ হাজার এবং ১৯০০ প্রায় ৩৭ হাজার হয়। ইহাতেই প্রতীয়মান, যে শুদ্ধ মদ্য কেন, মাংসেরও প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধির দিকে। বিলাতের (Smithfield Market) স্মিথফিল্ড্ বাজারের ১৯০২ সালের প্রকাশিত বিবরণীতে দেখা যায়, যে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও,বিক্রীত মাংসের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯০১ সাল অপেক্ষা ১৯০২ সালের নিহত-জীব-সংখ্যা ৩০ হাজার কম। যাহারা নিরামিষ-ভোজী, মদ্যের প্রচলন তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার Haig হেগ তাঁহার (Uric Acid) ইউরিক-এসিড নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, যে নিরামিষ-ভোজনে মদ্যের স্পৃহা চলিয়া যায়। ১৯০৫ সালের "Vegitarian" নিরামিষভোজী নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে নিরামিষ-ভোজন-ব্যবস্থায়(Salvation Army) মুক্তি ফৌজের একটি আশ্রমে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র নিরামিষ-ভোজন-ফলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বহুবর্ষের অভ্যস্ত অপরিমিত মদ্য-সেবন পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে এতই অসংযমী ছিল, যে অন্য কোন আশ্রমে তাহারা স্থান পায় নাই। লাভশঙ্কর ঐ সকল যুক্তি দেখাইয়া যাহাতে অপরিমিত মদ্য-সেবন সম্বন্ধে নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা প্রচারিত হয়, তাহার কল্পে temperance টেম্পারেন্স সভাকে তৎপোষক পুস্তকাদি প্রচার ও বিতরণ জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা লাভশঙ্করের আবেদনের যুক্তির দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

—

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৩৯॥ ৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৩৯৫॥৶৬
সমষ্টি	...	২৮৩৫ ৶৯
ব্যয়	...	৩২৬॥৵০
স্থিত	...	২৫০৮॥/৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২০৮॥/৯

২৫০৮॥/৯

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪০৫॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৫০৮॥/৯
সমষ্টি	...	২৯১৪। ৯
ব্যয়	...	৩৩০।৵০
স্থিত	...	২৫৮৩৸৵৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
অদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৩০০৲
সমাজেস ক্যাশে মজুত
২৮৩৸৵৯

২৫৮৩৸৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২১১৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজিকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়
১০৲

এককালীন।

শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার মিত্র
১৲

২১১৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২৯৯ ৶৯

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু
২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৲

কোম্পানীর কাগজের সুদ
৮৫৶৯

২৯৯৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।৵০
পুস্তকালয়	...	১৫।৵৬
যন্ত্রালয়	...	১০২॥৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৬ ৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৩৸০
সমষ্টি	...	৪৩৯॥ ৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৮৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৭ /৬
পুস্তকালয়	...	৷/৬
যন্ত্রালয়	...	১০১৸ ৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৭৸৶৯
সমষ্টি	...	৩২৬॥৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৲
পুস্তকালয়	...	১।৴০
যন্ত্রালয়	...	১৬১।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	২৭৲
সমষ্টি	...	৪০৫॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৩। ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২ ৶৩
পুস্তকালয়	...	॥৶৯
যন্ত্রালয়	...	৯৭ ৶৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৭ ৴০
সমষ্টি	...	৩৩০।৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২৪॥৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৫৮৩৸৶৯
সমষ্টি	...	২৯০৮।৶৯
ব্যয়	...	২৮৬।০
স্থিত	...	২৬২২ ৶৯

জার।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৩০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৩২২ ৶৯

২৬২২ ৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০০৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০৲
পুস্তকালয়	...	১৭৸৶০
যন্ত্রালয়	...	৯০।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৬।০
সমষ্টি	...	৩২৪॥৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৭। ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৶০
পুস্তকালয়	...	১॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৮৮৷৶৯
সমষ্টি	...	২৮৬।০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।
৭৬০ সংখ্যা
১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

শাস্ত্রালোচনা।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি তাহা আমার গতবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল। অদ্য সেই বিষয়ে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য, যাঁহারা শাস্ত্রের গণ্ডীর ভিতরে রহিয়াছেন, শাস্ত্রকেই যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের দেখা উচিত ঐ গণ্ডীর স্বরূপ কি। তাহাতে যাহা আছে সকলই কি সত্য, সকলই কি গ্রাহ্য, না শাস্ত্রের ভিতর হইতে কতক ছাড়িবার, কতক বাছিয়া লইবার সামগ্রী আছে? আমরা মুখে বলি, বেদই সকল শাস্ত্রের মূল। কিন্তু বেদে বায়ু বরুণের স্তবস্তুতি, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড, বেদের নিয়োগপ্রথা আজকালকার পক্ষে কতদূর উপযোগী। আর এক কথা। বেদই যদি সকলের মূল হইল তাহা হইলে দেখা উচিত আমাদের আধুনিক আচার-পদ্ধতি কতদূর বেদ-সম্মত। আমাদের মধ্যে যে পৌত্তলিক উপাসনা, যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত বেদ হইতে তাহার কতদূর সায় মিলে। যাঁহারা দেশাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাদের ভ্রম সংশোধনের উপায়। অনেকস্থলে শাস্ত্র দেশাচারের বিরোধী, সমাজসংস্কারের পোষক। আমাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার আদর নাই কিন্তু দেখুন শাস্ত্রে তাহার কিরূপ পোষকতা করে। “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ” ইহাই শাস্ত্রের বাণী। বালবিধবার বিবাহের আবশ্যকতা যদিও মনে বুঝিতে পারি, কিন্তু দেশাচার উহার বিরোধী। বিদ্যাসাগর শাস্ত্র হইতে পোষক বচন বাহির করিয়া দেখাইলেন

> “নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ,
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে”।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, দেশাচারই আমাদের শাস্ত্র।

শাস্ত্রানুশীলন একালে অপেক্ষাকৃত সহজ। পূর্ব্বে যত বাধা যত কাঠিন্য ছিল, এক্ষণে তাহা চলিয়া গিয়াছে। অনুবাদের সাহায্যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের

গবেষণার ফলে, শাস্ত্র-অধ্যয়নের পথ অনেকটা সুগম হইয়া পড়িয়াছে। বেদ উপনিষদ, দর্শন শাস্ত্র, রামায়ণ মহাভারত যাহা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অনুবাদে সহজে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায়। "প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ" বলিয়া পণ্ডিত মোক্ষমুলার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বহুমূল্য রত্ন খণি। উহাতে বৈদিক সূক্ত, উপনিষদ, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলির ইংরাজি অনুবাদ দেখিবেন। বেদান্ত দর্শন শঙ্কর ও রামানুজের টীকা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে বেদ বেদান্ত অভ্যাস করিতে হইলে সমস্ত জীবন চলিয়া যাইত, এক্ষণে আর তাহা আবশ্যক হয় না।

আমাদের শাস্ত্রাধ্যয়নের সময় এক কথা মনে রাখিতে হইবে যে শাস্ত্রের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকলই অন্ধকার। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কোন্ কোন্ শাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তীকালে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে কতক পরিমাণে আলোক পড়িয়াছে। সেকন্দর সম্রাটের ভারত আক্রমণ সময়ে গ্রীষীয়-ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, অশোকের অনুশাসনে, তাম্রলিপি আবিষ্কারে, কালনির্ণয়ের কতক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের আভ্যন্তরিক অবস্থা নির্ণয় করা সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে।

সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে, শ্রুতি প্রাচীন, স্মৃতি তাহার পরবর্ত্তী। পুরাণ উহাদেরও পরবর্ত্তী এবং তন্ত্র আধুনিক সময়ের। অতিপ্রাচীন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ সত্যকে শ্রুতি বলা যায়। উপনিষদ শ্রুতির অন্তর্গত। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে প্রাচীন ও আধুনিক শাস্ত্র অনুমান করিয়া লইবার প্রতীতিজনক দিগ্‌দর্শনের অভাব এখনও রহিয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া সহজে যে সত্যসংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাও নহে। কতপ্রকার ভাব, কতপ্রকার মত উহার অন্তর্গত। ধর্ম্মবিষয়ে প্রধান মতভেদ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের গুরু শঙ্করাচার্য্য। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। মূলে সেই একই বেদান্তদর্শন, অথচ দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবে তাহার ত্রিবিধ টীকা ও ভাষ্য। এই মতভেদের কারণ কি? এই সকল আচার্য্যেরা জ্ঞাতব্য প্রপঞ্চবিষয়ে এক একটা সিদ্ধান্তে পূর্ব্বেই উপনীত হইয়াছিলেন, প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই স্বাধীন চিন্তার ফল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রচার করিলেন; শ্রুতিকে নিজ নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যাত করিলেন। শঙ্করের সময় শৈব বৈষ্ণব, কাপালিক নানা মতের প্রাদুর্ভাব। শঙ্কর নূতন শাস্ত্র ছাড়িয়া পুরাতন শাস্ত্রের আশ্রয় লইলেন। বেদ উপনিষদ, গীতাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন শাস্ত্রকে যেমন ইচ্ছা, তেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। অগ্রে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা একটি দর্শন গড়িয়া লও, পরে তদনুসারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল। "শাস্ত্র মৃত। শাস্ত্র কথা কহে না। তুমি যেমন ভাবে শাস্ত্রকে বলাইবে, শাস্ত্রও ঠিক তেমনি বলিবে। শাস্ত্র তোমার প্রতিভার অধীন।" এইরূপে শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ গীতা প্রভৃতি

শাস্ত্র নিজের অদ্বৈত মতে গড়িয়া লই-লেন। তৎপরে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য উদিত হইয়া স্ব স্ব মত প্রচার করিলেন। এইরূপে দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নানা প্রকার বেদান্ত ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইল। স্বাধীন চিন্তা কিয়দংশে রক্ষিত হইল সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। লোক-সংগ্রহের জন্য অন্ততঃ মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল।

আর্য্য সমাজের প্রণালীও ঐরূপ। তাঁহারা বেদের প্রামাণ্য ঘোষণা করেন, কিন্তু বেদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া—আপ-নার মনের মত গড়িয়া তুলিয়া সেই বেদকে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি করিতে সচেষ্ট। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে লোক-ভুলানো কৌশলের উপর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা কখনই ফল-দায়ী হইতে পারে না। বালীর বাঁধের উপর গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় তাহা ক্ষণভঙ্গুর। ধর্ম্মের ভিত্তি সত্য, অন্ধ বিশ্বাস নহে। সত্য যে দিকে লইয়া যাইবে সেই দিকেই যাই-বার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রানুশীলনের আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্র একমাত্র প্রামাণ্য নহে। নানা প্রমাণের মধ্যে উহা অন্যতম। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে যাহা বেদে আছে তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা ফলে দেখিতে পাই, শ্রুতিস্মৃতি ছাড়িয়া আমরা দেশাচারকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছি। দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, আহ্নিক, বারমাসের তের পার্ব্বণ, এইরূপ সংখ্যাতীত ক্রিয়াকলাপ পঞ্জিকাদৃষ্টে সম্পন্ন করিয়া মনে করি ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব। অনেক সময়ে যাহা ধর্ম্মের খোষা তাহাই সার বলিয়া মানি; যাহা ছায়া তাহাকেই সত্য জ্ঞান করি।

তবে ধর্ম্ম কি? শাস্ত্র বলিতেছেন—

> বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
> এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং।

শাস্ত্র, দেশাচার, আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের এই ত্রিবিধ লক্ষণ। শাস্ত্র ছাড়িয়া দিলে দাঁড়ায় এই যে আত্মতুষ্টি এবং অহিংসা বা লোকহিত এই দুই ধর্ম্মের প্রমাণ। প্রথম, যাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহাই অনুষ্ঠান করি-বেক। "মনঃ পূতং সমাচরেৎ"

> "যৎকর্ম্মকুর্ব্বতোস্যসাৎ পরিতোষো হন্তরাত্মনঃ,
> তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতস্তু বর্জ্জয়েৎ"।

যে কর্ম্ম করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তা-হাই যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্বিপ-রীত যাহা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

দ্বিতীয়, লোকহিত। যাহাতে জন-সাধারণের কল্যান হয় তাহাই আচরণীয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলমন্ত্র অহিংসা বা লোকহিত। শাস্ত্রে ভূরি ভূরি এইরূপ বচন আছে যে দয়াতেই ধর্ম্ম, "নচ ধর্ম্মো দয়া-পরঃ"

> নোপকারাৎ পরং পুণ্যং নাপকারাদঘং পরম্
> ন ভূতানামহিংসায়াঃ জ্যায়ান্ ধর্ম্মোস্তি কশ্চন"।
> "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"
> "যদানকুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ
> কর্ম্মণামনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা,"
> সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ
> তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ"।

দয়াধর্ম্মের গৌরব সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ অনেকানেক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমি বলি অন্তরাত্মার পরিতোষই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সে দিন ভবানীপুরে নফরচন্দ্র কুণ্ডু নর্দ্দামার গর্ত্তে নিপতিত দুইজন কুলির প্রাণরক্ষার জন্য অকা-তরে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকে না। কিন্তু তাহা কে নির্ণয় করে? শাস্ত্র নহে—শাস্ত্রে বলে হীনবর্ণের লোককে স্পর্শ করাও দোষাবহ; নর্দ্দমার

কর্দ্দমে দেহকে কলুষিত করাতে দোষ। তবে কি স্বজনরক্ষা বা লোকপ্রশংসা তাঁহার ঐ কার্য্যের নিয়ামক ছিল? তাহাও নহে। কেবল ধর্ম্মের আদেশে, অন্তরাত্মার প্ররোচনায় তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং ইংরাজ বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া ঐ মহাত্মার স্তুতিবাদ করিতেছে।

ধর্ম্ম কি তাহা জানা সহজ, তাহার অনুষ্ঠানই কঠিন। অন্তরাত্মা হইতে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের আদেশ—কর্ত্তব্যের আদেশ আসিতেছে। মন্বাদি ঋষিরা যে ঐশ্বরিক আদেশ পাইয়াছিলেন, এখনও প্রতি সাধু-হৃদয়ে সে আদেশ-বাণী আসিতেছে। হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই আমরা তাহা শ্রবণ করিতে পারি। নানা কারণে আমরা ঈশ্বরের সহিত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার সেই গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিতে পাই না। তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, আপনাকে প্রস্তুত কর, হৃদয়কে পবিত্র কর, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার নিকট অগ্রসর হও, অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইবে এবং তাঁহার প্রেরিত সত্যালোকে আপনার গন্তব্য ধর্ম্মপথ পরিস্ফুট হইবে।

> জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তুতং
> পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

অদৃশ্যমগ্রাহ্যং।

ঈশ্বর আমাদের নিকট "অদৃশ্যমগ্রাহ্যং"। তিনি চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হন না, হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। গীতায় ভগবান বলিতেছেন ঃ—

> "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ
> মূঢ়োয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ং।"
>
> গীতা।

আমি যোগমায়ায় সমাবৃত থাকিয়া লোকের নিকট অপ্রকাশিত থাকি এই হেতু অজর অমর যে আমি আমাকে মূঢ় ব্যক্তি দেখিতে পায় না। ঈশ্বরকে কেন আমরা দেখিতে পাই না। আমরা সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, স্বার্থ সাধনে—আপনার মান,আপনার যশ খ্যাতি-প্রতিপত্তির পশ্চাতে ধাবিত হইতেছি, তাই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আমরা বিভ্রান্ত হইয়া মনে করি তিনি দূরে। গীতায় যেরূপ আসুরিক লোকের চিত্র অঙ্কিত আছে, আমাদের অনেকের অবস্থা সেইরূপ। তত্ত্বজ্ঞানহারা হইয়া আমরা মনে করি, ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই। বিষয়-লালসা ধনমদ আত্মাভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া, আমরা আপনাকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত মনে করিয়া গর্ব্বিত ভাবে সঞ্চরণ করিতেছি এবং নিজ নিজ হৃদয়পুত্তলীর সেবাতে অহরহ নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি; তাই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে অপ্রকশিত রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা তাঁহার স্থানে উপদেবতা প্রতিষ্ঠা করিতেছি, ইহা হইতেই আমাদের এই দুর্গতি। ফরাসিস্ বিপ্লব সময়ে মনুষ্যের প্রজ্ঞা (reason) ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল; এদেশে বৌদ্ধগণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, ধর্ম্মকে নীতির উপরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নির্ব্বাণ চাহিল। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার সেবা হইতেই আমাদের দুর্গতি। ভারতবর্ষ সত্য সত্যই যে এইরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনে হয় না। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আমাদের আদর্শ উচ্চতর। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঋষিবাক্য ভগবদ্ভক্তির মার্গ অনাদিকাল হইতে প্রদর্শন করিতেছেন। ঐ পথ অনুসরণ কর। প্রাচীন ঋষিরা জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে

ব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেচ" ঈশ্বর দূর হইতে সুদূরে, আবার তিনি আমাদিগের এত নিকটে, যে হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান। তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন, "তমাত্মস্থং যেনু-পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী।" যাঁহারা তাঁহাকে অন্তরের অন্তর করিয়া দেখেন, অপার তাঁহাদের শান্তি। ঈশ্বর স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে কেবলমাত্র বিরাজিত নহেন। সমস্ত বিশ্বে সকল কালে তাঁহার সমান আবির্ভাব। তিনি কোন এক স্থলে স্থায়ী হইয়া এই বিশ্বচরাচর শাসন করিতেছেন তাহা নহে। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, এবং চিরকালই থাকিবেন।

আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া কি কহিবে তিনি নাই ? এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসার সত্য, আর যিনি সর্ব্বমূলাধার, তিনি কি নাই ? আমরা নিজে অন্ধ, তাই বলিয়া কি সেই জ্যোতিস্বরূপ নাই ? যিনি আশ্রয়রূপে থাকাতেই এই জগৎ সংসার বি-ধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে তিনি নাই ? যাহা ছায়া, তাহাই কি সত্য ? আর যিনি সত্য তিনিই কি ছায়া হইলেন ? তিনি কি আমাদের সঙ্গের সঙ্গী নহেন ? তিনি কি আমাদের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন না ? পুণ্যপথ প্রদর্শন করিতেছেন না ? অভয়-মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদের পাপ-তাপ নির্ব্বাণ করিতেছেন না ? আমরা অন্ধ বলিয়া কি তাঁহার জ্যোতি অপ্রকাশিত থাকিবে ? না, তাহা নহে। তিনি আমাদের জীবনে মৃত্যুতে সম্পদে বিপদে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্ব-ত্রই রহিয়াছেন। যেখানে ন্যায় যেখানে সত্য, সেখানে তিনি; যেখানে সাধুতা, যেখানে মঙ্গল সেখানে তিনি। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোকে যেখানে সচেষ্ট, সেখানে তিনি; যেখানে নিঃস্বার্থতা—পরের জন্য আত্মত্যাগ, সেখানে তিনি; যেখানে শান্তি, সেখানে তিনি বিরাজমান।

কে বলে তাঁহাকে দেখা যায় না ? হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, এখনই তাঁহার দর্শন পাইবে। তাঁহাকে দেখিতে অভ্যাস কর, বুঝিবে তিনি দূরে নহেন। গৃহ-কর্ত্তার ন্যায় তিনি ক্ষণেকের জন্য গৃহ ছাড়িয়া অদৃশ্যে রহিয়াছেন, ভৃত্যদিগের উপরে সমস্ত নির্ভর স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং পরীক্ষা করিবার জন্য অন্তরাল হইতে দেখিতেছেন, যে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছে কি না। পিতার ন্যায় পুত্রকে আত্মরক্ষণের ভার দিয়া তিনি আপনি নিভৃতে স্থিতি করিতেছেন। তিনি চান, আমরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া শিক্ষিত ও বলিষ্ঠ হই, আত্ম-নির্ভর শিক্ষা করি। কিন্তু তা বলিয়া আমারদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখেন নাই। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়া-ছেন, দিব্যজ্ঞানে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাক।

সেই ব্রহ্মই আমাদের লক্ষ্য। সকলে ব্রহ্মের অনুরূপ হইতে সচেষ্ট হও, তাঁহার সাদৃশ্য ধারণ কর, স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, উন্নত আশা হৃদয়ে পোষণ কর, কর্ত্তব্যের আদেশে হীনতা পরিহার কর, প্রবৃত্তি সকলকে ধর্ম্মের অনুগত কর। এই সকল উপায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইবে, ধর্ম্মভাব বিকশিত হইবে। যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি, সেই পরি-মাণে তাঁহাকে আত্মাতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ভ্রাতৃগণ! সাবধান যেন তোমাদের অন্তরের দীপ কোন কালে নির্ব্বাণ হইয়া না যায়। সে আলোক যে আত্মাতে প্রজ্ব-লিত, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। অন্তঃকরণ যাঁহার পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মদর্শন তাঁহার পক্ষে সুগম। তিনি দেখিতে পান

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ"

তিনি উপরে তিনি নীচে তিনি সম্মুখে তিনি পশ্চাতে তিনি চারিদিকে। সকল দিক উজ্জ্বল করিয়া তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। তাঁহাকে স্তব কর, জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ-সত্ব হইয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হও, যাহাতে সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম-দর্শনে চিরতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং মনুষ্য জন্মের চির-সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিল্পকলা।

প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে সুন্দরকে শুধু জানা ও ভালবাসাই মানুষের একমাত্র কাজ নহে; মানুষ উহাকে পুনরুৎপাদন করিতেও পারে। ভৌতিক কিংবা নৈতিক যে প্রকারেরই হউক না কেন, কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবা মাত্র মানুষ তাহা অনুভব করে, তাহাতে মুগ্ধ হয়, সৌন্দর্য্য-রসে আপ্লুত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি প্রবল হইলে, উহা বেশীক্ষণ নিষ্ফল থাকে না। যাহা হইতে আমরা একটা তীব্রতর সুখ অনুভব করি তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, পুনর্ব্বার অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়; যে সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে আমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়; সে যেমনটি ঠিক্ তাহাই নহে, পরন্তু আমাদের কল্পনা তাহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে সেইভাবেই তাহাকে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইতেই মানুষের নিজস্ব মৌলিক রচনার উৎপত্তি—শিল্পকলার উৎপত্তি। সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা এবং এই পুনরুৎপাদনের শক্তিকেই প্রতিভা বলে।

সৌন্দর্য্যের এই পুনরুৎপাদনের জন্য কোন্ কোন্ মনোবৃত্তির প্রয়োজন? সৌন্দর্য্যকে চিনিবার জন্য, অনুভব করিবার জন্য যে যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন ইহাতেও সেই সব মনোবৃত্তির প্রয়োজন। কলারুচি চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইলেই প্রতিভা হইয়া দাঁড়ায়,—যদি তাহাতে আর একটি উপাদান সংযোজিত হয়। সে উপাদানটি কি?

মনের সেই মিশ্র বৃত্তি যাহাকে রুচি বলে; তাহাতে তিনটি মনোবৃত্তির সমাবেশ আছে:—কল্পনা, রসবোধ, বুদ্ধি-বিবেচনা।

প্রতিভার স্ফূর্ত্তির পক্ষে এই তিনটি মনোবৃত্তি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। প্রতিভা, সৃজনী-শক্তিরই উপাধি; উহাই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ। কলা-রুচি অনুভব করে, বিচার করে, তর্ক বিতর্ক করে, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু উদ্ভাবন করে না। প্রতিভা উদ্ভাবক, ও স্রষ্টা। প্রতিভাবান পুরুষের মধ্যে যে শক্তি অবস্থিত, প্রতিভাবান পুরুষ সেই শক্তির প্রভু নহেন। তিনি যাহা অন্তরে অনুভব করেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার যে দুর্দ্দমনীয় জ্বলন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয় তাহাই তাঁহাকে প্রতিভাবান করিয়া তোলে। যে সকল ভাব, যে সকল কল্পনা, যে সকল চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করে তাহার দরুন তিনি কষ্ট অনুভব করেন। লোকে বলে, গুণীলোক মাত্রেরই একটু ছিট্ আছে। কিন্তু এ 'ছিট্' জ্ঞানেরই একটি দিব্য অংশ। সক্রেটিস, এই রহস্যময়ী

শক্তিকেই, তাঁহার "দানব" (দানা Demon) বলিতেন। ভল্‌টেয়ার ইহার নাম দিয়াছিলেন,—মূর্ত্তিমান সয়তান: প্রতিভাবান নাটককার হইতে হইলে, মন্ত্রের দ্বারা এই সয়তানকে আহ্বান করিতে হয়। নাম যাহাই দেও না কেন, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে—জানিনা সে জিনিসটা কি—যাহা প্রতিভাকে জাগাইয়া তোলে। এবং প্রতিভাবান পুরুষ যতক্ষণ অন্তরের ভাব বাহিরে ব্যক্ত করিতে না পারেন, স্বকীয় সুখ দুঃখ, স্বকীয় মনোভাব, স্বকীয় কল্পনাকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার মনে সান্ত্বনা নাই—আরাম নাই। অতএব প্রতিভাতে দুইটি জিনিস্ বিশেষ রূপে থাকা চাই। প্রথমত উৎপাদন করিবার জন্য একটা জ্বলন্ত আগ্রহ; দ্বিতীয়ত উৎপাদন করিবার শক্তি। কেননা, শক্তি বিনা শুধু আগ্রহ—সে একটা ব্যাধি বিশেষ।

কার্য্য সম্পাদনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনী শক্তি—মুখ্যরূপে ইহাই প্রতিভা। সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই কলারুচি সন্তুষ্ট। মিথ্যা প্রতিভা, জ্বলন্ত অথচ অকর্ম্মণ্য কল্পনা, নিষ্ফল স্বপ্নেই আপনাকে নিঃশেষিত করে,—সে এমন কিছুই উৎপাদন করে না যাহা বৃহৎ কিংবা মহৎ। কল্পনাকে সৃষ্টিতে পরিণত করাই প্রতিভার ধর্ম্ম।

প্রতিভা সৃষ্টি করে—নকল করে না। কেহ কেহ বলেন, প্রতিভা প্রকৃতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেন না, প্রতিভা প্রকৃতিকে নকল করে না। প্রকৃতি ঈশ্বরের রচনা; অতএব মানুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইহার উত্তর খুব সোজা। না, প্রতিভাবান পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তিনি ঐশী রচনার শুধু ব্যাখ্যাকর্ত্তা। প্রকৃতি তাঁহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করেন, মানব প্রতিভাও তাহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করে।

শিল্পকলা প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই কথা লইয়া পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই কথাটি আমরাও একটু বিচার করিয়া দেখিব। অবশ্য একভাবে দেখিতে গেলে, শিল্পকলা অনুকরণই বটে; কেন না, নিরবলম্ব নিরাধার সৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। যাহা প্রকৃতিরই অংশ সেই সব মূল-উপাদান ভিন্ন প্রতিভা আর কি লইয়া কাজ করিবে? কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন তাহার কি আর কোন কাজ নাই?—ঐ গণ্ডির মধ্যেই কি সে বদ্ধ? প্রতিভা কি বাস্তবের শুধু নকল-নবীশ? অবিকল নকল করাতেই কি তাহার একমাত্র গুণপনা? যে জীবসৃষ্টি আসলে অনুনকরণীয় তাহার অবিকল নকল করা অপেক্ষা নিষ্ফল উদ্যম আর কি হইতে পারে? যদি শিল্পকলা প্রকৃতির দাসবৎ শিষ্য হয়, তাহা হইলে সে শিষ্য নিতান্তই অক্ষম বলিতে হইবে।

যে প্রকৃত কলাগুণী সে প্রকৃতিকে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে, সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতির সকল পদার্থই সমান চিত্ত-বিমোহন নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিতে এমন একটা জিনিস আছে, যাহাতে করিয়া প্রকৃতি শিল্প কলাকে অনন্তগুণে অতিক্রম করে—সে জিনিসটা কি?—না জীবন। এই জীবনকে ছাড়িয়া দিলে, শিল্পকলা প্রকৃতিকেও অতিক্রম করে—কেবল যদি সে অবিকল অনুকরণের প্রয়াসী না হয়। যতই সুন্দর হউক না কেন, কোনও প্রাকৃতিক পদার্থই সর্ব্বাংশে নিখুঁৎ নহে। যাহা কিছু বাস্তব তাহাই অপূর্ণ। কোন কোন স্থলে দেখা যায়

লালিত্য ও শোভনতা,—মহান ভাব হইতে, শক্তির ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন। সৌন্দর্য্যের অবয়বগুলি বিক্ষিপ্তভাবে, বিভক্তভাবে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিলে,—কোন একটা নিয়মের অধীন না হইয়া, এ-মুখ হইতে একটা ঠোঁট, ও-মুখ হইতে একটা চোখ্ বাছিয়া লইলে—একটা অস্বাভাবিক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হয় মাত্র। এই নির্ব্বাচনে যদি কোন একটা নিয়ম অনুসরণ করা হয় তাহা হইলেই একটা আদর্শ স্বীকার করা হইল—যাহা ব্যক্তিবিশেষ হইতে ভিন্ন। যে ব্যক্তি প্রকৃত কলাগুণী সে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া এইরূপ একটা আদর্শ খাড়া করিয়া তোলে। অবশ্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়া এরূপ আদর্শ সে কখন কল্পনা করিতেও পারিত না; কিন্তু এই আদর্শটি পাইয়াই সে তাহার দ্বারা স্বয়ং প্রকৃতিকেও বিচার করে—সংশোধন করে; এমন কি প্রকৃতির সমকক্ষ হইতেও স্পর্দ্ধা করে।

কল্পনার আদর্শই গুণীজনের জ্বলন্ত অনুরাগ ও ধ্যানের বিষয়। চিন্তার দ্বারা বিশোধিত, ভাব-রসের দ্বারা সঞ্জীবিত যে আদর্শ সেই আদর্শটিকে নীরবে ও একান্তমনে ধ্যান করিতে করিতে গুণীজনের প্রতিভা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। কিরূপে সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায়—জীবন্ত করিয়া তোলা যায়, তৎপ্রতি গুণীজনের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা জন্মে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাহা কিছু তাঁহার কাজে লাগিতে পারে সেই সমস্ত উপাদান তিনি প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করেন এবং মাইকেল অ্যাঙ্গেলো যেরূপ মৃন্ময় মার্ব্বলের উপর তাঁহার খনিত্রের ঘাপ দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি স্বকীয় হস্তের প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সেই উপাদান হইতে এরূপ রচনা বাহির করেন যাহার অনুরূপ আদর্শ প্রকৃতির মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার সেই মানস-আদর্শেরই অনুকরণ করেন যাহা একপ্রকার দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিলেও হয়। ব্যক্তিত্ব ও জীবনের হিসাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায় যে, তাত্ত্বিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তাঁহার সেই রচনার উপর তাত্ত্বিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য মুদ্রিত থাকে।

নৈতিক সৌন্দর্য্যই সমস্ত প্রকৃত সৌন্দর্য্যের মূল। প্রকৃতি-রাজ্যে এই মূলটি একটু আচ্ছন্ন একটু প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ঐ আবরণ হইতে শিল্পকলাই উহাকে বিনির্ম্মুক্ত করে এবং উহাকে স্বচ্ছ করিয়া তোলে। শিল্পকলা, নিজের শক্তি সম্বল যদি ঠিক বুঝে, তাহা হইলে ঐ দিক্ হইতেই প্রকৃতির সঙ্গে সে টক্কর দিতে পারে এবং তাহাতে কতকটা সফল হইতেও পারে।

শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য কি প্রথমে তাহাই নির্দ্ধারণ করা যাক্। শিল্পকলার নিজস্ব শক্তি যেখানে, উহার চরম উদ্দেশ্যও সেইখানে। ভৌতিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কিরূপে নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় ইহাই শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য। ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই সাঙ্কেতিক রূপ। অনেক সময়ে এই সাঙ্কেতিক রূপটি প্রকৃতির মধ্যে তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শিল্পকলা উহাকে আলোকে আনিয়া উহার উপর এরূপ প্রভাব প্রকটিত করে যাহা প্রকৃতিও সব সময়ে সেরূপ করিয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃতি

চিত্তরঞ্জনে অধিকতর সমর্থ; কেন না প্রকৃতির রচনায় জীবন আছে—জীবন থাকায় কল্পনা ও নেত্র উভয়ই মুগ্ধ হয়। পক্ষান্তরে শিল্পকলা মর্ম্মস্পর্শ করে, কেন না উহা প্রধানতঃ নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া, মনের গভীর আবেগ সমূহের যে সূত্রস্থান একেবারে সেইখানে গিয়া আঘাত করে। এবং এই মর্ম্মস্পর্শিতাই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের নিদর্শন ও প্রমাণ। দুই প্রান্তই সমান বিপদজনক; এক, মৃত মানস-আদর্শ, আর এক মানস-আদর্শের অভাব। বাস্তব-আদর্শের (model) যতই কেন নকল কর না হয়ত সেই রচনায় প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অভাব হইবে; আবার নিছক্ স্বকপোলকল্পিত কোন রচনা করিলেও হয়ত এমন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিকতা আসিয়া পড়িবে যাহাতে কোন একটা বিশেষত্ব নাই।

কি পরিমাণে মানসের সহিত বাস্তবের—রূপের সহিত ভাবের মিলন হওয়া উচিত, প্রতিভা তাহা চট্ করিয়া ধরিতে পারে—ঠিক্ ধরিতে পারে। এই সম্মিলনই শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ। এবং ইহাই উৎকৃষ্ট রচনা সমূহের প্রকৃত মূল্য।

আমার মতে, শিল্পশিক্ষাতেও এই নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। লোকে জিজ্ঞাসা করে, ছাত্রেরা মানস-আদর্শের অনুশীলনের দ্বারা, না বাস্তবের অনুকরণের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করিবে? আমি কোন দ্বিধা না করিয়া এইরূপ উত্তর করি:—শিক্ষার আরম্ভে উভয়েরই অনুশীলন আবশ্যক। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী, বিশেষকে ছাড়িয়া সামান্যকে, কিংবা সামান্যকে ছাড়িয়া বিশেষকে আমাদের সম্মুখে কখনই অর্পণ করেন না। প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষ লক্ষণ আছে—যাহা অন্য সমস্ত হইতে ভিন্ন; এবং তাছাড়া সাধারণ লক্ষণও আছে যাহাতে করিয়া উহা মানবমূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। যাহারা চিত্রবিদ্যা শিখিতে প্রথম আরম্ভ করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন মূর্ত্তির বিশেষ লক্ষণ ও আদর্শ লক্ষণ উভয়ই অনুশীলন করা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, শুষ্ক ও সূক্ষ্ম নির্বিশেষতা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, প্রথম হইতেই কোন স্বাভাবিক পদার্থের—বিশেষতঃ কোন জীবন্ত মূর্ত্তির নকল করা ভাল। এইরূপ করিলে, ছাত্রেরা প্রকৃতির বিদ্যালয়েই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, সৌন্দর্য্যের যে দুইটি প্রধান উপাদান, শিল্পকলার যে দুইটি অপরিহার্য্য নিয়ম তাহা কখনই তাহারা বিসর্জ্জন করিবে না; উহাতে তাহারা গোড়া হইতেই অভ্যস্ত হইবে।

কিন্তু এই দুইটি উপাদান সম্মিলিত করিবার সময় উহাদের প্রত্যেককে ঠিক্ চেনা আবশ্যক এবং কোন স্থানে কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও বুঝা আবশ্যক।

এমন কোন মানস-মূর্ত্তি কল্পিত হইতে হইতে পারে না যাহার একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নাই; এমন কোন একতা হইতে পারে না, যাহাতে বিচিত্রতা নাই; এমন কোন জাতি থাকিতে পারে না, যাহাতে ব্যক্তি নাই; কিন্তু যাই হোক্, মানস-আদর্শই সুন্দরের ভিতরকার জিনিস; এই মানস-আদর্শকে বাস্তবতায় পরিণত করাই প্রকৃত শিল্পকলা,—অমুক অমুক বিশেষ আকারের অনুকরণে প্রকৃত শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

আকবরের উদারতা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

ধর্ম্মের ভাণ ও অহঙ্কার আকবরের ভাল লাগিত না। বাদসাহ বাহুনি নামক জনৈক বিদ্বান মুসলমানের সাহায্যে রামায়ণ ও মহাভারতের কতকাংশ এবং ফৈজিকে দিয়া নলদময়ন্তী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। বাদসাহ বিবিধ পুস্তক দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ঐ সকল গ্রন্থ অপরের নিকট শ্রবণ করিতেন। অবসরমত যতটুকু পাঠ হইতে পারে, সাঙ্গ হইলে বাদসাহ নিজ হস্তে পুস্তক-পৃষ্ঠায় দাগ দিয়া রাখিতেন। যে কয়েকখানি পত্র পাঠ হইল, তদনুসারে পুস্তক-পাঠককে পুরস্কার দান করিতেন। তদানীন্তীন কালে প্রকাশিত ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য বাদসাহ নিজে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। যাহাতে তাঁহার সৈন্যগণ বিজিত দেশের জনগণের স্ত্রী-পুত্রের উপর নির্য্যাতন বা তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বৎসরে সুস্পষ্ট আদেশ প্রচার করেন। হিন্দু-তীর্থযাত্রীর নিকট শুল্ক আদায়ের যে নিয়ম ছিল, রাজস্ব-বিভাগের ক্ষতি হইলেও আকবর তাহা একেবারেই উঠাইয়া দেন। হিন্দু-ভাবে যাহারা ঈশ্বরকে ভজিতে চায়, বাদসাহ বলিতেন, আমি কেন তাহাদের অন্তরায় হইব, কেনই বা তাহাদের নিকট অযথা-রূপে কর গ্রহণ করিব। বিধর্ম্মী অর্থাৎ হিন্দুদিগের উপরে জিজিয়া বলিয়া যে কর আদায় হইত,আকবর তাহা উঠাইয়া দিলেন। বিধর্ম্মী বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানিতেন না। আকবর বিধবা বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আকবর হিন্দুগণের অল্পবয়স্কা কন্যা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাদসাহ ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা নিষেধ করেন। প্রার্থনার নিতান্ত আতিশয্য, উপবাস দান তীর্থযাত্রার আধিক্য, তাঁহার দৃষ্টিতে ভাল লাগিত না। তিনি বলিতেন, নিরবচ্ছিন্ন উহাতে ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না, কর্ত্তব্যবহুল জীবনে কার্য্য করিবার অনেক আছে; সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইলে কি হইবে। বাদসাহ এককালে ত্বকচ্ছেদ উঠাইবার চেষ্টা না পাইয়া দ্বাদশ-বৎসর উহার প্রশস্তকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি গোহত্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি শূকর মাংসও যে অঘৃণ্য নহে, তাহাও তিনি বলিয়া যান। কুক্কুর মুসলমানগণের চক্ষে অপবিত্র বলিয়া নিন্দিত হইলেও আকবর তাহাকে অপবিত্র বলিতেন না। মদিরা মুসলমানের অস্পৃশ্য হইলেও বিহিত পরিমাণে মদ্যপানের তিনি বিরোধী ছিলেন না। আকবর শেষ বয়সে শ্মশ্রুমুণ্ডনেরও পক্ষপাতী হয়েন। তিনি বলিতেন ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কেশ মুণ্ডনের বিরোধী হইলে চলিবে না। ধাত্রীমাতার সন্তান আজিজ নানারূপ অনিষ্ট করিলেও আকবর তাহার উপর কঠোর শাস্তি প্রদান না করিয়া বলিতেন আজিজের উপর আমি কঠোর হইতে পারি না; আজিজ ও আমার মধ্যে দুগ্ধের বন্ধন রহিয়াছে; আমি কিছুতেই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না। বাদসাহ একাধারে সুপুত্র, অনুরক্ত স্বামী, স্নেহশীল পিতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোক-চরিত্র নির্ণয়ে বাদসাহের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। মুসলমানেরা বলিত বাদসাহ হিন্দু-যোগীর সহিত মিলিয়া তাহাদের নিকট হইতে অপরের অন্তরের ভাব বুঝিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মৃগয়া ও সঙ্গীতে আকবরের বিশেষ অনুরাগ ছিল।

আহার-সামগ্রীতে আকবর বিলাসী ছিলেন না। মাংস পছন্দ করিতেন না। কোন কোন মাসে মাংস একেবারেই ছাড়িয়া দিতেন। তিনি ফল ভাল বাসিতেন। ফতেপুরসিক্রীতে নানাবিষয়িণী কথাবার্ত্তায় সময়ে সময়ে বাদসাহের প্রায়ই শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। তাহার পরে সঙ্গীত আলাপে নিশাবসান হইত। প্রত্যূষে বাদসাহ অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্নানান্তে রাজবেশে বাহির হইতেন। রাজ-কার্য্যে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত। তাহার পর আহারান্তে বৈকালে নিদ্রা যাইতেন। কোন দিন প্রাতে চৌগান বা পোলো খেলা খেলিতেন। আধুনিক এই polo পোলো খেলা এই ভারত হইতেই ইংলণ্ডে নীত হইয়াছে।

আকবরের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ৮ জন প্রধানা। এই ৮ জনের ভিতরে রাজা ভগবানদাসের ভগিনী অন্যতমা; আর একজন যোধপুর রাজকন্যা, তাঁহারই গর্ভে জাহাঙ্গীরের জন্ম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাহাঙ্গীরের যে স্ত্রী সাজাহানের মাতা, তিনি যোধপুররাজ উদয়সিংহের কন্যা।

রাজস্ব-সম্বন্ধে আকবরের নীতি বিশেষ বিজ্ঞাবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সাম্রাজ্যের ভিতরে সমস্ত জমি মাপ করাইয়াছিলেন। আনুমানিক উৎপন্ন প্রতি বিঘা স্থির করিয়া উহার ভিতর হইতে রাজার প্রাপ্য অংশ নির্দ্দিষ্ট ও উহার মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। বাদসাহ স্থানে স্থানে গোশালা ও ভাবী দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজা-রক্ষা জন্য শস্য-গোলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দিয়া কৃষকের দারিদ্র নিবারণে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রজাগণকে বীজধান্য সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ভূমিকে ৫টি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়া গতপূর্ব্ব ১৯ বৎসরের শস্যের মূল্যের হার ধরিয়া প্রজার দেয় খাজনার পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্ষে বর্ষে খাজনা বন্দোবস্ত না করিয়া প্রতি দশ বৎসরের জন্য সরাসরি মতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্তের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিচারের জন্য কাজি ও তাহাদের উপরে সদর উপাধিধারী বিচারক নিয়োগ করিয়া দেন। যখনই রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক উৎকোচ গ্রহণের বা অত্যাচারের সংবাদ পাইতেন, তখনই তাহাকে কঠোরশাস্তির সহিত বিদায় করিয়া দিতেন। ইহাতে রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, প্রজাগণও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। জমি মাপিবার জন্য বাদসাহ নবনব উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্য লইতেন। কথিত আছে বাদসাহ প্রতি বিঘায় দশ সের পরিমাণ কর (royalty) গ্রহণ করিতেন। পরে ঐ শস্যাংশের পরিবর্তে মূল্যগ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয়। যাহারা অর্থহীন অথচ সাহিত্যানুরাগী, যাহারা সংযমী ও আত্মত্যাগী, যাহারা দরিদ্র ও দুর্ব্বল, যাহারা বিদ্যাহীন অথচ উচ্চ বংশজাত, তাহাদের উপর বাদসাহের বিশেষ সহানুভূতি ও কৃপা ছিল। বাদসাহ অনুগত ও উপযুক্ত অনুচরগণকে জায়গীর দিতেন; যাহারা পূর্ব্ব রাজত্ব আমলে বিনা কারণে ও সামান্য উপলক্ষে জায়গীর পাইয়াছিলেন, বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেও জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন,তাহাদের জায়গীর বাজেআপ্ত করিয়াছিলেন। রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে রাজা টোডার মাল বাদসাহের পরামর্শদাতা ছিলেন।

হিন্দু হইলেও টোডারমালের বিশেষ অনুরক্তি আকবরের উপর ছিল। অপরাধ বিশেষে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও শাসনকর্ত্তাগণ যাহাতে এই দণ্ড সম্বন্ধে কৃপণতা প্রকাশ করেন, বাদসাহের এইরূপ আদেশ ছিল, এবং ঐ দণ্ড পরিচালন সম্বন্ধে সময়ে সময়ে বাদসাহের অনুমতি লইতে হইত। বাদসাহ নিজে জাঁকজমক-প্রিয় না হইলেও বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসন-কর্ত্তাদিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন, যে আড়ম্বর ভারত-শাসনের একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহার আড়ম্বরপ্রিয় হইতে হইত। মধ্যে মধ্যে স্বুবর্ণ-রৌপ্য-হীরা জহরত লইয়া তুলাদণ্ডে আপনাকে ওজন করাইতেন এবং ঐসমস্ত মণিমাণিক্য দীনদরিদ্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। কখন বা ছাগ মেষ পক্ষী বিতরণ করিতেন, এবং নিজ হস্তে রাজসভার অমাত্যগণকে সুমিষ্ট ফলাদি উপহার দিতেন। সময়ে সময়ে হীরাজহরতশোভিত বাদসাহ স্বুবর্ণ সিংহাসনে বসিতেন; মূল্যবান পরিচ্ছদে অমাত্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত; সম্মুখ দিয়া হীরকাস্তরণ-ভূষিত হস্তী অশ্ব চলিয়া যাইত; শৃঙ্খল-বদ্ধ গণ্ডার সিংহ ব্যাঘ্র কুক্কুর শিকারী শ্যেন পক্ষী সম্মুখে নীত হইত।

আকবরের শাসন গুণে হিন্দু উৎপীড়ন চলিয়া গিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক রাজছত্রের অধীনে আনিয়া বাদসাহ অপার তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে সমগ্র ভারতবর্ষকে আনয়ন করা যে বড় সুকঠিন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সকলকে এক স্বার্থের রজ্জুতে বাঁধিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না। সকল প্রকার পূজা পদ্ধতির উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার (prophet) প্রবক্তা একথা কোরাণের সময় হইতে চলিয়া আসিলেও আকবর ঘোষণা করিলেন যে ঈশ্বর এক এবং তিনি নিজে তাঁহার (Vice-regent) আজ্ঞাপালক। বাদসাহ মুসলমানদিগের পর্ব্বাদির অল্পমাত্রই মানিয়া চলিতেন। তিনি বলিলেন, হজরত মহম্মদ পৌত্তলিকগণের নিকট ঈশ্বরের একত্ব ঘোষণা করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সুসংবাদ ঘোষণা করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম। কিন্তু কোরাণের ব্যাখ্যাদোষে—তলবারের সাহায্যে উহার ঘোষণা চলিয়া আসিয়াছে। ইহারই জন্য এত বিবাদ। আকবর বলিতেন, যে এ ধর্ম্মকে আমি তরবারের ধর্ম্ম হইতে দিব না। ধর্ম্ম-বিষয়ে আমি সকলকে স্বাধীনতা দিব। আকবর এই উদারতা গুণেই রাজপুত-রাজগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে, ভারতে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সমগ্র ভারতে সর্ব্ববিধ সুখবর্দ্ধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মেতেই সৎ উপদেশ ও সৎ শিক্ষা আছে, যেখান হইতেই হউক তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঐতিহাসিক ম্যালিসন তাঁহার আকবর নামধেয় পুস্তকে বলেন, "আকবরের এই যে উদারতা ও শাসনপদ্ধতি তাহা ইংরাজগণও বর্ত্তমান-ভারতে বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। আকবর বাদসাহের সহিত তদানীন্তনকালের ইউরোপের কোন রাজার তুলনা করিলে, আকবর কিছুতেই ম্লান বা হীনপ্রভ হইবার নহেন"। সাধু-কার্য্যের উপর আকবরের প্রতিষ্ঠা। বলিতে কি যখন ভারতের ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত, নির্য্যাতন গৃহবিবাদ অরাজকতা যখন সমগ্র

ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনই ঈশ্বরের মঙ্গল-বিধানে আকবরের মত বাদসাহের অভ্যুদয়। শান্তি ও উদারতা তাঁহার শাসনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। অসীম রাজ্যের অসংখ্য প্রজা বাদসাহের সুশাসনে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করিয়াছিল। ইহা কেবল আমাদের কথা নয়, কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন ও হণ্টার এই ভাবেই আকবরকে চিত্রিত করিয়াছেন।

আকবরের বিরাট হৃদয়ের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার মহামূল্য কয়েকটি উক্তির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "আমাদের সহিত ঈশ্বরের যে কি এক যোগ রহিয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। * * যিনি সৌভাগ্য-বলে আপনার বৃত্তি-নিচয়কে বাহিরের বস্তু হইতে প্রত্যাহার করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন।

ভারত-ললনাগণ নদী হইতে জল তুলিয়া কলসীর উপর কলসী মস্তকে স্থাপন করিয়া সঙ্গীগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে নিম্নোচ্চ পথ দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সেইরূপ আমাদের আত্মা যদি মদিরার (ঈশ্বরের প্রেমানন্দের) কলস অটলভাবে ধারণ করিতে পারে, তাহার সকল বিপদ অবসান হয়। ললনাগণ কেমন সহজে মস্তকে কলস ধারণ করিয়া থাকে; আমরা ঈশ্বরকে তদপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত কি রক্ষা করিতে পারিব না।

সকল প্রকার দুর্নীতি হইতে পৃথিবীতে আত্মরক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন।

যিনি আপনার ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন ও সকলের সহিত সাধু ব্যবহার করেন, তিনিই ধন্য।

দর্শন চর্চ্চায় আমার এতই আনন্দ, যে উহা আমাকে অন্যান্য কর্ত্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। * * আমি এতবড় রাজ্যের অধীশ্বর, এত প্রভুত্ব আমার হস্তে, কিন্তু বুঝিয়াছি, প্রকৃত মহত্ব কেবল ঈশ্বরেরই আদেশ-পালনে। রাজ্যের ভিতরে এত দল এত ধর্ম্ম মত, ইহা দেখিয়া আমি শান্তিহারা হইয়া পড়ি। বাহিরে এত—সম্পদ এত আড়ম্বরের বিকাশ, কিন্তু নিরাশ অন্তর লইয়া কোন্ আনন্দে রাজ্য শাসন করিব! আমি একজন বিচক্ষণ লোক চাই, যিনি আমার মনের সর্ব্ববিধ সংশয়-চ্ছেদ করিতে পারেন।

যদি তেমন এক জন উপযুক্ত লোক পাই, তবে তাহার স্কন্ধে সাম্রাজ্যের গুরুভার অর্পণ করিয়া সরিয়া পড়ি।

সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রদাতার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা, যখন আমার কার্য্য তাঁহাকে অনুসরণ না করিবে, তিনি যেন আমাকে বিনাশ করেন; আমি আর তাঁহার অসন্তোষের মাত্রা বাড়াইতে চাহি না।

অনেক শিষ্য প্রতিভা বলে গুরুকে অতিক্রম করে, তাই বলিয়া গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার যেন হ্রাস না হয়।

নির্দ্দোষ লোককে হত্যা করিলে, ঈশ্বরের করুণ হস্তেই তাহাকে সঁপিয়া দেওয়া হয়।

হায়! ইতিপূর্ব্বে যদি আমার প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইত, আমি বিবাহ করিতাম না। এতগুলি প্রজা আমার সন্তান, আমার আবার পুত্রের অভাব কোথায়?

রাজার পক্ষে যদি ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠ-পন্থা থাকে, তবে তাহা সুশাসনে এবং ন্যায় বিচারে।

বাল্যবিবাহ ঈশ্বরের প্রীতিকর নহে। যে ধর্ম্মে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, সেখানে বিধ-

বার ভয়ানক যন্ত্রণা। চৌর্য্যে চোরই দোষী, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সম্বন্ধে উভয়েই তুল্যরূপে অপরাধী। সুতরাং এ দোষ চৌর্য্যাপরাধ হইতেও গুরুতর"।

নানা কথা।

বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বৈশাখী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পরে—মহাবোধীসভার প্রযত্নে কলিকাতায় বুদ্ধদেবের ২৫৩১ বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ পুণ্যদিনেই ঐ মহাপুরুষ বৌদ্ধত্ব লাভ করেন, ঐ দিনেই তাঁহার পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি বা তিরোভাব ঘটে। সুতরাং ঐ জন্মদিবসই বুদ্ধের ২৪৯৬ বার্ষিক বৌদ্ধত্বলাভের দিন ও ২৪৫১ বার্ষিক তিরোভাব কাল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও চট্টগ্রাম ও সিংহলে অনেক বৌদ্ধ আছেন। তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যে ও মহামতি ধর্ম্মপালের প্রযত্নে কলিকাতা কপালিটোলাতে ললিতমোহন দাসের গলিতে একটি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ নবনির্ম্মিত গৃহের পূর্ব্বাংশে কক্ষাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থ মূর্ত্তি শুভ্রমর্ম্মর প্রস্তরে বিরাজিত। অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় মহাপুরুষের দুইচারিটি ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্ত্তিও দেখিলাম। উহা পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ সজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ ও মুক্তিলাভ-অবস্থার পরিচায়ক। দেখিলাম, অনেকগুলি বাতির আলোক বেদীর উপরে প্রজ্বলিত, একটি নির্ব্বাণোন্মুখ হইবার পূর্ব্বে আর একটি বাতি তাহার স্থানে বসাইয়া দেওয়া হইতেছে। মধ্যে সভাগৃহ, পশ্চিমে বৌদ্ধ পুরোহিতগণের থাকিবার স্থান। আশ্রমটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। সমাগত উপাসকের মধ্যে অনেক গুলি চট্টগ্রামের ও সিংহলের বৌদ্ধ। চট্টগ্রামের একজন বৌদ্ধ-পুরোহিত সভার উদ্দেশ্য বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অংশ বিশেষ উচ্চৈঃস্বরে বলিলে উপস্থিত বৌদ্ধগণ সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করিল। তাহার পর কয়েক জনবৌদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইল। পরিশেষে কলিকাতার মিরর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন নিজ-লিখিত সুদীর্ঘ বক্তব্য ইংরাজি ও বাঙ্গালায় পাঠ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এই যে "জাপানীগণ বর্ত্তমানে যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন, নানাবিধ কার্য্য-কলাপে জগৎকে যেরূপ বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের অবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ রূপে আলোচনা করিবার অবসর আসিয়া উপস্থিত। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীগণের জাতীয় চরিত্রগঠনে যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কাহারও জো নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নিরীশ্বর বাদে পূর্ণ নহে, উহা আস্তিক্য ধর্ম্ম; নীতির উচ্চতায় ও সাধনার গৌরবে উহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইবার উপযোগী।" পরে দুই একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বক্তব্য কহিলে সভাভঙ্গ হইল। সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণের সেদিনকার সৌজন্য ও বিনয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেদিন উৎসবক্ষেত্রে ইহাও শুনিলাম যে লক্ষ্ণৌ সহরের সান্নিধ্যে আর একটি বৌদ্ধ-বিহার স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

প্রাচীন-নবদ্বীপের সৌভাগ্য সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাইতে হইলে স্বরূপগঞ্জ দিয়া যাইতে হয়। স্বরূপগঞ্জের নিকটে উক্ত প্রশস্ত রাজপথের উত্তরভাগে ও সান্নিধ্যে ভগ্নঅট্টালিকার এক ক্ষুদ্র স্তূপ রহিয়াছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি, ঐ খানেই সুবর্ণবিহার নামক এক বৌদ্ধবিহার ছিল। কটকের নিকট ভুবনেশ্বরের বৌদ্ধবিহারের ত কথাই নাই। কালের প্রভাবে একণে সকলই বিপর্য্যস্ত।

সলোমনের নিকট পক্ষীর অভিযোগ। লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল ফিলট মূল আরব্যভাষা হইতে পক্ষীর অভিযোগ বৃত্তান্ত অনুবাদ করিয়া ১৯০৭। মার্চ্চ মাসের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশ করিয়াছেন। উপদেশ-পূর্ণ বিধায় উহার সারাংশ নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। পক্ষীগণ একদিন সলোমনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, যে আপনি ঈশ্বরের প্রবক্তা, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন। বর্ত্তমানে আমরা ৪ জাতীয় পক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি। প্রথম শ্যেনপক্ষী, উহারা মনুষ্যের স্নেহলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, উহারা উচ্চ আসনে উঠিয়াছে, রাজার হস্ত ভিন্ন অন্যত্র বসিতে চাহে না; গর্ব্বে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আমাদের সহিত কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করে। ২য় পেচক, উহারা পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহে বাস করে, বৃক্ষ শাখায় উপবেশন করে না, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আহ্ আহ্ শব্দ করিয়া নীরব হয়। ৩য় দাঁড়কাক, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উহার পরিচ্ছদ, বিষাদব্যঞ্জক তাহার ধ্বনি, লোকালয়ের প্রতি সে বিমুখ, ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানে তাহার গতিবিধি। ৪র্থ বুলবুল, শীতে সে নিস্তব্ধ, পৃথিবীর উপরে উপেক্ষা-বিজড়িত তাহার দৃষ্টি, ফলফুলে ধরণী সুশোভিত হইলেই তাহার আমোদ ও সঙ্গীত; ইহারই বা কারণ কি। সলোমন বলিলেন, তোমাদের ত কথা শুনিলাম। উহাদিগকে ডাকাই, দেখি তাহারা কি বলিতে চায়।

আদেশ মতে শ্যেন পক্ষী আসিয়া উপস্থিত। সলোমন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি অপর পক্ষীর সহিত কথা কহ না। শ্যেন উত্তর করিল মহাশয়! জিহ্বা হইতে অনেক সময় বাজে কথা বাহির হইয়া পড়ে, কার্য্য করিবার জন্যই সকলের জীবন। যাহারা কর্ম্মবীর তাহারাই ঈশ্বরের প্রিয়, যাহারা বকে অথচ কার্য্য করে না, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিমুখ। তাই আমি বাক্‌সংযত। শ্যেন এই বলিয়া বিদায় হইলে পেচক আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসিত হইলে পেচক নিবেদন করিল, পৃথিবীর উপরে যাহারা আস্থাবান তাহারা নিতান্তই প্রতারিত। যে জানে, যে এখানকার কার্য্যাকার্য্যের জন্য পরলোকে গিয়া তাহাকে হিসাব দিতে হইবে,সে ভীত ও বিষন্ন না হইয়া কি রূপে থাকিবে। যাঁহাকে ভয় করি, সেই এক ঈশ্বরের চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন। যদি কেহ আমার বন্ধু থাকেন, তবে তিনি। সেই "হু" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। তাই "আ হু" বলিয়া তাঁহাকে ডাকি। যাঁহারা তাঁহার প্রেমে আত্মহারা, তাঁহাদের আত্মার ক্ষুধা-শান্তি এক ঈশ্বরে। পেচকের পরে দাঁড়কাক আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, মৃত্যু ত সমাগত, লোকে অপরের ঘোর মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়াও নিজে চিন্তাহীন। যেখানে যাই, দেখি শোকের আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। মৃত্যুর অত্যাচারে লোক ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পৃথিবীর আবার মূল্য কোথায়। সকলেই ত চলিষ্ণু। মনুষ্য বধির,তথাপি পৃথিবী অনবরত চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছে, যে কতলোকের আশারাশি আমি বিনষ্ট করিয়াছি, কত সঞ্চিত ধন-সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছি, কত মৃতদেহ মৃত্তিকা দিয়ে প্রোথিত করিয়াছি; এতকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নির্ম্মম আমি, আমার চক্ষে জল নাই। সর্ব্বশেষে বুলবুল আসিয়া উপস্থিত, বলিল আমি মদিরায় আনন্দে চীৎকার করি না। আমি মাতালকে দেখিয়া বিস্ময়ে শব্দ করি। আমি দেখি মদিরার প্রভাবে লোকের ধর্ম্ম বিনষ্ট, জ্ঞানী অজ্ঞানে পরিণত, ভদ্র ভদ্রতাবিরহিত। হায়! মদিরার প্রভাবে পণ্ডিতেরা বাঁদরের মত নৃত্য করে, কুকুরের মত লম্ফ দেয়, অবশেষে শূকরের মত ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়, চিরশান্তিময় ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, অবিশ্বাসীর উপাধি-চিহ্ন কণ্ঠে ধারণ করে। হায়! তিনিই ধন্য, যিনি সাধু-ইচ্ছার দ্রাক্ষালতা অন্তরে রোপণ করেন, আনন্দের বৃক্ষে ঐ লতাকে উঠাইয়া দেন, প্রেমের রস সঞ্চারিত করিয়া উহাকে ফলবান করেন, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার মৃদু-হিল্লোল উহার উপর বহিতে দেন, সুপক্ক হইলে ঐ দ্রাক্ষাফল বিশ্বাসের অঙ্গুলিতে চয়ন করেন, সন্তোষের কুম্ভে উহাকে পচিতে দেন, বিপদের সময়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের চক্রে উহাকে নিষ্পেষিত করিয়া উহা হইতে মদিরা বাহির করিয়া সেই অলৌকিক মদিরা পান করেন। সলোমন এই সকল চিন্তাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; সকলকে বলিলেন,শ্যেন পক্ষীর নিয়মবতা সকলেরই শিক্ষনীয়, পেচক জ্ঞানে সকলকে পরাভব করিয়াছে, দাঁড়কাকের বিলাপ ও নির্জ্জন ভ্রমণের বাস্তবিক কারণ আছে, বুলবুলের মদিরা-ব্যাখ্যা অতীব সঙ্গত। এই বলিয়া পক্ষীগণকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বাবি-ধর্ম্ম—১৮৪৬ সালে পারস্য দেশে মির্জ্জা-মহম্মদ আলি নামে জনৈক ধর্ম্ম-সংস্কারক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জন্ম সিরাজ নগরে। মহম্মদআলি বাবানামে পরিচিত;—তাঁহার পরবর্ত্তী নেতা বেহাউল্লা'র নাম হইতে ইহা বেহাই ধর্ম্ম নামে পরিচিত। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তত। ইহাদের মত কতক পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরূপ। বাবিগণ ধর্ম্মের জন্য অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে। প্রায় ২০ হাজার লোক এই ধর্ম্মের জন্য নিহত হইলেও এই উৎপীড়নে ধর্ম্মের তেজ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; বর্ত্তমানে পৃথিবীর নানা স্থানের লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকায় প্রায় ১০ হাজার লোক বাবিধর্ম্মালম্বী। সম্প্রতি নিউইয়র্ক নিবাসী একদল প্রচারক নানা স্থানে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইয়াছেন। বিগত ৬ই এপ্রিল ইহাদের নেতা শ্রীযুক্ত হুপার হেরিস্ সিটি-কলেজে বাবিধর্ম্মের মত ও ইতিহাস সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

নবযুগ। আর্য্যসমাজ হইতে প্রকাশিত আর্য্য-পত্রিকায় প্রকাশ,যে রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া আপামর সাধারণ এতই ব্যতিব্যস্ত যে বিগত দুই বৎসর যাবৎ ধর্ম্ম বিষয়ক পত্রিকা পাঠে লোকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। এমন কি ইহার জন্য আর্য্য মেসেঞ্জার নামক পত্রের কলেবর হ্রাস করিতে হইয়াছে। সত্য সত্যই বর্ত্তমানে এক ঘোর পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়া উপস্থিত। ইহার উদ্দাম প্রভাবে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে আজ কাল উদ্দাম নৃত্য ও প্রেমালাপ বড় আর স্থান পাইতেছে না, লোকের চিন্তার গতি যেন অন্যদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। কল্পনা-প্রসূত নাটিকার স্থান বাস্তবইতিহাসগত সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, বঙ্গের শেষ বীর, বঙ্গ-বিক্রম প্রভৃতি গ্রন্থ অধিকার করিয়া বসিতেছে। লেখকের তুলিকায় পরিস্ফুট আমাদের দুর্ব্বলতা বিশ্বাসঘাতকতা, পরশ্রীকাতরতার ঘৃণিত মূর্ত্তি দেখিয়া বাঙ্গালী আমরা নিজেই লজ্জায় ঘৃণায় অবনত মস্তক হইতেছি। সে দিন শ্রীমনোমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক

বিরচিত "সমাজ" বলিয়া একখানি গ্রন্থ আমাদের হস্তে আইসে। অভিনয়ের জন্য উহা সংরচিত। বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে যে সকল কলঙ্ক আছে ও স্থান পাইতেছে তৎসমস্ত উচ্ছেদ করিয়া শ্লেষের খর-বাণে তাহার নির্ম্মূল সাধন করাই লেখকের অভিপ্রায়। তাই তিনি উপাধি-লোলুপ চরিত্রহীন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট-কঙ্কালসার-প্রজার উপর নির্ম্মম-প্রকৃতি-জমিদারের, দয়াদাক্ষিণ্যহীন উগ্র প্রকৃতি অর্থগৃধ্নু ডাক্তারের, নৈতিক জীবনবিহীন দলাদলিরত দক্ষিণালোলুপ এমন কি অর্থলোভে পরগৃহে অগ্নিদানসমর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, দেশ হিতৈষীর নির্ম্মোকধারী বন্দে মাতরং উচ্চারণকারী চাঁদার অর্থপ্রার্থী কপট স্বার্থপর যুবকের, সজীব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। অন্যদিকে উত্থান-যাত্রী পবিত্র-চরিত্র যুবকের জীবনে কিভাবে মলিনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরিশেষে চিরপুণ্যময়ী হিন্দুললনার অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেম ও সহিষ্ণুতা গুণে কিরূপে বা সেই কলঙ্কিত স্বামী উদ্ধার লাভ করে তাহার ও করুণ চিত্র সকলের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের অভিনয় দেখিয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য দর্শকেরা যে সত্যই চৈতন্য লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয়, নৈতিক-জীবন বিগঠিত হয়, জীবনের উচ্চ আদর্শ মনে প্রতিভাত হয়, স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হয়, এইরূপ পুস্তকের অভিনয়ই আজকাল-কার দিনে বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের যে বিশেষ দায়িত্ব আছে, এ কথা তাঁহারা যেন কস্মিন্‌কালে বিস্মৃত না হয়েন। লোক-রঞ্জনে নহে, কিন্তু শিক্ষাদানেই নাট্যশালার গৌরব ও প্রকৃত সার্থকতা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪০০৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬২২ ৶৯
সমষ্টি	...	৩০২৩ ৵৯
ব্যয়	...	৩৫৯। ৯
স্থিত	...	২৬৬৩৸৵০

জায়

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

পাঁচকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৩০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩৬৩৸৵০

২৬৬৩৸৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০৯৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের এক্‌জীকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত

৯৲

২০৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।৵০
পুস্তকালয়	...	৩।০
যন্ত্রালয়	...	১১৬।৴০
গচ্ছিত	...	৪২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৭॥০
সমষ্টি	...	৪০০৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৩।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৩॥ ৩
পুস্তকালয়	...	১৸৵৬
যন্ত্রালয়	...	৯৯॥৴৯
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১১৲৩
সমষ্টি	...	৩৫৯। ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।
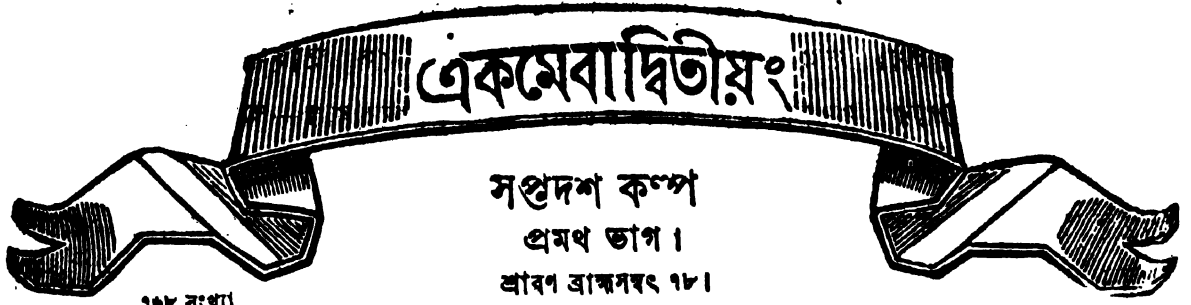
তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

আমাদের শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনপরিষৎ নিম্নলিখিত প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। "প্রাচীন গ্রীসদেশীয় ভাস্কর-শিল্পের চরম উৎকর্ষের কারণগুলি কি এবং কি উপায়ে ঐ প্রকার চরম উৎকর্ষে উপনীত হওয়া যাইতে পারে?" এই প্রশ্নটির সদুত্তর দিয়া যিনি জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এমেরিক ডেভিড্। সেই সময়ে যে মতটি প্রবল ছিল সেই মতেরই পোষকতা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ঐকান্তিক অনুশীলনেই প্রাচীন ভাস্কর-কলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং প্রকৃতির অনুকরণই ঐ প্রকার উৎকর্ষ লাভের একমাত্র পন্থা। কাতরমেয়ার দেক্যাঁসি নামক এক ব্যক্তি এই মত খণ্ডন করিয়া মানস-অদর্শগত সৌন্দর্য্যের পক্ষ সমর্থন করেন। সমস্ত গ্রীক ভাস্কর-কলার ইতিহাস এবং তখনকার খ্যাতনামা শিল্প সমালোচকদিগের মন্তব্য আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতির অনুকরণের উপর কিংবা বাস্তব-আদর্শের অনুকরণের উপর গ্রীকদিগের শিল্প-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বাস্তব-আদর্শ যতই সুন্দর হউক না কেন, তবু তাহা খুবই অপূর্ণ এবং অনেকগুলি বাস্তব-আদর্শের অনুকরণেও একটি অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি কখনই গঠিত হইতে পারে না। প্রাচীন গ্রীকেরা সেই মানস-আদর্শেরই অনুসরণ করিত যাহার প্রতিরূপ বাস্তব জগতে তখনও দেখা যাইত না, এখনও দেখা যায় না।

শিল্পকলা সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা প্রকারান্তরে অনুকরণ-মতেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকে। এই মতবাদীরা বলেন, বিভ্রম-মোহ উৎপাদন করাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। যে চিত্র-সৌন্দর্য্য চোখে ধাঁদা লাগাইয়া দেয়, তাহাই আদর্শ-সৌন্দর্য্য। যেমন জিউক্সিস নামক চিত্রকরের আঙ্গুর ফলের উৎকৃষ্ট চিত্র। উহা এতটা প্রকৃতির অনুরূপ যে, সত্যিকার আঙ্গুর মনে করিয়া পাখীরা আসিয়া ঠোক্-

রাইত। কোন নাট্যাভিনয়ে যখন কোন দৃশ্য বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয় তখনই তাহা কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য তাহা এই ঃ—কোন কলারচনা সুন্দর হইতে হইলে তাহাতে জীবন্ত ভাব থাকা চাই। তাহার দৃষ্টান্ত,—নাট্যকলার নিয়ম এই যে, অতীত কালের অপরিস্ফুট ছায়া-মূর্ত্তি সকল নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত হইবে না, পরন্তু কাল্পনিক কিংবা ঐতিহাসিক পাত্রগণ জীবন্ত ধরণের হইবে, আবেগময় হইবে, মানুষের ছায়ার মতন নহে—জীবন্ত মানুষের মত কথা কহিবে, কাজ করিবে। অভিনয়ের ইন্দ্রজাল, মানব-প্রকৃতিকে বিকৃতরূপে প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাকে আরও উন্নত আকারে প্রদর্শন করিবে। এমন কি এই ইন্দ্রজালই, নাট্যকলার মূল-মন্ত্র। এই ইন্দ্রজালই আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অপসারিত করে, আমাদিগকে সেই চির-আকাঙ্ক্ষা চির-আশার দেশে লইয়া যায়,—যেখানে বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতা সকল তিরোহিত হইয়া কতকটা পূর্ণতার আবির্ভাব হয়,যেখানকার কথিত ভাষা আরও উন্নত, যেখানকার ব্যক্তিগণ আরও সুন্দর, যেখানে কদর্য্যতার অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না; —অথচ সেই অভিনয়ের ইন্দ্রজাল ইতিহাসের মর্য্যাদা অতিক্রম করে না, এবং মানব প্রকৃতির যে সকল অকাট্য নিয়ম তাহারও বাহিরে যায় না। শিল্পকলা যদি মানুষকে অতিমাত্র বিস্মৃত হয় তাহা হইলে সে তাহার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে—তাহার গম্য-পথে কখনই উপনীত হয় না, সে এমন কতকগুলা অলীক বস্তু সৃষ্টি করে যাহার প্রতি আমাদের চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। আবার যদি শিল্পকলা বেশীমাত্রায় মানুষ-ঘেঁসা হয়, বেশীমাত্রায় বাস্তব হইয়া পড়ে, বেশীমাত্রায় নগ্নতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে তাহার গম্য-স্থানের এ-ধারেই থাকিয়া যায়—আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিভ্রম উৎপাদন শিল্পকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কেন না কোন কলা-রচনা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারিলেও তাহা চিত্তাকর্ষণ না করিতেও পারে। আজকাল বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে, নাট্যমঞ্চে পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা হইয়া থাকে ; কিন্তু আসলে উহাতে কিছুই যায়-আসে না। নাট্যাভিনয়ে, যে ব্রুটাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সে যদিও প্রাচীন রোমক বীরের পরিচ্ছদ পরিধান করে, এমন কি, যে ছোরা দিয়া সীজারকে বধ করা হইয়াছিল ঠিক সেই ছোরাখানা অভিনয়-কালে ব্যবহার করে—তথাপি, উহা প্রকৃত সমজ্দারের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না। আরও এক কথা ;—বিভ্রম-মোহ বেশীমাত্রায় উৎপাদন করিলে, শিল্পকলার রসটি মরিয়া যায়, এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপ বাস্তবতা কখন কখন অসহ্য হইয়া উঠে। যদি আমার বিশ্বাস হয়, আমার অনতিদূরে, এফিজেনির পিতা এফিজেনিকে সত্য সত্যই বলি দিতেছে, তাহা হইলে আমি ভয় আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে নাট্যশালা হইতে বাহির হইয়া পড়ি।

কিন্তু এইরূপ প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, —করুণা ও ভয়ানক রস উদ্রেক করাই কি কবির উদ্দেশ্য নহে ? হাঁ, গোড়ায় কতকটা তাহাই উদ্দেশ্য বটে ; কিন্তু তাহার পর, উহাতে আর একটা রস মিশ্রিত করিয়া উহার তীব্রতা কমান হইয়া থাকে। চূড়ান্ত

পরিমাণে করুণা ও ভয়ানক রস উদ্রেক করাই যদি নাট্যকলার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিকট শিল্প-কলাকে হার মানিতে হয়—এই বিষয়ে শিল্পকলা, প্রকৃতির অক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা বাস্তব জীবনে প্রতিদিন যে সকল শোচনীয় দৃশ্য সচরাচর দেখিয়া থাকি, তাহার নিকট নাট্য-মঞ্চে প্রদর্শিত দুঃখ কষ্ট নিতান্ত লঘু বলিয়াই মনে হয়। কোন একটা প্রধান হাসপাতালে যে সব করুণ ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায়, সমস্ত নাট্যশালা মিলিয়া তাহা দেখাইতে পারে না। যে মতটি আমরা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করি-তেছি সেই মতের অনুসরণ করিতে হইলে, কবি কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন? তিনি যতদূর পারেন রঙ্গমঞ্চে বাস্তবতার অবতারণা করিবেন,এবং ভীষণ দুঃখ কষ্টের দৃশ্য আনিয়া আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত ও কম্পিত করিয়া তুলিবেন। করুণারস উদ্রেক করিবার প্রধান উপায়—মৃত্যু-দৃশ্যের অবতারণা। পক্ষান্তরে হৃদয় বেশী-মাত্রায় উত্তেজিত হইলে, শিল্পকলার রসভঙ্গ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত;—ঝটিকা-দৃশ্যের কিংবা ভগ্নতরী-দৃশ্যের যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্যটি কি? প্রকৃতির এই সকল মহান দৃশ্যের প্রতি আমরা কিসে এত আকৃষ্ট হই? ইহা নিশ্চিত, করুণা কিংবা ভয়ে আকৃষ্ট হই না। এই দুই তীব্র ও মর্ম্মভেদী ভাব বরং ঐরূপ দৃশ্য হইতে আমাদিগকে পরাঙ্মুখ করে। করুণা কিংবা ভয় ছাড়া আর একটি রসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা ঐরূপ দৃশ্য দেখিবার জন্য তীরে দাঁড়াইয়া থাকি। ইহা নিছক সৌন্দর্য্য রস ও গাম্ভীর্য্যরস। সম্মুখের গম্ভীর দৃশ্য, সমুদ্রের বিশালতা, ফেনময় উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ, বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ,—এই ভাবকে উদ্দীপ্ত করে। তখন কি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি যে কতকগুলি হতভাগ্য লোক কষ্ট পাইতেছে, কিংবা তাহাদের মৃত্যু আসন্ন? তাহা যদি ভাবিতাম তাহা হইলে ঐরূপ দৃশ্য আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিত। শিল্পকলা সম্বন্ধেও এই-রূপ। যে কোন ভাবেই আমরা উত্তেজিত হই না কেন, সেই ভাবটিকে সৌন্দর্য্যরসের দ্বারা একটু আর্দ্র করা চাই, উহাকে সৌন্দর্য্যরসের অধীনে রাখা চাই। যদি কোন কলা-রচনা, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া কেবল করুণা ও ভয়ানক রসের উদ্রেক করে, বিশেষত শারীরিক করুণা ও শারীরিক ভয়ের উদ্রেক করে, তাহা হইলে আমরা উহার প্রতি বিমুখ হই—উহার প্রতি আর আকৃষ্ট হই না।

আর একদল আছেন, তাঁহারা সৌন্দ-র্য্যকে ধর্ম্মভাব ও নৈতিক ভাবের সহিত এক করিয়া ফেলেন, শিল্পকলাকে ধর্ম্ম ও নীতির সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে ভাল করিয়া তোলা,—আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে উন্নীত করাই শিল্প কলার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে একটা মুখ্য প্রভেদ আছে। যদি সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই নৈতিক সৌন্দর্য্য নিহিত থাকে, যদি সৌ-ন্দর্য্যের আদর্শ ক্রমাগত অনন্তের অভি-মুখেই উত্থিত হয়, তবে যে শিল্পকলা সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যকে পরিব্যক্ত করে, সেই শিল্পকলাও মানব আত্মাকে অনন্তের দিকে —অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে উন্নীত করিয়া তাহাকে বিমল করিয়া তোলে সন্দেহ নাই। অতএব শিল্পকলা মানব-আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে বটে, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে। যে তত্ত্বদর্শী কার্য্যকারণের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তিনিই জানেন যে, শিল্পকলা

সৌন্দর্য্যেরই চরমতত্ত্ব এবং শিল্পকলার প্রভাব পরোক্ষ ও দূরবর্ত্তী হইলেও উহা ধ্রুবনিশ্চিত। কিন্তু কলাগুণীর নিকট সর্ব্বাগ্রে শিল্পকলাই অনুশীলনের বিষয়। যে ভাবরসে তাঁর চিত্ত ভরপূর, সেই ভাবরস তিনি অন্য দর্শকের মনেও উদ্রেক করিতে চেষ্টা পান। তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সেই সৌন্দর্য্যকে সমস্ত বিভূতির দ্বারা, মানস-আদর্শের সমস্ত 'মোহিনী'র দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে সংরক্ষিত করেন। তাহার পর সেই সৌন্দর্য্যই তাঁহার রচনাকে গড়িয়া তোলে; কতকগুলি বাছা-বাছা লোকের মনে সৌন্দর্য্যরসের উদ্রেক করিতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই বিমল ও নিস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্ম্মভাবের ও নৈতিকভাবের পরম সহায়; এই সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্ম্ম ও নীতির ভাবকে উদ্বোধিত করে, পরিপুষ্ট করে, বিকসিত করে, কিন্তু তথাপি এই সৌন্দর্য্যের ভাব একটি পৃথক ভাব—একটি বিশেষ ভাব। এমন কি, যে শিল্পকলা এই সৌন্দর্য্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যের দ্বারা উদ্দীপিত, সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—সেই শিল্পকলারও একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে। যদিও শিল্পকলা ধর্ম্মের সহচর, নীতির সহচর, যাহা কিছু মানব-আত্মাকে উন্নত করে তাহারই সহচর, তথাপি শিল্পকলা আপনার নিজস্ব শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত।

শিল্পকলার জন্য স্বাধীনতার দাবী, নিজস্ব মর্য্যাদার দাবী, বিশেষ উদ্দেশ্যের দাবী করিতেছি বলিয়া কেহ না বুঝেন, আমরা উহাকে ধর্ম্ম হইতে, নীতি হইতে, দেশানুরাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি। শিল্পকলা যেরূপ স্বকীয় গভীর উৎস হইতে—সেইরূপ চির-উদ্ঘাটিত প্রকৃতির নিকট হইতেও ভাবরস আকর্ষণ করে। কিন্তু এ কথাও সত্য,—কি শিল্পকলা, কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম্ম—ইহাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন অধিকার আছে, বিশেষ-বিশেষ কার্য্যশক্তি আছে; ইহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু কেহ কাহারও অধীন নহে; উহাদের মধ্যে কেহ যদি স্বকীয় উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত হয়,—অমনি সে পথভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়; যদি শিল্পকলা অন্ধভাবে, ধর্ম্মের সেবায়—মাতৃভূমির সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়—সে তাহার মোহিনীশক্তি হারায়—তাহার প্রপ্রভুত্ব হারায়।

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের সহিত শিল্পকলা কিরূপ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে তাহার স্বার্থক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায়ই পুরাতন গ্রীস ও আধুনিক ইটালীর উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের সহিত শিল্পকলার মিলনের কথা যদি বল—তাহা খুবই সত্য; কিন্তু যদি বল, শিল্পকলা উহাদের দাস, তবে সে কথা নিতান্তই মিথ্যা। শিল্পকলা ধর্ম্মের দাসত্বে নিযুক্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ, উহা ধর্ম্মের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে অল্পে অল্পে নিজ প্রভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে;—স্বাধীন ভাবে উহাদের রূপ প্রকটিত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে উহাদের মূল-ভাবেতেও পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আবার বলিতেছি, আমরা যেন কিছুই অতিরঞ্জিত না করি। শিল্পকলা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র,—পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেও, উহাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা কখনই নষ্ট হয় না। ইহা মনে করিও, শিল্পকলা নিজেই একপ্রকার ধর্ম্ম। সত্যের ধারণার দ্বারা, মঙ্গলের ধারণার দ্বারা, সুন্দরের ধারণার দ্বারাই ঈশ্বর আমাদের নিকট

আত্মপ্রকাশ করেন। এই তিনটি ধারণাই সমান,—তিনটিই একই পিতার বৈধ সন্তান। উহারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অভিমুখে লইয়া যায়, কেন না প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে প্রসূত। আদর্শ-সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং আদর্শ সৌন্দর্য্যই অসীমের প্রতিবিম্ব। এইরূপে শিল্পকলাও আসলে ধর্ম্ম ও নীতিমূলক। কেননা, শিল্পকলার নিজস্ব ধর্ম্ম ও নিজস্ব প্রতিভা অক্ষুণ্ন থাকিলে, শিল্পকলা নিজ রচনার মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভৌতিক শৃখলের অকাট্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অচেতন প্রস্তরের উপর, অনিশ্চিত ও অস্থায়ী শব্দসমূহের উপর, সসীম-অর্থযুক্ত বাক্যের উপর রচনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া, এক একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উপযোগী করিয়া, শিল্পকলা ঐ সকল প্রস্তর ও শব্দাদিকে এক একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করে; এবং আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া, কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া, উহাদিগকে একটা রহস্যময় ভাবে অনুপ্রাণিত করে; বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, উহাদিগকে একটা অজ্ঞাত রাজ্যের মধ্যে লইয়া যায়। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কি মূর্ত্তি, কি গীত, কি বাক্য, যে আকারেই হউক, কি সুন্দর কি গম্ভীর যে ধরণেরই হউক, শিল্পরচনামাত্রই, মানব-চিত্তে একটা চিন্তাপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া আত্মাকে অনন্তের অভিমুখে উন্নীত করে। কল্পনা কিংবা জ্ঞানের পক্ষে ভর দিয়া আত্মা অনন্তের দিকেই উড়িতে চাহে—কি সুন্দরের পথ দিয়া, কি মঙ্গলের পথ দিয়া, আত্মা সেই একই গম্য স্থানে যাইতে চাহে। যে চিত্তবৃত্তি সুন্দরকে উদ্বোধিত করে সেই চিত্তবৃত্তি মানব আত্মাকে ফিরাইয়া ঐ অনন্তের দিকেই লইয়া যায়। শিল্পকলাই এই শুভকরী চিত্তবৃত্তিকে মনুষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

পদার্থের মূল উপাদান।

নিউটন্ কর্ত্তৃক মহাকর্ষণের (Gravitation) নিয়মাবিষ্কার, এবং ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ এই দুইটিই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই দুইয়ের পর ছোট বড় অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা গেছে এবং জড়-বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা নানা প্রকারে উন্নত হইয়াছে, কিন্তু প্রসারণে কোনটিই নিউটন্ ও ডারুইনের আবিষ্কারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগের খণ্ড খণ্ড নানা আবিষ্কার মানুষের শত শত আবশ্যক ও অনাবশ্যক কাজে লাগিয়া, বিজ্ঞানের ঘরাও দিক্‌টাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমা নিউটন্ ও ডারুইনই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। অনন্ত আকাশের সহস্র সূর্য্যোপম প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল-লুণ্ঠিত অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তুমাত্রেই বিধাতার যে মহা নিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বদা চলা-ফেরা করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা কেবল নিউটনের আবিষ্কারে জানিতে পারি। পুরুষপরম্পরায় জীব-রাজ্যের অধিবাসী হইয়াও, বিধাতা যে নিয়মে তাঁহার এই বৃহৎ রাজ্যটিকে শাসনে রাখিয়াছেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিতাম না, বৈজ্ঞানিক-বর ডারুইন্ অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়া বিশাল জীব-রাজ্যের শাসনতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। সম্প্রতি নিউটন ও ডারুইনের সিদ্ধান্তের ন্যায় আর একটি মহাবিষ্কার আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে জড়তত্ত্বের মূল ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

এই নূতন সিদ্ধান্তটির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়তত্ত্ব-সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন, তাহা মনে রাখা আবশ্যক। আজকাল জড়ের গোড়ার খবর জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদিগের শরণাপন্ন হইলে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেন, এই জগতে মোটে ৭০ বা ৮০টি মূল পদার্থ আছে এবং ইহাদেরি বিচিত্র সম্মিলনে জগতে নানাজাতীয় বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। জল-বায়ু পত্রপুষ্প তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থমাত্রকেই পরীক্ষা করিলে, আহাতে ঐ কয়েকটি মূল পদার্থ ব্যতীত অপর কোনও জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্‌টন্ (Dalton) এই সিদ্ধান্তটির প্রবর্ত্তক। ইনি পূর্ব্বোক্ত ৭০টি মূল পদার্থের অতি সূক্ষ্মকণাকে পরমাণু (Atom) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সত্তর জাতীয় মূল পদার্থের সত্তর প্রকার পরমাণুই যে সৃষ্টির মূল-উপাদান তাহাই ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণ সহস্র চেষ্টায় ঐ পরমাণুগুলির বিশ্লেষ করিতে পারেন নাই এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাতেও উহাদের কোন রূপান্তর দেখিতে পান্ নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ পরমাণুগুলির বিয়োগ নাই এবং কোনও স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তাহাদের একটিরও কোনই পরিবর্তন হয় না; সৃষ্টির সময় তাহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা যতগুলি ছিল, আজও ঠিক্ তাহাই রহিয়াছে, পরমাণুর নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস একেবারে অসম্ভব।

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ঠিক্ গোড়ার খবর দেওয়া বড় কঠিন; মূল কথায় বলিতে গেলে, এপর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই মূল-রহস্যের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। রহস্যোদ্ভেদের জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সকলকেই ফিরিতে হইয়াছে। প্রকৃতির কর্ম্মশালার রহস্য-যবনিকা যে কোন কালে মানব প্রচেষ্টায় উত্তোলিত হইবে, তাহারো আশা নাই। সুতরাং জগৎ-রচনার প্রারম্ভে যে কি প্রকারে মৌলিক জড় পরমাণুগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ডাল্‌টন্ সাহেব কোন কথাই বলিতে পারেন নাই।

ডাল্‌টনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ সে'টিকেই জড়তত্ত্বের মূল ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি তাহার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কোনও কারণ হয় নাই; কিন্তু সম্প্রতি যে এক নূতন সিদ্ধান্তের কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় ডাল্‌টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

নব-সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন, আমরা এপর্য্যন্ত মূল পদার্থের যে সকল অতি সূক্ষ্ম-কণাকে অবিভাজ্য ও চিরস্থির ভাবিয়া পরমাণু বলিয়া আসিতেছিলাম, সে গুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে পদার্থের চরম সূক্ষ্ম অংশ নয় এবং তাহাদিগকে অবিভাজ্যও বলা যায় না। পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রন্ (Electron) নামক যে এক প্রকার পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকেই তাঁহারা পরমাণু বলিতে চাহিতেছেন। ডাল্‌টন্ সাহেব যাহাদিগকে পরমাণু বলিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটিরই ভিতরে শত সহস্র ইলেক্ট্রন্ ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবী মঙ্গল বুধ ও শুক্রাদি জ্যোতিষ্ক যেমন নীরাময় স্থানে থাকিয়া সৌরজগতের রচনা

করিয়াছে, বহুসংখ্যক ইলেক্ট্রন্ সেই প্রকারে পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটি পরমাণুর সৃষ্টি করে। তা'ছাড়া সৌরজগতস্থ প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট গতি আছে, পরমাণুর গর্ভস্থ ইলেক্ট্রন্‌গুলিরও সেই প্রকার বিচিত্র গতি দেখা গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাল্‌টন্ সাহেব প্রত্যেক মূল পদার্থেরই এক এক জাতীয় বিশেষগুণসম্পন্ন পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গেছেন। নব-সিদ্ধান্তিগণ ইহা স্বীকার করিতেছেন না। ইহাঁরা দেখিয়াছেন, নবাবিষ্কৃত পরমাণু অর্থাৎ ইলেক্ট্রন্‌মাত্রেরই আকার প্রকার অবিকল এক। ইহারা যখন বিভিন্ন সংখ্যায় জোট বাঁধে, তখন সংখ্যা হিসাবে তাহাদের প্রত্যেক দল এক এক বিশেষগুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে এবং এই দলগুলিই আমাদের চিরপরিচিত নানাজাতীয় পরমাণু। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, কয়েক শত ইলেক্ট্রন্ জোট্ বাঁধিলেই একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু উৎপন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু রেডিয়ম্ (Radium) নামক ধাতুর একটিমাত্র পরমাণু উৎপন্ন করিতে লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রনের সম্মিলন আবশ্যক হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কোন মহান্ আবিষ্কার এপর্য্যন্ত একজন পণ্ডিতের জীবনের গবেষণায় সুসম্পন্ন হয় নাই। সকল স্থলেই দেখা যায়, বহুকালের বহু পণ্ডিতের সুদীর্ঘ সাধনার ফল পুঞ্জীভূত হইয়া, এক একটি বৃহৎ আবিষ্কারে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দু-হাজার বৎসর ধরিয়া নানা দেশের নানা পণ্ডিত কাব্য কবিতা ও দর্শনে যে মহা সত্যের আভাস দিয়া গেছেন, তাহাই ডারুইনের হস্তে পড়িয়া অভিব্যক্তিবাদে পরিণত হইয়াছিল। লা-প্লাস্ প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণ গ্রহ উপগ্রহাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, নিউটন্ তাহাকেই সম্মুখে পাইয়া, তাঁহার মহাবিষ্কারটি সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আলোচ্য মহাবিষ্কারটিতেও সেই প্রকার নানা দেশের নানা পণ্ডিতের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখা যায়। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, অধ্যাপক টম্‌সন্ এই ব্যাপারটির গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং তাহার দশ বৎসর পরে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল Bacquerel সাহেব ঐ সূত্রে তৎসংক্রান্ত অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া, গবেষণার পথ সরল করিয়া তোলেন। ইনিই ইউরেনিয়ম্ uranium নামক একটি ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, ইহার সম্মুখে ফোটোগ্রাফের কাচ রাখিলে, আলোকে উন্মুক্ত থাকিলে কাচে যেমন দাগ পড়ে, এখানেও ঠিক সেই প্রকার দাগ পড়িয়াছিল। ইহা হইতে বেকেরেল সাহেব ঠিক করিয়াছিলেন, ইউরেনিয়ম্ হইতে আমাদের অদৃশ্যে নিশ্চয়ই কোন প্রকার তেজ নির্গত হয় এবং তাহাই কাচের উপর পড়িয়া ফোটোগ্রাফের প্রলেপকে বিকৃত করিয়া তোলে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক করি সাহেবের * নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান যুগের একজন বড় বৈজ্ঞানিক। এই পণ্ডিতা রমণী বেকেরেল্ সাহেবের আবিষ্কারে বিস্মিত হইয়া অবিশুদ্ধ আকরিক ইউরেনিয়ম্ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইউরেনিয়ম্ ছাড়া রেডিয়ম্ নামক একটি অপরিজ্ঞাত ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল এবং বৈ-

---

* অল্পদিন হইল এই প্রবীণ পণ্ডিতটির মৃত্যু হইয়াছে। পারিস্ সহরের রাজপথে গাড়িচাপা পড়িয়া ইহাঁর মৃত্যু হয়।

জ্ঞানিকগণ ইহার অত্যাশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ধাতুটিই আজ রসায়নশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিতে বসিয়াছে।

রেডিয়ম্‌কে এপর্য্যন্ত অবিমিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। পরিমাণেও ইহাকে অধিক সংগ্রহ করা যায় নাই, বহুচেষ্টাতে এক একবারে এক গ্রেণের অধিক রেডিয়ম্ কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কণাপ্রমাণ অবিশুদ্ধ জিনিসটির যে সকল কার্য্য দেখা যায়, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অধ্যাপক বেকেরল্ ইউরেনিয়ম্ হইতে, একপ্রকার তেজঃ নির্গত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রেডিয়ম্ হইতে তিন রকমের রশ্মিনির্গমন সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। এই তিনটির প্রথমটিকে বৈজ্ঞানিকগণ ক-রশ্মি (Alpha-rays) নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহা হেলিয়ম্* (Helium) নামক একপ্রকার ধাতুর অণুময় প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নয়। দ্বিতীয়টিতে ও অর্থাৎ খ-রশ্মিতে (Beta-rays) আর একপ্রকারের অতি সূক্ষ্ম অণুর অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছিল। গ-রশ্মিতে (Gamma-rays) অণুপ্রবাহের লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরীক্ষায় স্থির হইয়াছিল, ইহা সাধারণ রন্‌জেন্ রশ্মির ন্যায়, কোন প্রকার আলোকের তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রেডিয়মের অতি সূক্ষ্মকণা হইতে ঐ প্রকারে হেলিয়ম্ নামক একটি সম্পূর্ণ পৃথক মূলপদার্থের উৎপত্তি দেখিয়া এবং খ-রশ্মিতে পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অণুর প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া, ডাল্‌টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্ত যে অযৌক্তিক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্থির হইল,—পরমাণু অবিভাজ্য নয়, এবং ইহা ইলেক্‌ট্রন্ নামক কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি মাত্র। রেডিয়ম্ যেমন হেলিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই প্রকার যে-কোন পদার্থের পরমাণু তাহার মধ্যস্থ ইলেক্টন্ প্রক্ষেপ করিয়া,পদার্থান্তরের পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতে পারে। আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল বস্তুকে মূলপদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা মূল পদার্থ নয়। জগতে মূল পদার্থ একক ইলেক্টন্‌ই; ইহাই একমাত্র পরমাণু। হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন,লৌহতাম্রাদি ধাতব পদার্থের যে সকল সূক্ষ্ম অংশকে আমরা পরমাণু বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা ঐ এক ইলেক্টনেরই বিচিত্র বিন্যাসে উৎপন্ন।

এই আবিষ্কার সমাচার প্রকৃতই উপকথার ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। ডাল্‌টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতার কথা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও কাহারো মনে উদিত হয় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ইহা একটি মহাকীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। শুনিয়াছিলাম, অতিপ্রাচীনকালের রসায়নবিদ্‌গণ "পরশ পাথরের" সন্ধানে ঘুরিতেন; লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করাই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের চরম-লক্ষ্য ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সমস্ত শ্রমই ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল।—"পরশ-পাথর" মিলে নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই "পরশ-পাথরে"রই সন্ধান পাইয়াছেন। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রদারফোর্ড্ (Rutherford) সাহেব দেখাইয়াছেন, রেডিয়ম্-কণা ইলেক্টন্ ছাড়িতে

* গত ১৮৯৫ সালে অধ্যাপক রাম্‌জে (Ramsay) এই ধাতুটির আবিষ্কার করেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র (spectroscope) দিয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া কেবল সূর্য্যমণ্ডলেই ইহার অস্তিত্বলক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

ছাড়িতে শেষে সীসকে পরিণত হইয়া পড়ে। সুতরাং লৌহকণায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ইলেক্ট্রন্ সংযুক্ত হইলে, সেটি যে স্বর্ণে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ইলেক্ট্রন্‌গুলি সে গুলিকে এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর পরিভ্রমণ করাইয়া নানা পদার্থের পরমাণু রচনা করে, তাহা আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। মানুষের সসীম বুদ্ধি যে, কোন কালে সেই অসীম শক্তির ভাণ্ডারের সংবাদ বহিয়া আনিতে পারিবে, তাহার আশা নাই। মানুষকে চিরদিনই সেই অসীমের পাদমূলে মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে। তাই মনে হয়, অধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ "পরশ পাথরে"র সন্ধান পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে করতলগত করিবার সামর্থ্য বোধ হয় তাঁহাদের কোন কালেই হইবে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

অপৌত্তলিক উপাসনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান চারিটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ১ম অপৌত্তলিক ব্রহ্মোপাসনা, ২য় গৃহে গৃহে পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, ৩য় ব্রহ্মের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অন্য কথায় মধ্যবর্ত্তিত্বের অভাব, ৪র্থ শাস্ত্র কোন গ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ নহে, মানব প্রকৃতিমূলক সারসত্যই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মরূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না—এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক আমরা যেন পৌত্তলিক উপাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করি। ব্রাহ্মগণ! তোমরা সত্যের অবমাননা করিয়া অসত্যকে বরণ করিও না। সত্যকে আপনার মনের মতন গড়িয়া লইও না—আত্মাকে সত্যের প্রতি উন্নত কর। যিনি "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" তাঁহার আসনে উপদেবতা সকলকে স্থাপন করিও না। অসীমকে সসীমভাবে উপাসনার কুফল অবশ্যম্ভাবী; উহা হইতেই আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্গতি ও অবনতি। এই কারণেই বর্ত্তমানে কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী ভূমা পরমেশ্বরকে বন্দিশালায় আনিয়া তাঁহার উপাসনা মৌখিক বাহ্য ক্রিয়াতে পরিণত করিয়াছি, আত্মা ও পরমাত্মার আন্তরিক সহবাস চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন—আমরা প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করি না, অনন্তের স্মরণচিহ্ন ভাবিয়াই তাহার পূজা করি। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, যাহা স্মৃতিচিহ্ন মাত্র, কালে তাহাই দেবতা হইয়া দাঁড়ায়—নকল ও আসল একীভূত হইয়া যায়। ইহা অবশ্যম্ভাবী। যাহা স্মরণচিহ্নমাত্র, তাহাতেই আমরা দেবত্ব আরোপ করিয়া বসি, তাই এক ঈশ্বরের আসনে অসংখ্য অগণ্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশেষে এতই দুর্গতি হইয়া পড়িয়াছে, যে বসন্ত প্রভৃতি রোগের বিভিন্ন দেবতা কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্য নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় অক্ষম সুতরাং মূর্ত্তি পূজা ভিন্ন আর গতি নাই, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত—ইহুদী, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তাহাদের ইতিহাসে কি দেখা যায়? প্রথমে যাহারা মূর্ত্তিপূজক ছিল এক্ষণে তাহারা একেশ্বরবাদী। আমাদের মধ্যেও অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মুসলমানেরা আমাদিগকে 'বুৎপরস্ত'

বলিয়া ঘৃণা করে। আমরা যেন ঐ নিন্দাবাদের উর্দ্ধে উঠিতে পারি। সেই অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র বিরোধী নহে। শাস্ত্রে কনিষ্ঠ অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ অধিকারির উল্লেখ আছে। জ্ঞানীরা ব্রহ্মের অধিকারী। যদি তাহাই হয় তবে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা কি চিরকালই শিশুর মত থাকিব? শৈশবকালে পুতুল খেলা শোভা পায়, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে নহে। এত জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা, বিবিধ-বিদ্যার আলোচনা, এখনও আপনাদিগকে কি কনিষ্ঠ অধিকারী ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিব? নিম্ন হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হইব না? এমন মনে করিবেন না যে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিলে আমরা হীনবল নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িব। আমাদের একঘোরে হইবার ভয় নাই। একবার ভাবিয়া দেখুন আমাদের দলবল কি সামান্য? অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসক সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। সর্ব্বোপরি বেদ উপনিষদের ঋষিগণ,তাহার পরে নানক কবীর প্রভৃতি এদেশীয় একেশ্বরবাদী,আর্য্যসমাজ, মুসলমান-সমাজ—বলিতে গেলে সমুদয় সভ্য-জগতের লোক, আজ অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসক। বৈদিক-সময়ে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে" যিনি আত্মদাতা বলদাতা সমুদয় বিশ্ব যাঁহার উপাসনা করিতেছে আমরা সেই দেবতার উপাসক। উপনিষদের ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ" তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্যশ; অর্থাৎ তাঁহার যশোভাতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান।

এবিষয়ে মহর্ষির দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য কর। তাঁহার আত্মজীবনীতে দেখিতে পাইবে তিনি এই অপৌত্তলিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কত না আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন—কত নিন্দা গ্লানি অকাতরে সহ্য করিলেন—পরিবারের সহিত বিচ্ছেদবশতঃ কত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিলেন তথাপি তিনি সত্যকে ধরিয়া রহিলেন—ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না—তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন না। অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানে তাঁহার মানসিক দৃঢ়তার যে পরিচয় পাই, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই দৃষ্টান্তে তোমরাও বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানে এক হইয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাক। অবস্থা-বিশেষে একটুকুও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আমরা সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং"সত্য হইতে রেখামাত্র বিচ্ছিন্ন হইবেক না। হিন্দু সমাজ হইতে যদি বা বিচ্ছিন্ন হইতে হয় তথাপি ধর্ম্ম হইতে—সত্য হইতে আমরা যেন রেখাপরিমাণ পরিচ্যুত না হই। প্রচলিত হিন্দু সমাজের দুই বাহু—পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ। পৌত্তলিকতার স্থানে এক অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে শত সহস্র বাধা আমাদের পথে আসিয়া পড়িবে সত্য, কিন্তু সে সকলকে অতিক্রম করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।" সকলে উত্থান কর, জাগ্রত হও, প্রকৃত সদ্‌গুরুর নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছি? এই যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মই আমাদের আরাধ্য দেবতা। সৃষ্টবস্তুকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিবেক না। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রীতি কর,এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়া জীবনের কর্ত্তব্যসকল সম্পন্ন কর, ইহাতেই তোমাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ।

হারামণির অন্বেষণ।

উপক্রমণিকা।

প্রাণ চায় তো আর কিছু না—কেবল সে খাইয়া-পরিয়া কথঞ্চিৎপ্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে। মনের আকিঞ্চন আর একটু বেশী—মন চায় আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে। জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে—জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া নিত্যকাল আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকা'র ব্যাপারটাকে আপনার কর্ত্তৃত্বের মুঠার মধ্যে আনিতে। জ্ঞান যাহা চায়, তাহা সে পাইবে কেমন করিয়া। জ্ঞান যে আত্মবিস্মৃত। একএকবার বিদ্যুতের ন্যায় যখন তাহার স্মৃতি গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন সে মাথা তুলিতেছে—তাহার পরক্ষণেই নতশির! আত্মাকে হারাইয়া জ্ঞান দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে বড়ই বিষম! মণিহারা ফণীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিতেছে যখন-তখন! হারামণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যেখানে-সেখানে! চেষ্টা ছাড়িতেছে না কিছুতেই! একবারকার রোগী যেমন আরবারকার রোঝা হয়, জ্ঞান তেম্নি—একবার প্রাণ হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, একবার মন হইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে, একবার বুদ্ধি হইয়া উত্তরপ্রদান করিতেছে। বুদ্ধির কথা—একবার মন বুঝিতেছে, প্রাণ বুঝিতেছে না; একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন বুঝিতেছে না; একএকবার আবার এমনও হইতেছে যে, বুদ্ধি নিজের কথা নিজে বুঝিতেছে কি না, সন্দেহ। নানা শ্রেণীর নানা কথার ঘ্যানঘ্যানানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি জ্ঞানকে বলিলাম—"তোমার আপনার সঙ্গে আপনার এরূপ বোঝাপড়া চলিতে থাকিবে কতদিন?" ভ্রূললাট কুঞ্চিত করিয়া জ্ঞান তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "হারামণি পাওয়া না যাইবে যতদিন।"

প্রশ্নোত্তর।

মূল জিজ্ঞাস্য দুইটি—(১) কি আছে এবং (২) কি চাই। ইহার সোজা উত্তর এই যে, আছে সত্য,—চাই মঙ্গল।

প্রশ্ন। এ যে একটি কথা। তুমি বলিতেছ "আছে সত্য"—তোমার এই গোড়া'র কথাটি'র ভাবার্থ আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে, যাহা আছে, তাহাই সত্য। তবেই হইতেছে যে, সবই সত্য—সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। কিন্তু মঙ্গল চাহিতে গেলে মঙ্গল বলিয়া একটা পৃথক্ বস্তু থাকা চাই, আর, তা ছাড়া—চাহিবার একজন কর্ত্তা থাকা চাই। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ যখন নাই—তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদ্ব্যতীত চাহিবার বস্তুই বা পাইতেছ কোথা হইতে—চাহিবার কর্ত্তাই বা পাইতেছ কোথা হইতে?

উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্তু, আপনিই চাহিবার কর্ত্তা। সত্য আপনাকে আপনি চা'ন, আপনাকে আপনি পা'ন, আপনাতে আপনি আনন্দে বিহার করেন;—সত্যই মঙ্গল।

প্রশ্ন। আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা কিরূপ, আপনাকে-আপনি-পাওয়াই বা কিরূপ?

উত্তর। সত্য যদি কস্মিন্‌কালেও কাহারো নিকটে প্রকাশিত না হ'ন; না আপনার নিকটে—না অন্যের নিকটে—কাহারো নিকটে কোনোকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনোকালে যে কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন—মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে "সত্য আছেন"-কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি যে

আছেন, তাহা কে বলিল? তাহার প্রমাণ কি? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না পাইয়া থাকেন, আর, তবুও যদি তুমি বলো "সত্য আছেন", তবে তোমার সে কথার মূল্য—এক কানাকড়িও নহে। দ্বিপ্রহর রজনীতে তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে, তখন তুমি ভাবিতেও পার নাই যে, সত্য বলিয়া এক অদ্বিতীয় ধ্রুব-পদার্থ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান। তোমার নিদ্রাভঙ্গে যখন তোমার নবোন্মীলিত চক্ষে চেতনের কপাট এবং দিক্‌চক্রবালে আলো-কের কপাট—এক কপাট মর্ত্ত্যলোকে এবং আর-এক কপাট স্বর্গলোকে—দুই লোকে দুই কপাট একই সময়ে উদ্ঘাটিত হইল, আর সেই শুভযোগে যখন তুমি উপরে-নীচে আশেপাশে এবং চারিদিকে চাহিয়া-দেখিয়া জানিতে পারিলে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্যও যাহা ছিল—অদ্যও তাহাই আছে, আর, সেই সঙ্গে যখন দেখিলে যে, বিশ্ব-জননী প্রকৃতির ক্রোড়ে কল্যও যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া ছিলে, অদ্যও তেম্নি নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া আছ, তখন তোমার মন বলিল যে, সত্য আছেন, আর, তোমার সুবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিল। "কে তোমাকে জাগাইয়া তুলিল?" এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ, "আমাকে কেহই জাগাইয়া তোলে নাই—আমি আপ্নি জাগিয়া উঠি-য়াছি।" এটা তুমি দেখিতেছ না যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ "আমি আপ্নি"—তোমার গতরাত্রের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সে আপ্নি ছিলই না মূলে, তাহার পরিবর্ত্তে ছিল কেবল একটা অন্ধ, পঙ্গু এবং অকর্ম্মণ্যের একশেষ তোমার বিছানায় পড়িয়া। সেই অসাড় অপদার্থটা'র কর্ম্ম কি আপনার বলে অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানে ভর করিয়া দাঁড়ানো? যাহার হাত-পা অসাড়, চক্ষু অন্ধ, তাহার কি কর্ম্ম সাঁতার দিয়া পদ্মা পার হইয়া উচ্চডাঙায় উঠিয়া দাঁড়ানো? সে তো তখন অকর্ত্তা। অক-র্ত্তা'র আবার কর্ম্ম কিরূপ? অকর্ত্তার কর্ম্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্রও তেম্নি, দুইই সমান। ফল কথা এই যে, তোমার প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় একে তো জাগিয়া উঠিতে পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে একবিন্দুও; তাহাতে আ-বার, জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা যে, কোনো দিক্ দিয়া তোমার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিবে, তাহার পথ ছিল না মূলেই। অতএব এটা স্থির যে, তুমি আপন ইচ্ছায় জাগিয়া ওঠো নাই। কাহার ইচ্ছায় তবে তোমার মনের অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া প্রাণের ভিতর হইতে জ্ঞানের আলোক অল্পে-অল্পে ফুটিয়া বাহির হইল? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কাজেই বলিতে হইতেছে যে, জাগ্রৎ-জগতেই হো'ক্ আর নিদ্রিত জগতেই হো'ক্, পর্ব্বতশিখরেই হো'ক্ আর সমুদ্র-গর্ভেই হো'ক্, পর্ণকুটীরেই হো'ক্ আর স্বর্ণপ্রাসাদেই হো'ক্—যেখানে যে-কোনো কার্য্য হইতেছে, হইতেছে তাহা সত্যেরই ইচ্ছায়—তোমার ইচ্ছায়'ও নহে, আমার ইচ্ছায়'ও নহে। সত্যই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-তুলিয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন; তা' শুধু না—তিনিই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া রাখিয়া তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকু-তোভয়ে বলিতে পারিতেছ যে, সত্য আছেন। সত্য এই যে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন, আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভরিয়া পান করিয়া প্রত্যহ

পুনর্জন্ম লাভ করিতেছ, ইহার অবশ্যই কোনো-না কোনো নিগূঢ় কারণ আছে—নহিলে সত্যই বা তোমার কে, আর, তুমিই বা সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই, আর, সত্য তোমাকে দেখা না দিলে তাঁহার নিস্তার নাই। কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি তো আর অসত্য নহ। তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান! তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে তোমাকে কে বা পুঁছিত? তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন; সত্য সত্যেরই নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন—পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে, তোমার নিকটেই হো'ক্, আমার নিকটেই হো'ক্, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নিকটেই হো'ক্, যাহারই নিকটে সত্য প্রকাশ পা'ন—প্রকাশ পা'ন তিনি সত্যেরই নিকটে—আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি, আর, তাহারই নাম সত্যকে পাওয়া। আপনাকে আপনি-পাওয়া কিরূপ, তাহা দেখিলাম, এখন আপনাকে-আপনি-চাওয়া কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্। আপনার প্রকাশে যখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টির সেই যে প্রসক্তি, তাহা শুধুই কি কেবল চক্ষের চাওয়া? উদাসীন পরিব্রাজক পার্শ্বস্থ পুরস্বামীর প্রতি যে-ভাবে মহূর্তেক চাহিয়া আপনার গন্তব্যপথ অনুসরণ করেন, উহা কি সেইভাবের চাওয়া? সত্য কি আপনার নিকটে আপনি কোথাকার কোন একজন বেয়ানা লোক? তাহা হইতেই পারে না। ঠিক্ তাহার বিপরীত। পরস্পরের পছন্দসই সুবিবাহিত বরকন্যার শুভদৃষ্টির বিনিময়কালে উভয়ের চক্ষের চাওয়া'র মধ্য দিয়া কেমন অকৃত্রিম প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে—তাহা তো তোমার দেখিতে বাকি নাই! সেই-ভাবের প্রাণের চাওয়া'র সঙ্গে আপনাকে-আপনি চাওয়া'র সৌসাদৃশ্য থাকিবারই কথা, কেন না, সুবিবাহিত বরকন্যা দোঁহে দোঁহার দ্বিতীয় আপ্নি। এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য যতই থাকুক্ না কেন, তাহা সৌসাদৃশ্য বই-আর-কিছুই নহে; সে সৌসাদৃশ্য একপ্রকার অপ্রতিমের প্রতিমা বা জ্যোতির্মণ্ডলের গাত্রচ্ছায়া। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য যে কিরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পবিত্র-মধুময়-ভাবে আপনার প্রতি আপনি চা'ন, আর, সেই অনিরুদ্ধ জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য দিয়া অতলস্পর্শ গভীর প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীর গম্ভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে—মহাসংযম এবং মহা-উদ্যম দুয়ের অনির্ব্বচনীয় যোগ-প্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদে নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূর্ভুবস্বঃ হইয়া দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহা (আমরা তো কাটাণুকাট) মহোচ্চ দিব্যধামবাসী মুনি-ঋষি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত।

প্রশ্ন। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাসা থামিতেছে না—বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমি চাই জানিতে চাওয়া এবং পাওয়া একত্র বাস করিবে কেমন করিয়া? বাঘে গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া? আমি তো এইরূপ বুঝি যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ভিতর হইতে চাওয়া

বাহির হইতে থাকে; পাওয়া হইলেই চাওয়া ঘুচিয়া যায়। তবে যদি বলো যে' সত্য কোনো-সময়ে বা আপনাকে পা'ন, কোনো-সময়ে বা আপনাকে চা'ন; সেটা বটে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাই কি তোমার অভিপ্রায়? তুমি কি বলিতে চাও, সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ? আবার তা'ও বলি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া কতদূর সম্ভবে—সেটাও একটা ভাবিবার বিষয়—বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি যে, রাত্রিকালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অপ্রকাশ যে-সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, সে সময়ে চাওয়া ধুইয়া পুঁছিয়া মন হইতে এম্নি সাফ্ সরিয়া পালায় যে, তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বলিতে কি—আমার জিজ্ঞাসা রক্তবীজের সহোদর—মরিতে চাহে না কিছুতেই! এক বীরের নিপাত হইল তো অম্নি তার জায়গায় তিন বীর আসিয়া তাল ঠুকিয়া দণ্ডায়মান! তার সাক্ষী:—

নবোত্থিত তিন প্রশ্ন।

(১) চাওয়া-পাওয়া'র একত্র-বাস কিরূপে সম্ভবে?

(২) সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ না চিরপ্রকাশ?

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত চাওয়া-পাওয়া'র কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর আমি যথাক্রমে দিব—মাসখানেক ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো।

নানা কথা।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।—বিগত ২৩এ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বৃষ্টির আধিক্য হইলেও উপস্থিতের সংখ্যা মন্দ হয় নাই। হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টান বৌদ্ধ আর্য্যসমাজী অনেকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি সভায় আসিয়াছিলেন। সঙ্গীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইলে বর্দ্ধমানাধিপ যাহা বলেন তাহার সারাংশ এই "ক্ষুদ্রাকারে যদিও ব্রহ্ম-বিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইতে চলিল, আশা করি ভবিষ্যতে ইহা সমগ্র ভারতের হইয়া দাঁড়াইবে। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; বিনয়েন্দ্র বাবু এখনই তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবেন। যে অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহার অনুকূলে আমি কয়েকটি মাত্র কথা বলিব। আমরা চাই যে প্রকৃত একেশ্বরবাদিগণ এখানে মিলিত হইয়া নিজ নিজ মতের আলোচনা করিবেন—সাহায্য করিবেন যাহাতে উৎসাহী যুবকগণ এখান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতের সকল শ্রেণীর ভিতরে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে উপাসনারত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ঔদাসীন্য দূর করিয়া দেয়। আমি যে কেবলমাত্র একজন ভারতবাসী তাহা নহে, আমি আর্য্য সন্তান। আমি বিষন্ন হইয়া চিন্তা করি হায়! ভারতবাসীকে কি আবার একেশ্বরবাদ স্মরণ করিয়া দিতে হইবে। ইহা কি সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে যেখানে একেশ্বরবাদ বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে, কিন্তু হায়! এমনই বিকলাঙ্গ যে চিনিবার জো নাই, উহা বহু-ঈশ্বরবাদে—পৌত্তলিক উপাসনায় পরিণত, তাই হিন্দু সমাজের এই ভীষণ দুর্গতি—কেবলই জীবনশূন্য আড়ম্বর ও পদ্ধতির ভিতরে ধর্ম্ম আবদ্ধ; তাই ভারত ও ভারতবাসীর এই ভয়ানক অবনতি। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! বর্ত্তমানে তোমরা নানাবিধ ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তৎসমস্ত প্রকৃত কল্যাণকর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঈশ্বরের নাম-প্রচার কি সত্য সত্যই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে! ঈশ্বরকে তোমরা অবহেলা করিতেছ, কেবল কি ভয় বিপদের সময় তাঁহার আশ্রয় পাইতে চাও। মৃণ্ময় দেব-মূর্ত্তি হইতে তোমার কোন প্রত্যাশা নাই। মানব-রূপী দেবদেবী হইতে যখনই তোমার বিশ্বাস বিচলিত হইবে, তখনই তোমার আত্মা প্রকম্পিত হইবে, অনুতাপ জাগিয়া উঠিবে, ব্যাকুলতার সহিত বলিবে, হে ঈশ্বর! আমাকে দয়া কর। প্রার্থনা চাই, প্রার্থনার মত আর বল নাই; কিন্তু সেই প্রার্থনা সেই সত্য-স্বরূপ কৃপাময় মহাবলী ঈশ্বরের দিকে উঠা চাই। কিন্তু কেন আমরা তাঁর প্রতি বিমুখ, কেন তাঁর প্রতি আমাদের এত বিরাগ—সেই দেশে যেখানকার অধিবাসী তাঁহার গুহ্য-বাণী সর্ব্ব প্রথমে শ্রবণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! ক্রিয়া-কাণ্ড লইয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত ও বিভ্রান্ত—

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জোর করিয়া সে শিক্ষা আমাদিগকে দিয়াছেন—এখনও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার জন্য বড় অধীর। তুমি পূজা করিতেছ, গৃহ দেবতার আরাধনা করিতেছ, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া ইংরাজি বাজনা বাজাইয়া উপনয়ন ও বিবাহ দিতেছ, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বর্ণ রৌপ্যের তৈজস বিতরণ করিতেছ; কিন্তু ভিতরে নাস্তিক তুমি; গোপনে পরদারসেবা ও জঘন্য পাপ কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত নহ; তথাপি তুমি তোমার সমাজে শ্রেষ্ঠ-হিন্দু বলিয়া পরিগণিত। এই কি প্রেমের ধর্ম্ম, ঈশ্বরের ধর্ম্ম, যাহার জন্য মুক্তি পাইতে চাও। আমি একজন সংস্কারক নহি, নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া ভাণ করি না; কিন্তু এই মাত্র বলিতে চাই, বৈদেশিক আকারে রাজনৈতিক ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছ—কিন্তু যাহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃত অভাব, তাহার প্রতি তুমি অন্ধ। সকল বর্ণকে মিলিত করিয়া এক জাতি নির্ম্মাণের একমাত্র উপায় আছে, তাহা সত্য ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্ববিধ মীমাংসা উহা হইতেই সম্ভব। নিজ হস্তে সমাজকে সংস্কৃত কর, ইহার সর্ব্ববিধ কালিমা মুছাইয়া দাও। নিজে জাগ্রত হও, ভারতে একেশ্বরবাদপ্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি কর, অসাম্প্রদায়িক ও উদারভাবে ইহার প্রচারে প্রবৃত্ত হও। যদি জিজ্ঞাসা কর, একেশ্বরবাদ হইতে কি মিলিবে, উত্তরে বলিব পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি, দীনে দয়া, আত্ম-বিসর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়—খৃষ্টধর্ম্মকে যাহা গরীয়ান করিয়াছে, পাদ্রীগণের (dogma) অন্ধমত শিক্ষা দানের কথা বলিতেছি না। ভারতের দূরবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ কর দেখিবে বৃদ্ধ মৃত্যু শয্যায় শায়িত, বিসূচিকা বা প্লেগ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; ঘোর যন্ত্রনায় সে অধীর—সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। এই রাজধানীর ভিতরেই দেখিবে, জীর্ণ-দুর্ব্বল ক্ষুদ্র-অশ্ব সবেগে গাড়ি টানিয়া চলিতেছে; সারথী আরও গতিবেগবৃদ্ধি জন্য অশ্বের ক্ষতপৃষ্ঠের উপর নৃশংস কষাঘাত করিতেছে; লোকে দেখিয়াও দেখে না। সেই পরমপিতাকে আরাধনা কর, মনুষ্য ও জীবে প্রীতি অবতীর্ণ হইবে, নিষ্ঠুরতা চলিয়া যাইবে, কেন না ঈশ্বর যিনি, তিনি প্রেম দয়া ও শান্তির প্রস্রবণ।"

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বক্তার করুণ ও বিশাল হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদেশ ভ্রমণে রাজার মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। অন্যদেশের আচার ব্যবহার নিজ চক্ষে সন্দর্শন করিয়া না আসিলে সকল সময়ে আপনাদের ত্রুটি অনুভব করা যায় না, বা তাহা দূর করিবার জন্য ঐকান্তিকতা আইসে না। আমরা বর্দ্ধমানপতির নিকট অনেক বিষয় প্রত্যাশা করি। বিদ্যা ও ধন-ঐশ্বর্য্যে যাঁহারা প্রভুত্ববান, তাঁহাদের সামান্য ইঙ্গিতে যে মহৎ কার্য্য অচিরে সুসাধ্য ও সুসম্পন্ন হয়, দরিদ্রের শত চীৎকারে সে ফল ফলে না।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানপতির পিতামহ স্বর্গীয় মহাতাপ চাঁদ বিলক্ষন সুশিক্ষিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রাসাদে তাঁহারই ব্যবস্থায় ব্যাপককাল ধরিয়া আদি-ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র শিরোমনি মহাশয় সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। উপাসনা কয়েক বৎসর হইল শিরোমণি মহাশয়ের দেহান্ত হওয়ায় বন্ধ রহিয়াছে। বেদ-শিক্ষার জন্য যে চারি জনকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশীধামে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম সুপণ্ডিত স্বর্গীয় ~~শ্যামাচরণ তত্ত্বাবাগীশ ও~~ তারকনাথ তত্ত্বরত্নকে পরলোক-গত রাজা মহাতাপচাঁদ মহর্ষির নিকট হইতে লইয়া নিজ রাজ-সংসারে নিয়োগ করেন এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে মহামূল্য মহাভারত অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহারও তত্ত্বরত্নের ভ্রাতা অঘোরনাথের এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে অনুবাদ কার্য্য প্রধানতঃ সুসম্পন্ন করিয়া লন। বর্ত্তমান মহারাজ হইতেও তাঁহার পবিত্র বংশ আরও ভাস্বর হইবে, আপনাদের পূর্ণভরসা।

আগামী বারের পত্রিকায় ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত সম্বন্ধে পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

আজান।—মুসলমানদিগের মসজেদ হইতে প্রার্থনার পূর্ব্বে মৌলবীগণ উপাসকবর্গকে সমবেত হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে যে আহ্বান করেন, তাহাকে আজান কহে। কর্ম্মনিরত সংসারনিমগ্ন জনসাধারণকে উপাসনার্থ আহ্বান বড়ই সুমিষ্ট। উহার অনুবাদ এই, "ঈশ্বর মহান্! ঈশ্বর মহান্! ঈশ্বর মহান্! ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, আমি তার সাক্ষী। মহম্মদ ঈশ্বরের দূত, আমি তার সাক্ষী। প্রার্থনার জন্য আইস। প্রার্থনার জন্য আইস। মুক্তির জন্য আইস। ঈশ্বর মহান্। ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই। (প্রাভাতিক আজানে আরও বলিতে হয়) "নিদ্রা অপেক্ষা প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর।"

নমাজ।—মুসলমানগণের প্রার্থনার অনুবাদ এই "এই প্রভাতে সরল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করি; ঈশ্বর মহান্! হে ঈশ্বর পবিত্র তুমি, তোমাতেই প্রশংসা; মহান্ তোমার নাম ও গৌরব; তোমা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। সদয় ও কৃপাময় ঈশ্বরের নামে অভিশপ্ত সয়তানের নিকট হইতে (তোমাতে) রক্ষা পাইতে চাই। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক; তিনি সমুদয় পৃথিবীর অধিপতি, দয়াময় ও কৃপালু, বিচার-দিনের রাজা। আমরা

তোমাকেই পূজা করি, তোমারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। সরল-পথে আমাদিগকে পরিচালিত কর—তাহাদের সেই পথে—যাহাদের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ—যাহাদের উপর ক্রোধ কর নাই—যাহারা বিপথে গমন করে না"। আমেন।

দান (জাকাত)।—কোরাণের আদেশ মুসলমান মাত্রকেই দান করিতে হইবে। অর্থ, পশু, ফল, শস্য, পণ্যদ্রব্য এ সমস্তই দানের সামগ্রী। যিনি চল্লিশ টাকার অধিকারী, তাঁহাকে অন্ততঃ এক টাকা দান করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিশতে দানের অঙ্ক আড়াই টাকা। সকল পশু সম্বন্ধে দানের অঙ্ক সমান নহে। ফল-শস্য সম্বন্ধে দানের অঙ্ক অধিক। দরিদ্র মক্কাযাত্রী সন্ন্যাসী, ঋণ-শোধে অক্ষম লোক, ভিক্ষাজীবী, নিঃস্ব পথিক, মুসলমানধর্ম্মে নবদীক্ষিতগণই কোরাণের মতে যথার্থ দানের পাত্র। কোরাণের দানের বিধি-ব্যবস্থা অন্যত্র বড়ই দুর্লভ।

কর্ত্তব্য-পঞ্চক।—মুসলমানদিগকে পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন করিতে হয়। (১) বলিতে হইবে ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার প্রবক্তা (২) প্রতিদিন পাঁচ বার নমাজ অর্থাৎ প্রার্থনা করিতে হইবে, (৩) রমজান মাসে ৩০ দিন উপবাস করিতে হইবে, (৪) দান করিতে হইবে, (৫) জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা যাইতে হইবে।

ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে মুসলমানগণের যেরূপ উচ্চ ধারণা, তাহা অন্য ধর্ম্মে বিরল। ইমাম গাজালি বলেন "ঈশ্বর এক, তাঁহার (অংশী) সঙ্গী নাই, বিচিত্র তাঁহার সত্তা, কেহ তাঁহার সমান নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, স্বতন্ত্র, পুরাতন, কেহ তাঁহার আদি নাই। তিনি অনন্ত, সনাতন, আদি-অন্ত-বিহীন। তিনি চিরকালই থাকিবেন, তাঁহার শেষ নাই। তিনি আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। সকল মহিমা তাঁহাতে। দেশ কালে তিনি অপরিচ্ছেদ্য। আদি ও অন্তে তিনি। তাঁহার শরীর নাই। তিনি অসীম অপরিমেয়। দেহের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য নাই, কেন না দেহের পরিমাণ আছে এবং দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যায়। তিনি বস্তু নহেন এবং বস্তুও তাঁহাতে নাই। তিনি হটাৎ উৎপন্ন হন নাই—আকস্মিকতা তাঁহাতে নাই। তিনি অপরিমেয়, সীমার মধ্যে তিনি নাই, কেহ তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই। স্বর্গে তিনি অবস্থিত নহেন। তিনি তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সিংহাসনে—যাহার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়াছেন।

মুসলমান-সমাধি (জানাজা)।—শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাওয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষ পুণ্যপ্রদ। শবের পশ্চাতে নগ্নপদে যাইতে হয়। সমাধি স্থলে প্রার্থনা পঠিত হয় না। মসজেদে, মৃতের বাটীর বা সমাধি-স্থলের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে প্রার্থনা হয়। ইমাম বা কাজি এই ভাবে প্রার্থনা করেন "আমি মৃতের সম্বন্ধে প্রার্থনা করি, আমি এই মৃতের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর পবিত্রতা তোমাতে—তোমাকে প্রশংসা করি। মহান্ তোমার নাম। অসীম তোমার মহত্ব ও খ্যাতি। তোমা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান্! হে ঈশ্বর! মহম্মদের উপর কৃপা কর, তাঁহার বংশাবলীর উপর কৃপা কর; যেরূপ এব্রাহাম ও তাহার বংশীয়গণের উপর তুমি দয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ ও কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলে। তোমাতে প্রশংসা, মহান্ তুমি। যাহারা জীবিত ও মৃত, যাহারা এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত, আমাদের সন্তান সন্ততি—যাহারা পূর্ণবয়স্ক-পুরুষ বা স্ত্রী, সকলকে ক্ষমা কর। আমাদের মধ্যে যাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছ, তাহাদিগকে ধর্ম্মেতে জীবিত রাখ; যাহারা মরণোন্মুখ—বিশ্বাসে তাহাদিগকে মরিতে দাও। ঈশ্বর মহান, শান্তি ও দয়া তোমাতে। শান্তি ও দয়া তোমাতে।" পরে সমাগত লোকেরা বসিয়া নিস্তব্ধ ভাবে মৃতের আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। শেষ হইলে তাহারা বলে "ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা", উত্তরে মৃতের ঘনিষ্টতম আত্মীয় বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমি সন্তুষ্ট", আপনারা যাইতে পারেন। যাহাদের ইচ্ছা চলিয়া গেলে অবশিষ্ট লোকেরা শবের মুখ মক্কারদিকে ফিরাইয়া উত্তর দিকে মস্তক দক্ষিণে পদদ্বয় রাখিয়া মৃত্তিকাগর্ভে উহাকে স্থাপন করিবার সময় বলে "আমরা ঈশ্বরের নামে এবং মহম্মদের ধর্ম্মের বিধানে মৃতকে ধরাগাত্রে সমর্পণ করিলাম।" এই বলিয়া সমাধিগহ্বর পূর্ণ করিয়া দেয়। পরে সমাগত দরিদ্র ও ফকিরদের মধ্যে দান করিতে হয়। সমাধির তৃতীয় দিবসে মৃতের আত্মীয়-স্বজন কবর দেখিতে আসিয়া কোরাণের অংশবিশেষ পাঠ করে। যাহারা অবস্থাপন্ন, মৌলবী নিয়োগ করিয়া সমাধির নিকট সমগ্র কোরাণ পাঠ করায়।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রংনিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

হারামণির অন্বেষণ।

২

প্রশ্ন। বলিতেছিলাম যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই চাওয়া বাহির হইতে থাকে—পাওয়া হইয়া চুকিলেই চাওয়া বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া একত্রে বাস করিবে কেমন করিয়া—বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া?

উত্তর। এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের মালীকে ডাকিয়া আম্র চাহিলে। তুমি যদি ইহার পূর্ব্বে কোনোকালে আম্রের আস্বাদ না পাইতে, তাহা হইলে কখনই তুমি আম্র চাহিতে না। তবেই হইতেছে যে, চাওয়া বলিয়া যে একটি ব্যাপার, তাহা পাওয়া'রই রেস্ অর্থাৎ অনুতান বা লেজুড়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি যখন তোমার বাগানের মালঞ্চ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলে, আর, সেই সুযোগে আমি যখন দিব্য একটি ফুটন্ত গোলাপ-ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইলাম, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলে, "কর কি—কর কি! উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার মন বলিতেছে 'চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকো!' আর, তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে উহাকে বধ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিতেছ—তুমি দেখিতেছি জল্লাদের শিরোমণি!" ফুলের সৌন্দর্য্য সেই যে তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে, জ্ঞানের সেই উপলব্ধি-ক্রিয়ার নামই পাওয়া, আর, আমি ফুলের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই যে কাঁদিয়া উঠিল, প্রাণের সেই ক্রন্দনের নামই ফুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাওয়া। যে সময়ে তুমি ফুলটিকে তোমার চক্ষের সম্মুখে পাইয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতেছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্; একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছিল;—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ। তোমার দৃষ্টিতে তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ, আমার দৃষ্টিতে আমি সেখানে দেখি-

তেছি পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ বা জ্ঞানপ্রাণের সম্বন্ধ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জ্ঞান সব-চেয়ে ভালবাসে কাহাকে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান বলে—প্রাণতুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। তাহা যখন সে বলে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান প্রাণকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ আবার তেম্নি ভালবাসে জ্ঞানকে। জ্ঞান একমুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল হইলে প্রাণ দশদিক্ অন্ধকার দেখে। জ্ঞান ছাড়িয়া পলাইলে প্রাণের নাড়ি ছাড়িয়া যায়। ভালবাসা যদিচ বস্তু একই তথাপি জ্ঞানের এবং প্রাণের ভালবাসার মধ্যে একপ্রকার অভেদ-ঘ্যাঁসা প্রভেদ আছে, আর, সে যে প্রভেদ, তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে Polarity কিনা মিথুনীভাব। পুরুষ যে ভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান সেইভাবে প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে,প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, নবোদিত সূর্য্য যেভাবে পদ্মিনীর প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে প্রাণের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে; তার সাক্ষী—মনুষ্যাবতারের আদিমবয়সে পৃথিবীতে জ্ঞানের যখন সবেমাত্র অরুণোদয় দেখা দিয়াছিল, তখন জ্ঞানের কার্য্যই ছিল—প্রাণ কিসে ভাল থাকে, অহোরাত্র কেবল তাহারই পন্থায় ঘুরিয়া বেড়ানো। আবার, সুরভি নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মিনী যেভাবে নব বিভাকরের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে;—জ্ঞানকে পাইলেই প্রাণ তাহার নিকটে আপনার নিগূঢ় অন্তরের কথা খোলে—বিনা বাক্যে অবশ্য, কেন না, জ্ঞান শ্রোতা নহে—জ্ঞান দ্রষ্টা; জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর, সেইজন্য তাহার সাঙ্কেতিকচিহ্ন কর্ণাকৃতি (?) এইরূপ;—ফলে, জ্ঞানের চক্ষে আকার-ইঙ্গিতই বাক্যের চূড়ান্ত।* একই আম্রের অঙ্কুর যেমন আঁটির দলযুগলের জোড়ের মাঝখান হইতে দুই দিকের দুই ডাল হইয়া ছট্‌কিয়া বাহির হয়, একই ভালবাসা তেম্‌নি পুরুষপ্রকৃতির দাম্পত্যবন্ধনের মাঝখান হইতে দুইভাবের দুইতরো ভালবাসা হইয়া ছট্‌কিয়া বাহির হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা, আর, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা? যখন দেখিতেছি যে, স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে "তুমি আমার ভব-জলধি-রত্ন" বলিয়া অধিকার করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বামীর ভালবাসা অধিকার-প্রধান—স্বামিত্ব প্রধান—পাওয়া-প্রধান; পক্ষান্তরে, যখন দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় "আমি তোমারই" বলিয়া একান্ত অধীনা-ভাবে স্বামীর আশ্রয় যাচ্ঞা করে, তখন তাহাতেই বুঝতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর ভালবাসা অধীনতা-প্রধান—চাওয়া-প্রধান, আর, চাওয়া মুখ খুলিতে পারে না বলিয়া লজ্জা-প্রধান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, পাওয়া বা অধিক্রিয়া বা উপলব্ধিক্রিয়া জ্ঞানের যেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, চাওয়া বা অভাব-জ্ঞাপন বা ক্রন্দন প্রাণের তেম্‌নি স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যেরূপ চাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা প্রাণঘ্যাঁসা-

* স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু।
কালিদাস—মেঘদূত।

মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে প্রাণের ভালবাসা; আর, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেরূপ পাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে জ্ঞানের ভালবাসা। স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক-প্রকার জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা; রাধাকে তাই কবিরা বলেন "উন্মাদিনী রাধা"। পক্ষান্তরে, পুরুষের জ্ঞানের ভালবাসা এক-প্রকার রত্নচেনা চোকালো ভালবাসা; কৃষ্ণকে তাই কবিরা বলেন "চতুরচূড়ামণি"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "কৃষ্ণকে ভালবাসি জানি না সই আমি কিজন্য" এইরূপ জ্ঞান-শূন্য অহেতুক ভালবাসা বড়, না "রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেমমাধুরী, তাই আমি রাধার চরণ-কিঙ্কর" এইরূপ চোকালো-ধাঁচার সহেতুক ভালবাসা বড়? ইহার উত্তর এই যে, রাধার অহেতুক ভালবাসা প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক ভালবাসা জ্ঞানাংশে বড়। হারজিতের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত।
আপন মুলুকে সবার'ই জিত।

ফলকথা এই যে, কৃষ্ণরাধিকার যুগবাঁধা প্রেম এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্; দুয়েরেই মর্য্যাদা নিক্তির ওজনে সমান? যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া চখাচখীর ন্যায় সখাসখী। ভিতরের কথাটি তবে তোমাকে ভাঙিয়া বলি—

প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌঁছিবার মাঝপথে একটি সন্ধিস্থান আছে, সেইটিই ভালবাসা'র জন্মস্থান। সে স্থানটি হ'চ্চে মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মন পদার্থটা কি? গঙ্গা-জলই যেমন গঙ্গার সারসর্ব্বস্ব, তেম্নি, মানস বলিয়া যে-একটি মনোবৃত্তি আছে, তাহাই মনের সারসর্ব্বস্ব! মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন একই। তার সাক্ষী—"মন নাই" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা নাই, "মনে ধরে না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছার সঙ্গে মেলে না, "মন যায় না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীর ভূগোল তোমার নখাগ্রে, তাহা আমি জানি; তোমার জানিতে কেবল বাকি মনের ভূগোল; জানা কিন্তু উচিত—বিশেষত তোমার মতো পণ্ডিত-লোকের। অতএব প্রণিধান কর—

মন হ'চ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা-সরোবর, আর, তা'র দুই কূল হ'চ্চে জ্ঞান এবং প্রাণ। মনের যে-জায়গাটি জ্ঞানের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই জ্ঞান-ঘ্যাঁসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা; আর, মনের যে-জায়গাটি প্রাণের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণঘ্যাঁসা কিনারাটি অভাবাত্মক বা অধীনতা-প্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা। মুখে সব কথা খোলোসা করিয়া বলিতে গেলে বড্ড বেশী বকিতে হয়, অথচ, বক্তা'র কেবল বকুনিই সার হয়—শুনিবেন যাঁহারা, তাঁহারা ঘড়ি-ঘড়ি স্বস্ব গৃহের দিকে মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতে কাজ নাই। মানস-সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের (একপ্রকার হাতচিটে'র) জোগাড় করিয়াছি, তাহা দেখিলেই সরোবরটি'র কূল-কিনারা'র ঠাহর পাইতে তোমার এক-মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না; অতএব দেখ—

ও-কূল—জ্ঞান

ও-পারের কিনারা—ঈশনা বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

মানস-সরোবর বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা বা মন

এ-পারের কিনারা—বাসনা বা চাওয়া-প্রধান

ইচ্ছা

এ-কূল—প্রাণ

মানচিত্রে এ যাহা দেখিলে, তাহা যদি বাস্তবিক-মানস-সরোবরের সহিত হাতে-কলমে মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলো তোমাকে সরোবরটির এ-পার হইতে পাড়ি দিয়া ও-পারে লইয়া যাই, তাহা হইলেই তোমার ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

একটু পূর্ব্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলে, তখন তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের মতো বাঁধানিয়মে চলিতেছিল, ইহাতে আর ভুল নাই। ঘড়ি'র কল'কে তো চালায় জানি ঘড়ি'র স্প্রিঙ্‌—তোমার নিদ্রাবস্থায় তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছিল কে? তোমার প্রাণ অবশ্য। তুমি তো নিদ্রায় অচেতন, আর, আমি সেই সময়ে তোমার শয়নঘরের এককোণে চেয়ারে হ্যালান্ দিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক ডাকিয়া উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে—ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এম্‌নি সহসা যে, আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম, আর, সেই মুহূর্ত্তে যে-ছোটো-ছেলেটি তোমার পার্শ্বে শুইয়াছিল, তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে বিছানায় উঠিয়া-বসিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে তোমার শব্দায়মান নাসিকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তুমি তো সামান্য ডাক্তার নহ, তুমি মহামহোপাধ্যায় এম্‌-ডি; বলি তাই—সেই বছর-সাতেকের ছেলেটি তোমারই তো ছেলে! অ্যালোপাথিক্ ডাক্তারিবিদ্যায় সে পেট-থেকে-পড়িয়াই পণ্ডিত। সে ভাবিল যে, "বাবার নাকের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহির হইতে চাহিতেছে—কিছুতেই আমি তাহা হইতে দিব না"; এইরূপ ভাবিয়া ছেলেটি তোমার নাক টিপিয়া ধরিল যতদূর তাহার সাধ্য শক্ত করিয়া। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর—

প্রথমে নিদ্রার ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় তোমার দুঃস্বপ্নপীড়িত অর্দ্ধস্ফুট মনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথের বাধা সরাইয়া ফেলিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর, সে যে ইচ্ছা, তাহা নিতান্ত অবলা ইচ্ছা—চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাঁসা ইচ্ছা—বাসনা-মাত্র। তাহার পরে তুমি ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া ছেলেটির হাতের কামড়্ হইতে তোমার নাসিকা ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে; এবার'কার এ ইচ্ছা প্রভাবাত্মক সবলা ইচ্ছা—পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘ্যাঁসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশনা। যেই তোমার মনে জাগ্রত জ্ঞানের উদয় হইল, সেই-অম্নি ঈশনার পরাক্রমের চোটে ছেলেটির হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ তুমি তোমার বিপন্ন নাসাগ্র টানিয়া-লইয়া ছেলে-বেচারিটিকে এক-ধমকে কাঁদাইয়া ফেলিলে। মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে—প্রাণ হইতে জ্ঞানে—উত্তীর্ণ হইবার পথের ঠিক্-ঠিকানা এই তো তুমি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া সুনির্দ্ধাত জানিতে পারিলে। পথ-অতিবাহনের ক্রম-পদ্ধতির বিবরণ এ যাহা তুমি জানিতে পারিলে, তাহা সংক্ষেপে এই—

স্থূল ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন

(৩) জ্ঞান

সবিশেষ ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন { (১॥০) প্রাণঘ্যাঁসা মন—বাসনা
(৩॥০) জ্ঞানঘ্যাঁসা মন—ঈশনা

(৩) জ্ঞান

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মানচিত্রখানিতে ক্রমপদ্ধতির অঙ্কচিহ্ন ছিল না। মানস-সরোবরের অমন একখানি সুন্দর নখদর্পণে অসম্পূর্ণতা-দোষ থাকিতে দেওয়া উচিত হয় কি? কোনোক্রমেই না; অতএব দেখ—

মানস-সরোবরের মানচিত্রের
দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৩) ও-কূল—জ্ঞান

(৩৷৷) পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘ্যাঁসা মন—ঈশনা

(২) মানস-সরোবর—মন

(১৷৷০) চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাঁসা মন—বাসনা

(১) এ-কূল—প্রাণ

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল মানস-সরোবরের কূলকিনারা'র সন্ধান, এক্ষণে পাওয়া হইল মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে পৌঁছিবার ক্রমপদ্ধতির সন্ধান। আর-দুইটি বিষয়ের সন্ধান পাইতে এখনো বাকি; সে দুইটি বিষয় হ'চ্চে—(১) ত্রিগুণ-রহস্য বা ব্যক্তাব্যক্ত-রহস্য এবং (২) দ্বন্দ্ব-রহস্য বা চাওয়া-পাওয়া'র বিচ্ছেদমিলনের ব্যাপ্যার। এ দুইটি রহস্য-ভাণ্ডারের কপাট-উদ্ঘাটন আগামী মাসে হাতে লওয়া যাইবে।

—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

শিল্পকলার ভেদনির্ণয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শিল্পকলার লক্ষণ, উদ্দেশ্য ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নহে, প্রকৃতি ও প্রতিভার সাহায্যে মানব-চিত্ত যে আদর্শ-সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, সেই সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা। আদর্শ-সৌন্দর্য্য অসীমকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। যাহাতে প্রাকৃতিক সৃষ্টির ন্যায় মানব-রচনার মধ্যেও—বরং আরো বেশীমাত্রায়—অসীমের মোহন সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় তাহাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করিয়া—কোন্ মায়া-মন্ত্রের দ্বারা, অসীমকে সসীম হইতে বাহির করা যাইতে পারে? ইহাই শিল্পকলার বাধা এবং ইহাই শিল্পকলার গৌরব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কি আছে যাহা আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে পারে? ঐ সৌন্দর্য্যের যেটি মানসিক দিক্ সেই মানসিক আদর্শ-সৌন্দর্য্যই আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যের এই মানস-আদর্শই আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমে উন্নীত করে। অতএব, স্বকীয় মানস আদর্শকে বাহিরে প্রকাশ করার দিকেই যেন কলাগুণীর নিয়ত চেষ্টা হয়। মানস-আদর্শই কলাগুণীর সর্ব্বস্ব। কলাগুণী আর যাহাই করুন,—তাঁহার রচনার বিষয়ের মধ্যে যে মানস-আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তিনি সেই মানস-আদর্শটিকে প্রথমে ধরিবার চেষ্টা করিবেন; কেননা, তাঁহার বিষয়ের মধ্যে একটি মানস-আদর্শ অবশ্যই আছে। আদর্শটি একবার ধরিতে পারিলে তাহার পর কিসে এই আদর্শটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়—মানব-চিত্তের গ্রাহ্য হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহার মানস-আদর্শকে বাহিরে প্রকটিত করিবার জন্য তিনি অবস্থানুসারে, প্রস্তর, বর্ণ, ধ্বনি, কিংবা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে, মানস-আদর্শকে ও অসীমকে কোন-না-কোন প্রকারে প্রকাশ করা—

ইহাই শিল্পকলার নিয়ম; শিল্প-রচনার যেটি প্রধান গুণ সেই ভাবব্যঞ্জকতার সাহায্যেই মানবচিত্তে সুন্দর ও অসীমের ভাব উদ্বোধিত হয়; এবং সুন্দর ও অসীম—এই দুই ভাবের সংস্রবেই শিল্পকলা শিল্প-কলা নামের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই ভাবব্যঞ্জকতা-গুণটি আসলে মানস-আদর্শ-ঘটিত। যাহা চক্ষু দর্শন করে ও হস্ত স্পর্শ করে, তাহা ছাড়া এই ভাবব্যঞ্জকতা এমন একটা জিনিস অন্তরে অনুভব করাইবার জন্য প্রয়াস পায় যাহা অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য।

শরীরের পথ দিয়া কিরূপে মন পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়—ইহাই শিল্পকলার সমস্যা। বহিরিন্দ্রিয়ের অন্তরালে যে অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সেই অন্তঃকরণে, সৌন্দর্য্যের স্বরপনেয় ভাবরসটিকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই শিল্পকলা বহিরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে,—আকৃতি, বর্ণ, ধ্বনি, বাক্য প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করে।

বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত যেরূপ আকৃতির সংস্রব, অন্তঃকরণের সহিত সেইরূপ ভাবের সংস্রব। ভিতরকার ভাব প্রকাশের পক্ষে আকার যেরূপ একমাত্র অমোঘ উপায়, সেইরূপ, আকারই আবার ভাব-প্রকাশের অন্তরায়। কলাগুণী, আকারের উপর সমস্ত রচনা-চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া, স্বকীয় ধৈর্য্য ও প্রতিভার বলে, ঐ অন্তরায়কেই উপায়ে পরিণত করেন।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকল শিল্পকলাই একরূপ। যতক্ষণ কোন শিল্প-কলা অদৃশ্যকে প্রকাশ না করে ততক্ষণ সে শিল্পকলাই নহে। একথা বারংবার আবৃত্তি করিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ভাবব্যঞ্জকতাই শিল্পকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম। যাহা প্রকাশ করিতে হইবে তাহা একই জিনিস; —উহাই ভিতরকার ভাব, উহাই মন, উহাই আত্মা; উহা অদৃশ্য, উহা অসীম। প্রকাশ করিবার জিনিসটি এক হইলেও, যাহার নিকট উহাকে প্রকাশ করিতে হইবে সেই ইন্দ্রিয় গুলি বিভিন্ন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতাপ্রযুক্তই শিল্পকলা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে:—মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয়—রস গন্ধ ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়—ইহারা আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যরস উৎপাদন করিতে অসমর্থ। অন্য দুই ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া উহারা সৌন্দর্য্যরস উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু উহারা স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা কিছু মুখরোচক,রসনা শুধু তাহারই বিচার করিতে সমর্থ, কিন্তু সুন্দরের বিচার করিতে রসনা সমর্থ নহে। যে ইন্দ্রিয় শরীরের সেবায় অতিমাত্র নিযুক্ত, আত্মার সহিত তাহার যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। উদরই রসনার প্রধান মনিব। রসনা উহারই তুষ্টি সাধনে—উহারই সেবায় নিয়ত নিযুক্ত। কখন কখন মনে হয় যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যরস গ্রহণে সমর্থ; তাহার কারণ, যে পদার্থ হইতে সৌরভ নিঃসৃত হয়, সে পদার্থটি হয় ত নিজেই সুন্দর এবং অন্য কারণে সুন্দর। সুন্দর গঠন ও উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্রের দরুণই গোলাপ ফুল সুন্দর। উহার গন্ধ সুখদ কিন্তু সুন্দর নহে। দৃষ্টির সাহায্য ব্যতীত স্পর্শ একাকী আকার-সৌষ্ঠবের বিচার করিতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবশিষ্ট দুই ইন্দ্রিয়ই আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যভাব উদ্দীপনে সমর্থ। এই দুই ইন্দ্রিয়ই যেন বিশেষরূপে আত্মার সেবায় নিযুক্ত। এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতে এমন

কিছু জিনিস আমরা প্রাপ্ত হই যাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ—অপেক্ষাকৃত মানসিক। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই দুই ইন্দ্রিয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। আমাদের ভরণপোষণের সাহায্য করা অপেক্ষা আমাদের জীবনের শোভাসম্পাদনেই উহারা অধিক সাহায্য করিয়া থাকে। উহারা আমাদিগকে যে প্রকার সুখ বিধান করে, শরীরের সহিত তাহার ততটা সংস্রব নাই। এই দুই ইন্দ্রিয়েরই সহিত শিল্পকলার যোগ নিবদ্ধ করা বিধেয়; এবং শিল্পকলা কার্য্যতঃ তাহাই করিয়া থাকে; এই দুই ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়াই শিল্পকলা মানব-চিত্তে প্রবেশ লাভ করে। এইজন্যই শিল্পকলা দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিল্পকলা ও দর্শনেন্দ্রিয়ের শিল্পকলা; একদিকে সঙ্গীত ও কবিতা; অপর দিকে, চিত্র-কলা, ভাস্কর-কলা, বাস্তু-কলা, উদ্যান-কলা।

আমরা শিল্পকলার মধ্যে বাগ্মিতা, ইতিহাস, ও দর্শনকে ধরিলাম না বলিয়া হয়ত কেহ কেহ বিস্মিত হইবেন।

শিল্পকলা ললিতকলা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না, দর্শক কিংবা শিল্পীর সাংসারিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব উৎপাদন করাই শিল্পকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাকে স্বাধীন শিল্পও বলে। কেন না, ইহা স্বাধীন লোকের শিল্প, দাসের শিল্প নহে। এই শিল্পকলা আত্মার মুক্তিসাধন করে, জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে, মহৎ করিয়া তোলে। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে স্বাধীন শিল্প বলিত। এমনও কতকগুলি শিল্প আছে যাহার মহত্ত্ব নাই, আর্থিক প্রয়োজন—সাংসারিক প্রয়োজনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ শিল্পকে ব্যবসায়-শিল্প বলা যায়। যেমন কুমোরের শিল্প, কামারের শিল্প। উহাতে প্রকৃত শিল্পকলা সংযোজিত হইতে পারে, শিল্পকলার দ্বারা উহার চাকচিক্য সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল একটা আনুষঙ্গিক কার্য্য।

বাগ্মিতা, ইতিহাস দর্শন—অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন; উহাদের যে গৌরব, উহাদের যে শ্রেষ্ঠতা, সে গৌরব ও শ্রেষ্ঠতাকে আর কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু খুব ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, উহারা শিল্পকলা নহে।

শ্রোতৃবর্গের অন্তরে নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব সঞ্চারিত করা বাগ্মিতার উদ্দেশ্য নহে। যদি কখন উহার দ্বারা কার্য্যত ঐ ফল উৎপন্ন হয়,—সে উহার স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টায় নহে। কোন বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা, কোন বিষয়ে প্ররোচনা করা—ইহাই বাগ্মিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বকীয় মক্কেলকে রক্ষা করা কিংবা তাহার জয়লাভে সাহায্য করাই বাগ্মিতার কাজ; সে মক্কেল যেই হউক—হউক সে মনুষ্য, হউক সে কোন মতামত, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাগ্যবান সেই বাগ্মী যে লোকের মুখ হইতে এই কথা বাহির করিতে পারে—"উঁহার বক্তৃতাটি বড়ই সুন্দর!" ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু হতভাগ্য সেই বাগ্মী যে উহা ভিন্ন আর কিছুই লোকের মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না; কেননা, কেবল সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া গেলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ডেমসথিনিস্ রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতার ও বসুয়ে ধর্ম্মবিষয়ক বাগ্মিতার মহৎ আদর্শ; ইঁহাদের প্রতি দেশরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার যে পবিত্র ভার

অর্পিত হইয়াছিল, কিসে সেই কর্ত্তব্য-ভার তাঁহারা সম্যকরূপে পালন করিবেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল ; পক্ষান্তরে, ফিডিয়াস ও র‍্যাফেল কেবল সুন্দর বস্তুর উৎপাদনেই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিক বাগ্মিতা—এই উভয়ের মধ্যে বহুল প্রভেদ। প্রকৃত বাগ্মিতা কার্য্যসিদ্ধির কতক গুলি উপায়কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অবশ্য লোকরঞ্জনে তাহার আপত্তি নাই—কিন্তু এমন কোন উপায়ে নহে যাহা তাহার অযোগ্য। যাহা তাহার অধিকার-বহির্ভূত—এরূপ অলঙ্কার প্রয়োগে তাহার অবনতি হয়। প্রকৃত বাগ্মিতার আসল লক্ষণ—সরলতা, গাম্ভীর্য্য ; যাহা শুধু গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করে, গাম্ভীর্য্যের ভাণ করে, সেরূপ গাম্ভীর্য্যের কথা আমি বলিতেছি না ;—সেত সর্ব্বপ্রকার প্রতারণার মধ্যে অধম প্রতারণা। যাহা অকপট হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, সেই গাম্ভীর্য্যের কথাই আমি বলিতেছি। সক্রেটিস প্রভৃতি বাগ্মিতাকে এই ভাবেই বুঝিতেন।

বাগ্মিতার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। দর্শনকার বলেন ও লেখেন। দার্শনিকও কি বাগ্মীর ন্যায় নানা রং ফলাইয়া মর্ম্মস্পর্শী জ্বলন্ত ভাষায় এমন করিয়া সত্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যাহাতে তাঁহার প্রতিপাদিত সত্য মানব-চিত্তে সহজে প্রবেশ লাভ করে? যে সকল উপায়ে তাঁহার কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে সেই সকল উপায় যদি তিনি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তিনি আপনিই আপনার কাজের হন্তারক হয়েন। এই স্থলে, কলানৈপুণ্য একটা উপায় মাত্র, দর্শনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, দর্শন—শিল্পকলা নহে। অবশ্য প্লেটো একজন কলাগুণী ছিলেন ; প্যাস্‌কাল যেমন কোন-কোন স্থলে ডেমসথিনিস ও বসুয়েের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেইরূপ প্লেটো ও সোফোক্লিস্‌ও ফিডিয়াসের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু আসলে উভয়ই সত্য ও ধর্ম্মের ঐকান্তিক সেবক।

বর্ণনা করিবার জন্যই বর্ণনা করা কিংবা চিত্র করিবার জন্যই চিত্রকরা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে।

ইতিহাস এই জন্যই অতীতের বর্ণনা করে, অতীতের চিত্র অঙ্কিত করে যে তাহার দ্বারা ভাবীবংশের লোক জীবন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতীত যুগের প্রধান প্রধান ঘটনার অবিকল চিত্র প্রদর্শন করিয়া, মানব ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি, যে সমস্ত গুণ, যে সমস্ত অপরাধ জড়িত রহিয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া নব্যবংশীয়দিগকে উপদেশ দেওয়াই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। দূরদৃষ্টি ও সাহস সম্বন্ধে ইতিহাস শিক্ষা দেয়। যে সকল মত গভীর চিন্তা হইতে প্রসূত হইয়া নিয়ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে,—দৃঢ়ভাবে ও সংযত ভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, ইতিহাস সেই সকল মতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। অসংযত অতিমাত্র উদ্যমের নিষ্ফলতা, জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রচণ্ড শক্তি, বাতুলতা ও বদমাইসির অক্ষমতা—এই সমস্ত ইতিহাস জ্বলন্তভাবে প্রদর্শন করে।

থুসিডিডিস, পলিবস ও ট্যাসিটস প্রভৃতি ইতিহাস-লেখক শুধু আমাদের অলস কৌতূহল ও বিকৃত কল্পনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন,—তা ছাড়াও তাঁহাদের আর কিছু করিবার আছে। অবশ্য লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক নহেন ; কিন্তু শিক্ষাদানই তাঁহা-

দের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহারা রাষ্ট্রপরিচালকদিগের উপদেষ্টা ও মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু।

সুন্দর বস্তুই শিল্পকলার একমাত্র বিষয়। তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই, শিল্পকলা আত্মবিনাশ সাধন করে। অনেক সময় বাধ্য হইয়া শিল্পকলাকে বাহ্য অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহার মধ্যেও সে একটু স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। বাস্তু শিল্প ও উদ্যান-শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বাধীন; উহারা কতকগুলি অনিবার্য্য বাধার অধীন। যেরূপ কবি, ছন্দ ও পদ্যের দাসত্বকেই অভাবনীয় একটি সৌন্দর্য্যের উৎসে পরিণত করেন, সেইরূপ বাস্তুশিল্পীও কতকগুলি অপরিহার্য্য বাধা সত্ত্বেও স্বকীয় প্রতিভা বলে তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। শৃঙ্খলের অতিমাত্র ভারে শিল্পকলা যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অতিমাত্র স্বাধীনতাতেও শিল্পকলা খামখেয়ালি ভাব ধারণ করিয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়। সুখসুবিধার বেশী খাতির রাখিতে গেলে—তাহার অধীন হইয়া চলিতে গেলে—স্থাপত্যকলাকে বধ করা হয়। কোন বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে, বাস্তুশিল্পী অনেক সময়ে তাঁহার ইমারতের সাধারণ গঠন-কল্পনার সৌষ্ঠব ও সুপরিমাণ রক্ষা করিতে পারেন না। তখন বাহ্য অলঙ্কারের খুটিনাটিতেই তাঁহার সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবসিত হয়; তিনি শুধু ইমারতের অপ্রয়োজনীয় অংশেই তাঁহার গুণপনা দেখাইবার অবসর পান। ভাস্কর্য়কলা ও চিত্র-কলা, বিশেষতঃ সঙ্গীত ও কবিতা—ইহারা বাস্তুকলা ও উদ্যানকলা অপেক্ষা স্বাধীন। উহাদিগকেও শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করা উহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। (ক্রমশঃ)

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

গৃহে ব্রহ্ম-পূজা।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যে অপৌত্তলিক উপাসনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সে বড় কঠিন ব্রত। কেবল নিজে অশরীরী ঈশ্বরের উপাসক হইলে চলিবে না, গৃহে গৃহে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের কার্য্য। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই কঠিন। উপদেবতার আসনে অমূর্ত্ত ঈশ্বরকে স্থাপনা এবং জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে তাঁহার আরাধনা, এ বড় কঠিন সমস্যা। আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিতে হইবে, প্রীতিকে জাগ্রত ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই ধ্যানবলে ঈশ্বরের সেই অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। তবে কি বনে গিয়া একাকী ধ্যান করিতে হইবে? তাহা নহে। এ সাধনার জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। কোন কোন ধর্ম্মের আদর্শ জীবন-সন্ন্যাস; যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে ঋষিগণও বনে গিয়া তপস্যা করিতেন; কিন্তু গৃহাশ্রমেই আমাদের বাস, আমাদের গৃহই তপোবন। "গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ" গৃহে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সংযমের নামই তপস্যা। সন্ন্যাস অবলম্বন না করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া, পরিবারের মধ্যে অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নববিধান। সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মসাধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সংসারে থাকিয়া বিবিধ বিঘ্ন-বিপত্তি-প্রলোভনের মধ্যে ধর্ম্মসাধন করা সুকঠিন। শুধু যদি আমি ঠিক পথে চলি, তাহা হইলে হইবে না,

আর সকলকে ঠিক পথে রাখিতে হইবে, নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া সাধুভাবে ও পবিত্রভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং আপনার পবিত্র জীবনের আদর্শ সকলের সমক্ষে ধারণ করিতে হইবে, তবেই পৌত্তলিক সমাজে দৃঢ়রূপে এবং স্থায়ীভাবে অনন্ত-দেবের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইব।

আমাদের দুইগতি; এক কেন্দ্রাভিমুখী, অপর কেন্দ্র-বহির্মুখী। গ্রহ যেমন কেন্দ্রাভিমুখী গতিতে আপনার চারিদিকে ঘুরে এবং কেন্দ্রাতিগ গতিতে স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করে, আমাদের গতিও সেইরূপ। একদিক দিয়া আত্মোন্নতি সাধন করা, অপর দিকে পরসেবা—স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া। আমরা যদি কেবল আত্মসুখের পথ অনুসরণ করি, তাহা হইলে গম্যস্থানে কিছুতেই পৌঁছিতে পারিব না। বিপরীত ফল উৎপন্ন হইবে—সুখ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় পলায়ন করিবে। প্রকৃত সুখ যদি চাও, শ্রেয়ঃ পথের পথিক হও—কর্ত্তব্য-সাধনের পথ অবলম্বন কর। বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—আত্মসুখ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না; তাঁহাদের বৈরাগ্যের কারণ পর-দুঃখ-নিবারণ। আত্মোন্নতি পরসেবার সঙ্গে জড়িত, ইহা যেন আমরা কিছুতেই বিস্মৃত না হই। আত্মসুখ লক্ষ্য করিলে আত্মোন্নতি হয় না। পরের জন্য আত্মত্যাগই—আত্মোন্নতির সোপান। কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাক, ক্রমেই আত্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে; এবং সেই আত্মশক্তিকে লোকের মধ্যে—সমাজের মধ্যে সাধু কর্ম্মের উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে হইবে। আপনি ভাল হওয়া ও অন্যকে ভাল করা সংক্ষেপতঃ ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। গৃহে থাকিয়া পিতা মাতাকে সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করিতে হইবে, স্বজন-বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের চারিদিকে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ-শোক পাপ-তাপ রহিয়াছে। তৎসমস্ত প্রশমন করিবার চেষ্টা কর। রোগীর সেবা, বিপন্নকে উদ্ধার, অনাথ আতুরকে আশ্রয় দান, অন্যায় অত্যাচার হইতে নির্দ্দোষির সংরক্ষণ, সংসারে থাকিয়া এই ভাবে কর্ত্তব্য সাধন কর; তবেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। দুর্ব্বলতা আমাদের পদে পদে। বিপদ ও প্রলোভন চারিদিকে। এমন অনেক অবস্থা আছে, এমন অনেক শোকের কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন মানুষে সান্ত্বনা দিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্রে আমরা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া নিয়তই ঘুরিতেছি। "অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র, অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার, অদ্য অভিনব-বিকশিত-পুষ্পতুল্য লাবণ্যযুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ;" অদ্য রূপবতী গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহিত প্রেমালাপ, কল্য তাহার মৃতদেহোপরি অশ্রু-বিসর্জ্জন, আজ স্বামীর মৃত্যু, কল্য হয়ত বিধবার নয়নের মণি হৃদয়ের আনন্দ একটিমাত্র পুত্রের বিয়োগ! এই সকল স্থলে শান্তি কোথায়? কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র শান্তিদাতা। যখন আর সকলে চলিয়া যায়, তিনিই আমাদের চির-আশ্রয় বিরাজিত থাকেন। সেই যে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা তাঁহাকে প্রীতি কর। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন করেন, তাঁহার সে প্রিয় কখনও মরণশীল হন

না। পৃথিবীর প্রিয়বস্তু সকলই চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি আমরা প্রিয় করিয়া লইতে পারি, তবে সেই প্রিয়বস্তুর আর বিনাশ কোথায়!

যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারেন ও সেই প্রীতির উদ্দেশে মনুষ্যের হিতকর্ম্ম সাধন করিতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবান্। ঈশ্বরকে প্রীতি এবং তাঁর প্রিয় কার্য্য-সাধন, ইহাই সকল ধর্ম্মের সার কথা। ধর্ম্ম কেবলমাত্র ঔষধ নহে—কিন্তু উহা আমাদের নিত্য-আহার। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীবনে মরণে ধর্ম্মের সহিত আমাদের নিত্যযোগ। আমাদের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ এই যে "যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" এখানে যে কিছু কর্ম্ম করিবে, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবে। তাহা যদি করিতে পার, তোমার জীবনে মরণে ভয় নাই। তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে যদি মৃত্যু আইসে, তাহাতে কি? আমরা যেখানে যাইব, সেই মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাঁহার উপর নির্ভর কর, তাঁহার জন্য জীবন দিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে গিয়া যদি দেহ অবসান হয়, তবে সে মৃত্যু তাঁহারই অমৃত ক্রোড়ে আমাদিগকে লইয়া যায়। "মৃত্যু সে অমৃত সোপান"।

অতএব সকলে সাধুকর্ম্মে উৎসাহী হও। "ব্রহ্মাভয়ং" অভয়দাতা ঈশ্বর তোমার সম্মুখে, তিনি তোমার অন্তরে। জ্ঞানে প্রেমে পবিত্রতায় আপনাকে উন্নত করিয়া পরোপকারে—স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ কর, ঈশ্বরের সমক্ষে নির্ভীক-চিত্তে জীবন যাপন কর, তবেই তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকের উপর নিপতিত হইবে। তোমার জীবন ধন্য হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ।

খৃষ্টধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম হইলেও তাহার ভিতরে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা বাহ্যিক প্রমাণ-সাপেক্ষ। খৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, তাঁহার সশরীরে পুনরুত্থান প্রভৃতি বহুতর বিষয় বিশ্বাস করিতে হয়, অথচ ঐ সকল ব্যাপার বাহ্য-প্রমাণে দাঁড়াইতে পারে না, অন্তরাত্মা হইতেও সায় পায় না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে যাহা আছে, দেখ তাহা কেমন সহজ, কেমন উদার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া যে ঐ কয়েকটি বীজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে সুস্পষ্ট বিবৃত আছে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে কি পাইয়াছি? এই যে, এক অনন্ত ঈশ্বর এবং অপৌত্তলিকভাবে তাঁহার উপাসনা। ঈশ্বরের উপাসনা কি—তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন করা। এই যাহা আভাস দেওয়া গেল, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় হইতে পারে। ভক্তি-প্রধান ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্ম, জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্ম—উপনিষদ্, গীতোপদিষ্ট কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম এই তিনই ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইতেছে। আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্রিবেণীসঙ্গম। ইহাতে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের সাধারণ ঐক্যস্থল। ব্রহ্মপ্রীতি এক দিকে, কর্ত্তব্য আর এক দিকে; এই উভয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে। ধর্ম্মকে যদি দেহ রূপে কল্পনা করা যায়, তাহার অস্থি হইতেছে

কর্ত্তব্য নিষ্ঠা; এবং রক্তমাংস ও জীবনী-শক্তি হইতেছে—প্রীতি। এই দুয়েরই মিল—জীবনে। ব্রহ্ম আমাদের আরাধ্য দেবতা। মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে আমরা ব্রহ্মপূজা পাইয়াছি। অচেতন দেব-প্রতিমায় চক্ষুকর্ণ চিত্রিত আছে; কিন্তু সে দেখে না, শোনে না। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি, তিনি জাগ্রত-জীবন্ত দেবতা। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি জগতের স্রষ্টা, তিনি ওতপ্রোতভাবে সকলেতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই যে বিধাতা পুরুষ, তাঁহার 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী'; তাঁহার কর্ম্মের বিরাম নাই, তিনি নিদ্রিত নহেন, তিনি জাগ্রত। তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তে কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে বিশ্বসংসার ছারখার হইয়া যায়। তাই গীতা বলিতেছেন

> নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।
> যদি হ্যহং নবর্ত্তেযং জাতু কর্ম্মণ্যতন্ত্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং
> সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।
>
> ৩য় অধ্যায়।

ত্রিলোকে কি দেখ পার্থ কর্ত্তব্য আমার।
কি আছে পাইনি যাহা, আছে কি পাবার?
তবু যদি তন্দ্রাহীন কর্ম্ম নাহি করি,
লোকে যায় অধঃপাতে সেই পথ ধরি।
আমি না করিলে কর্ম্ম সবে কর্ম্ম ছাড়ে
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ হয় এ সংসারে।
বরণসঙ্করে হয় ভ্রষ্ট প্রজাকুল,
কর্ম্মেতে ঔদাস্য যত অনর্থের মূল।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত, "স এবাদ্য সউশ্বঃ" তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন। যখন কিছুই ছিল না, তিনি ছিলেন; যদি সকলি যায়, তিনি থাকিবেন। মৃত্যুর অধিকার তাঁহাতে নাই। তিনি চির-সহায়, তিনি চিরকালের উপজীবিকা।

তাঁহাকে সাধন দ্বারা জানিতে চেষ্টা কর, ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস কর, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাঁহার বাণী শ্রবণ কর, তাঁহার আদেশ পালন কর। শ্রবণ কর, তিনি বলিতেছেন "ভয় নাই ভয় নাই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।" বিপদে ধৈর্য্য শিক্ষা কর। ভয় বিপদে শোক-তাপে তিনি আমাদের সহায়। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আস্থাবান্ হও। তিনি যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন। যদি আমাদের প্রাণ যায়, তথাপি আমরা তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস হারাইব না। তাঁহাকে পাইয়া আমরা অমৃতের অধিকারী হইয়াছি। তিনি আমাদের দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিন। তিনি সত্যের আলোক প্রকাশ করুন, তাঁহার সেই আলোকে গন্তব্য পথ সম্মুখে প্রসারিত দেখিয়া যেন আমরা ক্রমিকই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, তিনি এইরূপ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সেখ সাদি।

তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক, যিনি আপনার ত্রুটি অনুভব করিয়া ঈশ্বরের দ্বারে নিয়তকাল ক্ষমা ভিক্ষা করেন। হায়! আমাদের এমন কি আছে, যাহা ভরসা করিয়া ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিতে পারি।

তাঁহার করুণার অজস্রধারে আমরা অভিষিক্ত। বিশ্বব্যাপী প্রাচুর্য্য তিনি সকলেরই সম্মুখে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন! মেঘ-বায়ু চন্দ্র-সূর্য্য সকলে তাঁহার আজ্ঞা বহন করিতেছে। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ। আহার-পান লাভ করিয়া কেবল তুমিই কি তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিবে?

তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের দুর্গ কেন বিকম্পিত হইবে, মানব! তুমি যদি তাহার স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াও।

যদি কেহ আমাকে ঈশ্বরের গুণ ব্যাখ্যা করিতে বলে, আমি নীরব হইয়া পড়ি। আমি অন্বেষণ করি, তাঁহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না।

প্রতি নিঃশ্বাসে জীবন ক্ষয় হইতেছে, অল্পই আর অবশিষ্ট আছে। জীবনের ৫০ বৎসর অতিবাহিত হইল, এখনও সুখ স্বপ্ন দেখিতেছ? কার্য্য শেষ করিতে পারিলে না? ধিক্ তোমাতে!

বিদায়ের ঘণ্টা বাজিতেছে, এখনও যাত্রার সম্বল (baggage) ঠিক করিয়া লইতে পারিলে না? প্রাভাতিক তন্দ্রায় এখনও বিভোর। হায়! কখন্ যাত্রায় বাহির হইবে।

রূপ-যৌবনে বিভোর হইও না। সকলেই চলিয়া যাইবে। তিনিই ধন্য, যিনি এখানে থাকিয়াই ধর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিতে পারিলেন।

ভাবী-জীবনের সম্ভোগ-সামগ্রী অগ্রেই পাঠাইয়া দিও, যে, পরলোকে গিয়া উপভোগ করিতে পাইবে।

মনুষ্য-জীবন বরফের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাহার উপর সূর্য্য খর-কিরণ ঢালিতেছে। গর্ব্ব অহঙ্কার সকলই মিলাইয়া যাইবে। এ জীবনত তোমার সর্ব্বস্ব নয়।

হায়! শূন্য-হস্তে তুমি বাজারে যাইতেছ! মাথার টুপি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

জিহ্বাকে সংযত করিতে পারিতেছ না! যাহারা জিহ্বাহীন (বোবা), তাহারা তোমা অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ নহে?

বাক্‌শক্তির জন্য মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা। প্রলাপ বকিলে ইতর জন্তুগণ কি তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করে না?

অহঙ্কারে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছ; শত্রুগণ তোমাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিবে। কিন্তু সাদির মস্তক বিনয়ে অবনত; তাহার শত্রু কোথায়?

অগ্রে চিন্তা কর, পরে বাক্য কহিও। অগ্রে ভিত্তি, তাহার উপর অট্টালিকা; ইহা যেন মনে থাকে।

অন্ধের নিকট জ্ঞান শিক্ষা কর। তাহারা যষ্টির সাহায্যে অগ্রে পথ পরীক্ষা করিয়া পরে পদ-নিক্ষেপ করে।

পৃথিবী চিরকালের জন্য নহে। পার্থিব বিষয়ের উপর নিজ সুখশয্যা রচনা করিও না। রাজ-সিংহাসনেই অধিষ্ঠান কর, আর পর্ণ কুটীরেই বাস কর, সকলকেত যাইতেই হইবে।

কত শত বীর-পুরুষ ভূগর্ভে কবরস্থ। হায়! তাহাদের একখানি অস্থিও এখন খুঁজিয়া মেলে না। দয়া-ব্রতেই জীবনের প্রকৃত সম্ভোগ ও অমরত্ব।

জগতের বৃহৎ বস্তুমাত্রই মূল্যবান নহে। সিনাই পর্ব্বত ক্ষুদ্র হইলেও মহা গৌরবে পূর্ণ। আরবীয় অশ্ব ক্ষুদ্র হইলেও সকলের আদরের সামগ্রী।

একখানি রুটি পাইলে সাধু নিজে অর্দ্ধাংশ ভোজন করিয়া অপরার্দ্ধ দরিদ্রকে দান করে। হায়! রাজা একটী রাজ্য জয় করিয়া সন্তুষ্ট নহে, অপরের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সে লালায়িত।

ক্ষুদ্র-বৃক্ষকে সহজে উৎপাটন করিতে পার, বড় হইলে তোমার সাধ্যে কুলায় না। বাঁধের ছিদ্র সহজে রোধ করিতে পার; কিন্তু সে বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, হস্তিপৃষ্ঠে সে অপ্রতিহত জলস্রোত পার হওয়া যায় না।

দীপ্যমান অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারকে অবহেলা করিও না।

সর্পকে বিনাশ করিয়া শিশুসর্পকে বাড়িতে দিও না। যাহা কিছু মন্দ, সমূলে তাহার ধ্বংস-সাধন কর।

হিংসুক! মৃত্যুই তোমার খল-রোগের ঔষধ। দুর্ভাগ্যেরা সৌভাগ্যবানের পতন দেখিতে চায়। বাদুড়ের চক্ষু সূর্য্য-কিরণ সহ্য করিতে পারে না। সূর্য্য কি তাহার জন্য দোষী? এরূপ শত সহস্র চক্ষু পীড়িত হউক, তাহাও ভাল, কিন্তু সূর্য্যকিরণ যেন ম্লানভাব ধারণ না করে।

দুর্দ্দিনে যিনি বন্ধু পাইতে চান, সম্পদের সময় তিনি বদান্যতা অভ্যাস করুন। সদয় ব্যবহার না পাইলে অনুরক্ত দাসও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। স্নেহ-দয়ায় অপরিচিতও তোমার সেবক হইয়া দাঁড়াইবে।

নানা কথা।

সংস্কৃত-বিদ্যালয়।—দ্বারবঙ্গ মহারাজ, প্রধানা মহিষী শ্রীমতী রামেশ্বরলতার নামে দ্বারবঙ্গ নগরে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়, বিগত ১২ই জুলাই তারিখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ বিদ্যালয়ে বেদ দর্শন, ন্যায়, মন্ত্রশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বৈদ্যগ্রন্থ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইবে। মহারাজা আশা করেন, মহর্ষি জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-গৌতম এবং পুণ্যশ্লোকা সীতা-গার্গী-মৈত্রেয়ীর অভ্যুদয়ে শ্লাঘ্য মিথিলা-ভূমিতে দেশ বিদেশীয় ছাত্রের অসদ্ভাব হইবে না। অনেকগুলি উপনিষদের সংরচন-ক্ষেত্র এই মিথিলা। মানব-আত্মার অমরত্ব বহুকালপূর্ব্বে এইখানেই বিঘোষিত। রাজর্ষি জনকের ব্রহ্মতত্ত্ব এইখানেই উৎগীরিত। কিন্তু বর্ত্তমানে হায়! গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। প্রাচীন ঋষিগণ যে অমূল্য ধনসম্পত্তি শাস্ত্রের ভিতরে নিহিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, অনেকেই তাহার স্বাদ-গ্রহণে অসমর্থ—নিতান্তই দীন। যিনি জাতীয় এই ঘোর দৈন্য ঘুচাইবার জন্য এইরূপ উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুক্তহস্ত, তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন। মহারাজা বাহাদুর সার রামেশ্বর সিং, কে, সি, আই, ই, স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ ইহার সম্পাদক। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণালী জানিতে চাহেন, সম্পাদকের নামে দ্বারবঙ্গে পত্র লিখিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন। আমরা এই বিদ্যালয়ের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিদ্যালয় আদি-ব্রাহ্মসমাজে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যাহার উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহাদের সেই পবিত্র স্মৃতির সহিত নবস্থাপিত এই ব্রহ্মবিদ্যালয় অনুস্যূত। ডাক্তার পি, কে, রায়, ইহার পরিদর্শক; শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, অম্বিকা চরণ সেন, ধর্ম্মানন্দ কুমুদি, হেমচন্দ্র সরকার অপাততঃ এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দিবেন। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান এই বিদ্যালয়ের সভাপতি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন সহযোগী সম্পাদক ও হেমচন্দ্র সরকার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। এক্ষণে বর্দ্ধমানাধিপতি মাসিক ৩০০৲ টাকা ও অন্যান্য কেহ কেহ অর্থ সাহায্য করিতেছেন। মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ভারত ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভগবদ্গীতা, ভারতে ধর্ম্ম-বিকাশ, এবং বিবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সারমর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা ৩ বৎসরব্যাপী এবং এই প্রথম বৎসরের জন্য ব্রহ্মবাদ, মনোবিজ্ঞান, উপনিষদ, ধম্মপদ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ছাত্রবৃত্তি মাসিক ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে; বৃত্তি-ভোগী চারিজন ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। বাহিরের আরও কতিপয় ছাত্র উপদেশের সময় উপস্থিত থাকেন। এই বিদ্যালয়ের ইংরাজি নাম Theological College for all India অর্থাৎ সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কালেজ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এই নামের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাহার দিকে অধ্যক্ষদিগের যেন দৃষ্টি স্থির থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। হিন্দু সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলে বিদ্যালয় লাভবান্ হইবেন। হিন্দু দর্শন ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র, অধীত বিষয়ের মধ্যে স্থান পাইলে বিদ্যালয়ের গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে, কেননা দর্শনের প্রভাব উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতরে অস্থিমজ্জাগত, এবং বৈষ্ণবসংখ্যাও সমগ্র ভারতে নিতান্ত অল্প নহে। দুই এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রেণীর ভিতরে থাকিলে ভাল হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয় অল্পদিনই হইল উন্মুক্ত হইয়াছে। কালক্রমে ইহার ত্রুটি-বিরহিত পূর্ণাবয়ব বিকশিত হইবে, আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।—১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিতেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এই নামে প্রকাশ করেন। ব্রাহ্ম-সাহিত্যের ভিতরে এই গ্রন্থের স্থান অতীব উচ্চে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, যাহারা বুঝিতে চাহেন, এই পুস্তক হইতে তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

সুফি-সম্প্রদায়।—মুসলমানদিগের মধ্যে একটি দল আছে, যাহারা কতক পরিমাণে বৈদান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী, উহাদিগকে সুফি বলে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু তাঁহারই এক অংশ। আত্মাকে ক্রমিকই উন্নত কর, যে পর্য্যন্ত না সে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্যের আত্মা কিছু দিনের জন্য এখানে আসিয়াছে; সে এখানে পথিক; সে আবার তাঁহাতেই মিলিত হইবে। সুফিদিগের সাধনের প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের কার্য্য কর; দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া সংসারিক সকল কামনা বিসর্জন দাও; তৃতীয় অবস্থায় নির্জ্জনে তাঁহার সাধনা কর; তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্থ অবস্থায় তাঁহার জ্ঞানলাভ কর; পঞ্চম অবস্থা পরমানন্দের অবস্থা; ষষ্ঠাবস্থায় ঈশ্বরের নিকট হইতে সাধক নিজেই সত্য (হকিকৎ) লাভ করিতে থাকে; পরবর্ত্তী সপ্তম অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত সে মিলিতে থাকে; ৮ম অবস্থায় সে ঈশ্বরে এক কালে বিলীন হয়, এবং আত্মারূপ পথিকের সকল যাত্রার অবসান হয়। প্রেমের অবস্থা বর্ণনা করিতে সুফিকবিগণ বড়ই সিদ্ধহস্ত। সুফি হইল যাত্রী, সে প্রেমিক, ঈশ্বর তাহার প্রেমের বস্তু। যাত্রার একএকটি সোপানের নাম পান্থশালা; সাধকের আনন্দ ক্রমে উন্মত্ততার সীমায় গিয়া পৌছে। অনেক পার্শী ও পস্তু কবি এই প্রেমের বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সময়ান্তরে আমরা সুফিকবি হাফেজের অমূল্য-গ্রন্থ হইতে তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততার ও ঈশ্বর প্রেমের পরিচয় দিব।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫২৬।০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৬৩৸৶০
সমষ্টি	...	৩১৯০ ৶০
ব্যয়	...	৫৪৪ ৶৯
স্থিত	...	২৬৪৬ /৩

জায়

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২৪৬ /৩

২৬৪৬ /৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৬৫৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ বড়ুয়া

১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কামনা কুমার সিংহ

৫৲

পরলোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত
বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়ার হাউসের সেয়ারের ডিভিডেণ্ট
আদায়, মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়

৫০৲

কোম্পানীর কাগজ ক্রয়

১০০৲

৩৬৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১।৶০
পুস্তকালয়	...	৸০
যন্ত্রালয়	...	১৪০।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৮৸০
সমষ্টি	...	৫২৬।০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭৭৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৶০
পুস্তকালয়	...	।৬
যন্ত্রালয়	...	২৩৬৸৶৩
সমষ্টি	...	৫৪৪ ৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫২০। ৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৪৬ ⁄৩
সমষ্টি	...	৩১৬৬।⁄৬
ব্যয়	...	৩৬৭৷৩
স্থিত	...	২৭৯৮॥⁄৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
অদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩৯৮॥⁄৩

২৭৯৮॥⁄৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০৫৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজিকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশ চন্দ্র মল্লিক

২৲

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র

১৲

শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র দে

২৲

২০৫৲

পুস্তকালয়	...	৯৮⁄৬
যন্ত্রালয়	...	৩০৫।৶৯
সমষ্টি	...	৫২০। ৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৩।৶০
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৯৫॥⁄০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৫॥৯
সমষ্টি	...	৩৬৭৷৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

১৮২৯ শকের ১লা শ্রাবণ হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ, ট্রষ্টীগণের আদেশে নিম্নলিখিত আচার্য্য ও কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইলেন।

আচার্য্য ও সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
„ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
„ যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী।

সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

গায়ক।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।
„ শ্যামসুন্দর মিশ্র।

বাদক।

„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সপ্তদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৭৭০ সংখ্যা | ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

জীবের জন্মকাল।

এই জলস্থলময় পৃথিবী কতদিনপূর্ব্বে জীবাবাসের উপযোগী হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক নানা জ্যোতিষ্কলোকে অগ্নিভুক্ ও শিলাময় জীবের কল্পনা করিয়াছেন; বলা বাহুল্য সে সকল কথা কেবল মাত্র কল্পনা-প্রসূত। পৃথিবীতে কোনকালে ঐ প্রকার কাল্পনিক জীব ছিল কি না, আমরা তাহার আলোচনা করিব না। যাহাদের শরীর নাইট্রোজেন্‌মিশ্রিত-জীব-সামগ্রী (Protoplasm) দ্বারা গঠিত এবং যাহারা বায়ু বা জলস্থিত অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া, সেই জীব-সামগ্রীর সহিত তাহার রাসায়নিক সংযোগ করাইয়া সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, আমরা এখানে তাহাদিগকেই জীব বলিব। লোকান্তরে বা গ্রহান্তরে কোনও অদ্ভুত জীব আছে কি না, এবং তাহাদেরই কোনও বংশধর আমাদের পৃথিবী-খানিতে কোন কালে বাসা বাঁধিয়া ছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের পরিচিত জীবগুলিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, তাহাদের আবাসভূমির অবস্থা জীবনরক্ষার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, কোন জীবই টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। চতুষ্পার্শ্ব যদি বরফের ন্যায় শীতল হয়, তবে উদ্ভিদের ন্যায় জীব ও বায়ু হইতে অঙ্গার (Carbon) গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। কাজেই এই অবস্থা জীবাবাসের প্রতিকূল। উষ্ণতার মাত্রা পঞ্চাশ অংশের উপরে উঠিলে, উদ্ভিদ মাত্রকেই মৃতপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং, এ অবস্থাকেও কখনো জীবাবাসের উপযোগী বলা যায় না। আগে উদ্ভিদ এবং পরে প্রাণী। কারণ উদ্ভিদ হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব লইয়াই প্রাণীর অস্তিত্ব। এজন্য উষ্ণতার উঁচু ও নীচু দিকের দুই সীমার পরে উদ্ভিদের বাঁচা অসম্ভব, প্রাথমিক প্রাণীরও তাহাতে টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব।

কাজেই এখন প্রশ্নটি বেশ সহজ হইয়া আসিল। তাপ বিকীরণ করিতে করিতে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ কোন্

সময়ে উষ্ণতার উক্ত দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহাই বিচার্য্য। তা' ছাড়া রৌদ্র বৃষ্টি দিন রাত্রির পরিমাণ ইত্যাদির উপর যখন জীবের জীবনমৃত্যু প্রভৃতি ব্যাপার এতটা নির্ভর করিতেছে, তখন পৃথিবীর অপর প্রাকৃতিক অবস্থাগুলিও কতদিন পূর্ব্বে ঠিক্ এখনকার মত হইয়া জীবের আবাসোপযোগী হইয়াছিল, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল-নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষিকগণের শরণাপন্ন হওয়া বৃথা। তবুও দিবারাত্রির ভেদ এবং সৌর তাপালোকের পরিমাণাদি দ্বারা যখন জীবের স্বাস্থ্যকে নানাপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যাইতেছে,তখন এসম্বন্ধে জ্যোতিষিক-মতামত গ্রহণ করা কখনো কখনো আবশ্যক হইয়া পড়ে। জ্যোতিষিকগণের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা এখন দিবা ও রাত্রির যে একটি সুন্দর বিভাগ দেখিতে পাইতেছি, তাহা কি পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, দিবারাত্রির বিভাগ জ্যোতিষিক হিসাবে একটা সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। অধিক দিনের কথা নয়, সাতাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাবিলনীয় জ্যোতিষিকগণ যে হিসাবে গ্রহণাদির গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আর সে হিসাবে গণনা চলে না। হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সে সময় পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ (rotation) অধিক স্পষ্ট ছিল, অর্থাৎ তখনকার দিনরাত্রিগুলা ছোট ছোট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী এডাম্‌স্ (Adams) সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এখনো পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ প্রতি শতাব্দীতে বাইশ সেকেণ্ড করিয়া কমিয়া আসিতেছে। পরিমাণটা খুব অল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে বিশেষ আসে-যায় না। অতি দূর অতীতকালে পৃথিবী যে অত্যন্ত প্রবল বেগে আবর্ত্তন করিয়া দিনরাত্রিগুলাকে খুব ছোট করিয়া তুলিত, তাহা সুনিশ্চিত।

আবর্ত্তনবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া কোন্ সময়ে এখনকার মত দিবারাত্রির বিভাগ করিয়াছিল, এখন আলোচনা করা যাউক। কোন বর্ত্তুলাকার কোমল জিনিসকে লাটিমের মত ঘুরাইতে থাকিলে, তাহার উপর ও নীচেকার অংশগুলা কেন্দ্রাপসারণী শক্তিতে (centrifugal force) মাঝামাঝি অংশে জমা হইয়া, বর্ত্তুলটাকে চেপ্টা করিয়া দেয়। আমাদের পৃথিবীর আকার অবিকল ঐ বর্ত্তুলের মত হইয়া পড়িয়াছে। যখন পৃথিবী কোমল অবস্থায় ছিল, তখন উহার দৈনিক আবর্ত্তনগতিতে উত্তর দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত স্থানের যত গলিত মাটি পাথর বিষুব-প্রদেশে আসিয়া জমা হইয়াছিল। তার পর এই অবস্থাতেই জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায়, উহার উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌টা ঠিক তখনকার মতই চাপা থাকিয়া গেছে। চাপার পরিমাণ হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণের ব্যাস পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস অপেক্ষা মোটে ২৭ মাইল কম। ইহা হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড কেল্‌ভিন্ (Kelvin) গণনা করিয়াছেন, দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে জমাট বাঁধিলে সেই সময়কার প্রবল আবর্ত্তনবেগে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ আরো অধিক চাপা হইয়া পড়িত। সুতরাং, দেখা যাইতেছে দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী কখনই জীবের আবাসভূমি ছিল না।

লর্ড কেল্‌ভিন্ এই গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাপ বিকীরণ করিতে করিতে

কতকালে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি তাহারও এক হিসাব করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বোক্ত গণনার ফলের সহিত, এই গণনার ফলের অবিকল ঐক্য দেখা গিয়াছিল। হিসাবটি অতি সহজ। সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ভূগর্ভের উত্তাপ পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায়, প্রতি ৫০ বা ৬০ ফিটে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ ভিতরের দিকে বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তরগুলি ভিতর হইতে যে তাপ টানিয়া লয় তাহা স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে না। ঐ তাপের এক অজস্র বিকীরণ আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পৃথিবী প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তাপ, বিকীরণ দ্বারা ক্ষয় করে, লর্ড কেল্‌ভিন্ তাহার এক হিসাব করিয়াছিলেন। সুতরাং অত্যুষ্ণ গলিত অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় উপনীত হইতে, পৃথিবী কত কাল অতিবাহন করিয়াছিল, ঐ হিসাব দ্বারা তাহা সহজেই জানা যায়।

দুই গণনায় অবিকল একই ফল হইতে দেখিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এবং দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে যে পৃথিবী জীবাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী বাসের উপযোগী ছিল না সত্য, কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহাতে জীবের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কি অনুমান করা যায় না? লর্ড কেল্‌ভিন্ শীতাতপ ও জলস্থলের সমাবেশ ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখিয়া হিসাব করিয়া বলিতেছেন, জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই দুই কোটি বৎসরের পূর্ব্বে হয় নাই। দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সৃষ্টির অভিব্যক্তি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, তাহার পূর্ণপরিণতি হইতে এবং ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বাংশে জীবাবাসের উপযোগী হইতে উহার পর আট কোটি বৎসর নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মনের মত হয় নাই। জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল নির্দ্ধারণের জন্য ইহাঁরা আর একপ্রথায় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, ভূগর্ভ পরীক্ষা করিলে, পর পর সজ্জিত নানা স্তরে, প্রাচীন ও আধুনিক নানা জীবের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ঐ সকল স্তরের উৎপত্তি-কালে যে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। জীবকঙ্কালবিশিষ্ট স্তরগুলি কত দিনে সঞ্চিত হইয়াছিল, ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রথমে তাহা অবধারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ভূগর্ভের প্রায় এক লক্ষ ফিটে ঐ সকল স্তর দেখা গিয়াছিল এবং নদী দ্বারা ধৌত মৃত্তিকা সমুদ্রতলে এক ফুট প্রমাণ স্থূল হইয়া জমিতে, অবস্থা বিশেষে সাত শত বৎসর হইতে কখনো কখনো সাত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত অতিবাহন করে, জানা গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ গিকি (Sir Archibald Geikie) সাহেব স্তরের স্থূলতা ও তাহাদের উৎপত্তির আনুমানিক কাল লইয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, জীবকঙ্কাল-বিশিষ্ট নিম্নতম স্তরের উপর যে সকল মাটি পাথর আছে, সে গুলি সঞ্চিত হইতে স্থানবিশেষে সাত কোটি হইতে সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, সত্তর কোটি বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের পৃথিবীর উপর জীবের অস্তিত্ব ছিল।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গিকি সাহেবের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া লর্ড কেল্‌ভিনের গণনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন অন্ততঃ সত্তর কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে নিশ্চয় জীবের অস্তিত্ব ছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত দুই দল পণ্ডিতের কলহ অবিরাম চলিতেছে, কিন্তু কেহই পরাভব স্বীকার করিতেছেন না। গণনার প্রণালী অভ্রান্ত হইলেও যে সকল স্বীকৃত তত্ত্ব (Data) লইয়া দুইদল পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক গলদ্ দেখা যায়। লর্ড কেল্‌ভিন্ বাবিলনীয় জ্যোতিষিকগণের হিসাব পরীক্ষায় পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে কাহার বেগ কমিয়া আসায় প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিকগণের হিসাবে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লর্ড কেল্‌ভিন্ স্পষ্টতঃ দেখাইতে পারেন নাই। তা'র পর তিনি পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার ও তাহার জমাট বাঁধিবার সময়কার আকার অভিন্ন বলিয়া যে একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেও আপত্তি চলে। জমাট হইয়া পড়ার পর পৃথিবীর আকারের যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতে পারে না, এ কথা কোন বৈজ্ঞানিকই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। ভূপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্রের দিকে নামিলে উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সকল অংশেই যে একই মাত্রায় উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং, গভীরতা বৃদ্ধির সহিত প্রত্যেক পঞ্চাশ ফুটে এক ডিগ্রী পরিমাণ উষ্ণতার বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইয়া, লর্ড কেল্‌ভিন্ যে গণনা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত বলা যায় না। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের গণনার স্থলেও ঐ প্রকার অনেক দোষ দেখা যায়। কাজেই জীবের জন্মকাল-সম্বন্ধে উক্ত দুই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা অসম্ভব।

সম্প্রতি কয়েকজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মাঝে দাঁড়াইয়া অভিব্যক্তিবাদ সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাঁদের ইচ্ছা ছিল, জীবের অভিব্যক্তির একটা কাল নির্ণয় করিয়া নিম্নতম জীব কত দিনে আধুনিক উচ্চতম জীবে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখাইবেন। কিন্তু জীব স্বভাবতঃ কত দিনে অভিব্যক্তির পথে কতটা অগ্রসর হয়, তাহা কোন জীবতত্ত্ববিৎই অনুমান করিতে পারেন নাই। কাজেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। জীবের জন্মকাল নির্দ্ধারণ লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক কোলাহলের সূচনা হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, তাহা এখন কেহই বলিতে পারিতেছেন না।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সুন্দর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

সকল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু কার্য্যফল ও কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন। পরস্পরের সহিত কার্য্যপ্রণালী বিনিময় করিয়া, পরস্পরের নির্দ্দিষ্ট সীমা-ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া কোন লাভ নাই। এবিষয়ে আমি প্রাচীন গ্রীকের মতকেই প্রমাণ বলিয়া শিরোধার্য্য করি। কিন্তু অভ্যাসের অভাব বশতই হউক কিম্বা অন্ধসংস্কার বশতই হউক, বিভিন্ন ধাতুময় মূর্ত্তি কিংবা রং-করা মূর্ত্তি আমার তেমন ভাল লাগে না। অমিশ্র উপাদানে গঠিত, অচিত্রিত

মূর্ত্তিই আমার ভাল লাগে। মার্ব্বেলের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহাতে যে একটা কৃত্রিম মাংসের পেলবতা বিধান করিবার চেষ্টা করা হয় সেটা আমার রুচির সহিত মেলে না। ভাস্কর-সরস্বতী একটু কঠোর-প্রকৃতির দেবতা; কিন্তু তবু তাঁহাতে এমন কতকগুলি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে যাহা অন্য শিল্পকলায় নাই। ভাস্করকলার সহিত বর্ণের কোন সম্বন্ধ না রাখাই ভাল। ভাস্কর-শিল্পে যদি চিত্রকর্ম্ম আনিয়া ফেল, তাহা হইলে বল না কেন, তাহাতে কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট ভাবও আনা যাইতে পারে। যে সঙ্গীতকলা অনুভূতি-মূলক, তাহাকে যদি চিত্রবৎ মূর্ত্তিমান করিবার চেষ্টা কর—সে কি বৃথা চেষ্টা নহে? যে সঙ্গীতগুণী, সমবেত-যন্ত্রসঙ্গীতে সুনিপুণ, তাহাকে একটা ঝড়ের অনুকরণে সঙ্গীত রচনা করিতে বল দেখি। অবশ্য, বাতাসের সোঁসোঁ শব্দের অনুকরণ ও বজ্রধ্বনির অনুকরণ করা খুবই সহজ। কিন্তু যে বিদ্যুচ্ছটা যামিনীর তিমি-রাবগুণ্ঠনকে সহসা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, কিংবা প্রচণ্ড ঝটিকার সময়, পর্ব্বত সমান যে উত্তুঙ্গ সাগর তরঙ্গ একবার গগন-স্পর্শ করিয়া আবার পরক্ষণে অতল রসা-তলে নামিয়া যায়—এই সমস্ত দৃশ্য কি কোন প্রকার স্বর-সম্মিলনে প্রকাশিত হইতে পারে? যদি পূর্ব্ব হইতে শ্রো-তাকে জানাইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সঙ্গীত-প্রকটিত এই দৃশ্য ঝড়ের দৃশ্য, কি যুদ্ধের দৃশ্য, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে?—কখনই পারে না। বি-জ্ঞানের ও প্রতিভার যতই শক্তি থাকুক না, শব্দের দ্বারা কখনই রূপ চিত্রিত হইতে পারে না। যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য তাহা চেষ্টা না করাই সঙ্গীতের পক্ষে সুপরামর্শ। সঙ্গীত, তরঙ্গের উত্থান পতন অনুকরণ করিতে না পারুক, তাহা অপেক্ষা উহা আরও ভাল কাজ করিতে পারে। ঝটি-কার বিভিন্ন দৃশ্যে, আমাদের মনে পরম্পরা-ক্রমে যে সকল ভাবের উদয় হয়, সঙ্গীত সেই ভাব আমাদের মনে উদ্বোধিত করিয়া দেয়। এইরূপেই সঙ্গীতগুণী হেড্‌নের নিকট চিত্রকরও পরাস্ত হয়; কেন না, চিত্র-কর্ম্ম অপেক্ষাও সঙ্গীত আমাদের অন্তরের অন্তস্তলকে গভীর রূপে আলোড়িত করিয়া তোলে। "কবিতা একপ্রকার চিত্র"—এই কথাটি সাধারণের মধ্যে খুব প্রচলিত। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, কবিতার দ্বারা যে সব কাজ সাধিত হয়, চিত্রের দ্বারা কখনই তাহা সম্যকরূপে হইতে পারে না।

কবিবর ভ্যর্জ্জিল, যশের যে চিত্র আঁকিয়াছেন,—সকলেই তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু যদি কোন চিত্রকর এই রূপক কল্পনাটিকে চিত্রের দ্বারা মূর্ত্তিমান করিবার চেষ্টা করেন, যদি ইহাকে এইরূপ একটা অতিকায় দৈত্যরূপে চিত্রিত করেন—যাহার শত মুখ, শত কর্ণ, যাহার পদদ্বয় ধরা ছুঁইয়া আছে এবং যাহার মুণ্ড আকা-শের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,—এইরূপ মূর্ত্তি কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না?

অতএব সকল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য সমান, কিন্তু উপায়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কারণেই সকল শিল্পকলার একই সাধারণ নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-কলার বিশেষ বিশেষ নিয়ম। এই বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি ধরিয়া আলোচনা করিবার আমাদের সময়ও নাই, অধিকারও নাই। আমরা শুধু এই কথাটি পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিব যে, সকল শিল্পকলারই উপর ভাবের পূর্ণ প্রভুত্ব। যে শিল্পরচনা কোন একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ না করে,

সে শিল্পরচনার কোন অর্থই নাই। যে শিল্পরচনা কোন একটা বিশেষ ইন্দ্রিয় দিয়া অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে, কোন প্রকার উন্নত চিন্তা,—মর্ম্মস্পর্শী ভাব মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্পকলাই সার্থক। এই মূল নিয়মটি হইতেই আর সকল নিয়ম প্রসূত হইয়াছে। যেমন মনে কর—কলা-রচনার নিয়ম। রচনাকার্য্যে সাম্য ও বৈষম্য বিষয়ক উপদেশটি বিশেষ রূপে প্রযুজ্য। কিন্তু সাম্যের প্রকৃতি যতক্ষণ না নির্ণীত হয়, ততক্ষণ ইহা শুধু কথামাত্রেই থাকিয়া যায়। ভাবের একতাই প্রকৃত একতা। যে ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে সেই ভাবটি যাহাতে সমস্ত রচনার মধ্যে প্রসারিত হয়, সেই জন্যই বিচিত্রতার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এইরূপ রচনা এবং কৃত্রিম সাম্য-রক্ষা ও বিভাগের সুব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভাব-ব্যঞ্জকতাই প্রকৃত রচনার মুখ্য উপাদান।

ভাবব্যঞ্জকতা হইতে শিল্পকলার শুধু কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়, তাহা নহে, উহা হইতে এরূপ একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যাহার দ্বারা শিল্পকলাকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

ফলতঃ শ্রেণীবিভাগ বলিতে গেলেই তাহার মধ্যে একটা সাধারণ মুলতত্ত্ব আছে এইরূপ বুঝায়—এবং সেই মুলতত্ত্বটিই সাধারণ মানদণ্ডের কাজ করে।

কেহ-কেহ আমাদের সুখের মধ্যেও এইরূপ একটি মূলতত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মতে, সেই শিল্পই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহার দ্বারা আমরা সুখানুভব করি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে শিল্পের উদ্দেশ্য সুখ নহে। শিল্পকলা হইতে আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে যে সুখানুভব করি তাহা উহার প্রকৃত মূল্যের পরিমাপক নহে।

শিল্পের প্রকৃত পরিমাপক ভাবব্যঞ্জকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেহেতু ভাব প্রকাশ করাই শিল্পের পরম উদ্দেশ্য। অতএব যাহার দ্বারা বেশী ভাব প্রকাশ হয়, শিল্পের মধ্যে সেই শিল্পই অগ্রগণ্য।

প্রকৃত শিল্পকলামাত্রই ভাবব্যঞ্জক, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভাব প্রকাশ করে। ধর, সঙ্গীত; এই সঙ্গীতকলা যে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, সর্ব্বাপেক্ষা গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিক, তাহাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। কি ভৌতিক হিসাবে, কি নৈতিক হিসাবে, মানব-আত্মার সহিত ধ্বনির একটা আশ্চর্য্য যোগ আছে। মনে হয়, আমাদের আত্মা যেন একটা প্রতিধ্বনি, ধ্বনি যাহার দ্বারা একটা নূতন শক্তি লাভ করে। পুরাকালের সঙ্গীতসম্বন্ধে বড়ই অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। এই সঙ্গীতের প্রভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত করিতে হইলে; অতীব আড়ম্বরময় জটিল উপায় অবলম্বন করা যে আবশ্যক তাহাও মনে হয় না। বরং যে সঙ্গীত যত অধিক শব্দকারী সেই পরিমাণে সে তত কম মর্ম্মস্পর্শী। একজন সুকণ্ঠ গায়ক মৃদুস্বরে সঙ্গীতের আলাপ করিয়া আমাদিগকে যেন সপ্তম স্বর্গে উত্তোলন করেন, আকাশের অসীম শূন্যে লইয়া যান, আমাদের চিত্তকে স্বপ্নসাগরে নিমজ্জিত করেন। কল্পনার সম্মুখে একটা অসীম বিচরণভূমি উন্মুক্ত করা—খুব সাদা-সিধা সুরের দ্বারা আমাদের অত্যন্ত হৃদয়-ভাবগুলিকে উত্তেজিত করা, আমাদের ভালবাসার জিনিসগুলিকে জাগাইয়া তোলা—ইহাই সঙ্গীতের বিশেষ-শক্তি। এই হিসাবে, সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তথাপি শিল্পকলার মধ্যে সঙ্গীতও সর্ব্বপ্রধান নহে।

সঙ্গীতের অপরিমেয় প্রভাব। অন্য সকল কলা অপেক্ষা সঙ্গীতই বেশী অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে; কেন না উহার কার্য্যফল অস্পষ্ট, তিমিরাচ্ছন্ন ও অনির্দ্দিষ্ট। এই সঙ্গীতকলা, বাস্তুকলার ঠিক্ বিপরীত। বাস্তুকলা আমাদিগকে ততটা অনন্তের দিকে লইয়া যায় না, কেন না উহার সমস্তই সুনির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ—এক স্থানে গিয়া উহা থামিয়া যায়। অস্পষ্টতাই সঙ্গীতের বল ও দুর্ব্বলতা—উভয়ই। সঙ্গীত সমস্তই প্রকাশ করে, অথচ বিশেষ কিছুই প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে বাস্তুকলা অনির্দ্দিষ্ট কল্পনার হাতে কিছুই ছাড়িয়া দেয় না; এটি অমুক জিনিস কিংবা অমুক জিনিস নহে—বাস্তুকলা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। সঙ্গীত চিত্র করে না, সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শ করে; যে কল্পনা কতকগুলি মানস-প্রতিবিম্বমাত্র,—সঙ্গীত সেরূপ কল্পনার উদ্রেক করে না, পরন্তু সেইরূপ কল্পনার উদ্রেক করে যাহার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত হয়। হৃদয় একবার বিচলিত হইলে, আর সমস্তই বিচলিত হইয়া উঠে; এইরূপ পরোক্ষভাবে সঙ্গীতও কতকগুলি মানস-প্রতিবিম্বকে,—কতকগুলি মনঃকল্পিত রূপকে কিয়ৎপরিমাণে জাগাইয়া তোলে; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ও স্বাভাবিকভাবে ইহার শক্তি কল্পনার উপর কিংবা বুদ্ধির উপর প্রকটিত হয় না;—প্রকটিত হয় শুধু হৃদয়ের উপর। সঙ্গীতের পক্ষে ইহাও একটা কম সুবিধার কথা নহে।

সঙ্গীতের রাজ্য—ভাব-রসের রাজ্য। কিন্তু ইহাতেও বিস্তার অপেক্ষা গভীরতাই বেশী। সঙ্গীত কতকগুলি ভাবকে খুব সজোরে প্রকাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুবই কম। সঙ্গীত স্মৃতির পথ দিয়া আনুসঙ্গিকভাবে সকল প্রকার ভাবকেই কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে অতি অল্পসংখ্যক ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে—তাও আবার যে ভাবগুলি খুব সাদাসিধা—যেমন হর্ষ ও বিষাদের সূক্ষ্ম ভেদ সকল—সেই সকল ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে। মহানুভাবতা, কোন সাধু প্রতিজ্ঞা, কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন ভাব সঙ্গীতকে প্রকাশ করিতে বল দেখি,—হ্রদ কিংবা পর্ব্বত চিত্রিত করিতে যেমন সে পারিবে না, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেও সে তেমনি অসমর্থ হইবে।

সঙ্গীতে, দ্রুত, বিলম্ব, মৃদু, তীব্র এই সকল বিবিধ প্রকারের ধ্বনি প্রযুক্ত হয়—কিন্তু বাকী আর সমস্তই কল্পনার কাজ; কল্পনার যেটি ভাল লাগে কল্পনা সেইটিই গ্রহণ করে। সঙ্গীত একই ছন্দে, একই তালে পর্ব্বতেরও ভাব প্রকাশ করে—সমুদ্রের ভাবও প্রকাশ করে; কোন যোদ্ধৃপুরুষ উহার দ্বারা বীর-রসে মাতিয়া উঠেন—এবং কোন ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ উহার দ্বারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন। অবশ্য সঙ্গীতের ভাব অনেক সময়ে বাক্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু সে গুণপনা বাক্যের—সঙ্গীতের নহে। কখন কখন বাক্যের দ্বারা সঙ্গীতে এমন একটা বদ্ধভাব আসিয়া পড়ে, যে তাহার দ্বারা সঙ্গীতের "জান্"টুকু মরিয়া যায়—সঙ্গীতের সেই অস্পষ্ট অনির্দ্দেশ্য কি-জানি-কি ভাবটি চলিয়া যায়—তাহার বিস্তার, তাহার গভীরতা, তাহার অনন্ততা বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গান কি?—না, স্বরাত্মক বাক্য; কিন্তু সঙ্গীতের এই প্রসিদ্ধ লক্ষণটি আমি কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কোন সাদাসিধা সুপঠিত বাক্য, কর্ণবধিরকর সঙ্গীত-সহকৃত

বাক্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল। সঙ্গীতের নিজ প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখা আবশ্যক; তাহার নিজস্ব দোষগুণ কিছুই তাহা হইতে অপসারিত করা বিধেয় নহে। বিশেষত তাহার স্বকীয় উদ্দেশ্য হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিয়া, এমন কিছু তাহার নিকট হইতে চাওয়া উচিত নহে যাহা সে দিতে পারিবে না। জটিল ধরণের কৃত্রিম ভাব কিংবা ইতর ও গ্রাম্য ভাব প্রকাশ করা সঙ্গীতের কাজ নহে। অনন্তের দিকে আত্মাকে উন্নত করাতেই তাহার বিশেষ মনোহারিত্ব। অতএব সঙ্গীত স্বভাবতই ধর্ম্মের সহচর, বিশেষতঃ সেই প্রকার ধর্ম্মের সহচর, যে ধর্ম্ম অনন্তের ধর্ম্ম ও হৃদয়ের ধর্ম্ম—উভয়ই। সঙ্গীত আত্মাকে অনুতাপের প্রস্রবণে লইয়া গিয়া বিমল করিয়া তোলে, আশা ও প্রেমে হৃদয়কে পূর্ণ করে। যাঁহারা রোমে গিয়া পোপভবনে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের সুগম্ভীর ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান্। তৎশ্রবণে ক্ষণেকের জন্য আত্মা যেন স্বর্গের আভাস প্রাপ্ত হয়; দেশ ভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ বিচার না করিয়া, সহজ স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন ভাবের একটি অদৃশ্য রহস্যময় সোপান দিয়া প্রত্যেক মানব-আত্মাকে উর্দ্ধে লইয়া যায়। তখন সংসারের পরপারে সেই শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য মানবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

বাস্তুকলা ও সঙ্গীতকলা—এই দুই বিপরীত ভাবাপন্ন শিল্পকলার মাঝামাঝি স্থানে চিত্রকলা অবস্থিত। চিত্রকলা বাস্তুকলারই মত সুনির্দ্দিষ্ট এবং সঙ্গীতকলারই মত মর্ম্মস্পর্শী। চিত্রকলা পদার্থসমূহের দৃশ্যমান রূপ নির্দ্দেশ করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু জীবনের ভাবও প্রদর্শন করে; সঙ্গীতের ন্যায়, চিত্রকলাও আত্মার গভীর ভাবগুলি ব্যক্ত করে—বলিতে গেলে, সকল ভাবই প্রকাশ করে। বল দেখি এমন কোন্ ভাব আছে যাহা চিত্রকরের পটে চিত্রিত না হয়? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র; ভৌতিক জগৎ, নৈতিক জগৎ কোন বহির্দৃশ্য, সূর্য্যাস্ত, সমুদ্র, রাষ্ট্রজীবনের ও ধর্ম্মজীবনের বৃহৎ দৃশ্য, সৃষ্টির সমস্ত জীবজন্তু, সর্ব্বোপরি মানুষের মুখশ্রী, সেই মানব-দৃষ্টি যাহা মানব-চিত্তের দর্পণ—সমস্তই তাঁহার চিত্রকর্ম্মের বিষয়। বাস্তুকলা অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী, সঙ্গীতকলা অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট এই যে চিত্রকলা, ইহা আমাদের মতে, উক্ত কলাদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা উহা সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য, ও মানব-আত্মার বিচিত্র ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু সমস্ত কলার মধ্যে কবিতাই শ্রেষ্ঠ; ইহা সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে; কেননা ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক।

বাক্যই কবিতার সাধন-যন্ত্র; কবিতা, বাক্যকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়, এবং আদর্শ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে মনোবস্তুতে পরিণত করে। কবিতা, বাক্যকে ছন্দের দ্বারা সুন্দর করিয়া তোলে; বাক্যকে সামান্য কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া দাঁড় করায়; উহাকে এমন কিছু করিয়া তোলে যাহা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—উভয়ই, যাহা আকৃতি ও দেহগঠনের ন্যায় সীমাবদ্ধ পরিস্ফুট, সুনির্দ্দিষ্ট; যাহা বর্ণচ্ছটার ন্যায় জীবন্ত-ভাবাপন্ন, যাহা ধ্বনির ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী ও অনন্ত। শব্দ নিজেই—বিশেষতঃ কবিতার নির্ব্বাচিত ও রূপান্তরিত শব্দ—একটা প্রবল বিশ্বজনীন সঙ্কেত। এই শব্দ-মন্ত্রের সাহায্যে, কবিতা প্রত্যক্ষ-জগতের সমস্ত বিচিত্র প্রতিবিম্বকে প্রতিভাত করিতে

পারে—যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য; এবং একটার পর একটা এরূপ দ্রুতভাবে প্রকাশ করিতে পারে যে, চিত্রকলা সেরূপ করিয়া উঠিতে পারে না; আবার বাস্তুকলার ন্যায় উহাদিগকে স্তম্ভিত ও অচল করিয়াও রাখিতে পারে। কবিতা যে শুধু এই সমস্তই প্রকাশ করে তাহা নহে, উহা আরও কিছু প্রকাশ করে যাহা অন্য সমস্ত কলার অনধিগম্য; অর্থাৎ উহা চিন্তাবস্তুকে প্রকাশ করে, যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে, এমন কি হৃদয়ের ভাব হইতেও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন;—সেই চিন্তাবস্তু যাহার কোন রূপ নাই, সেই চিন্তাবস্তু যাহার কোন বর্ণ নাই, সেই চিন্তাবস্তু যাহা হইতে কোন শব্দ নিঃসৃত হয় না, সেই চিন্তাবস্তু যাহা কাহারও দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না, সেই চিন্তাবস্তু যাহা জগৎ ছাড়াইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে—সেই চিন্তাবস্তু যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর।

ভাবিয়া দেখ,—"স্বদেশ" এই শব্দটির দ্বারা কত মানস-ছবি, কত হৃদয় ভাব, পরিস্ফুট হয়, কত চিন্তাই আমাদের মনে উদ্রিক্ত হয়; "ঈশ্বর"—এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি বৃহৎ, ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট অথচ গভীর ও ব্যাপক শব্দ আর কি আছে?

বাস্তুশিল্পীকে, ভাস্করকে, চিত্রকরকে, এমন কি সঙ্গীতাচার্য্যকে—প্রকৃতি ও আত্মার সমস্ত শক্তিকে একাধারে প্রকাশ করিতে বল দেখি;—তাহারা কখনই পারিবে না; এবং ইহাতে করিয়াই প্রকারান্তরে কবিতার শ্রেষ্ঠতা তাহাদের স্বীকার করা হয়। এই শ্রেষ্ঠতা উহারা আপনা হইতেই ঘোষণা করে, কেননা কবিতাকেই উহারা নিজ নিজ রচনার সৌন্দর্য্য-পরিমাপক রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে; তাহাদের রচনা, কবিত্ব-আদর্শের যতটা কাছাকাছি যায় ততই তাহাদের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। কলাগুণীদিগের ন্যায় জনসাধারণও এই ভাবে কার্য্য করে। কোন সুন্দর চিত্র দেখিয়া, জীবন্তবৎ ভাবব্যঞ্জক কোন মূর্ত্তি দেখিয়া, একটি মহৎ ভাবের সুর শুনিয়া, তাহারা বলিয়া উঠে,: "আহা কি কবিত্ব"। ইহা কেবল একটা খামখেয়ালি তুলনা মাত্র নহে; কিন্তু কবিতাই যে কলার পূর্ণ আদর্শ, সকলের শ্রেষ্ঠ, সকল কলাই যে ইহার অন্তর্গত, সকল কলাই উহার নিকটে উপনীত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু কেহই উপনীত হইতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিরই কথা।

মানব-বাক্য কবিতা-কর্তৃক ভাবের আকারে পরিণত হইলে, উহাই সঙ্গীতের ন্যায় গভীরতা ও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। কবিতা যেমন দীপ্তিমান তেমনি মর্ম্মস্পর্শী; ইহা যেমন মনের সঙ্গে,—তেমনি হৃদয়ের সঙ্গে কথা কহে। সকল প্রকার দ্বন্দ্বভাবের সাদৃশ্য—বিপরীত ভাবের সাদৃশ্য কবিতার মধ্যে উপলব্ধি হয়। অথচ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া উহার প্রভাব যেন দ্বিগুনিত হয়। কবিতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ছবি, সর্ব্বপ্রকার ভাবরস, সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি, মনের সকল দিক্, পদার্থের সর্ব্বাংশ, সমস্ত দৃশ্যমান্ জগৎ, সমস্ত অদৃশ্য জগৎ—সমস্তই পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই কবিতার সহিত আর কোন কলার তুলনা হয় না। ইহা অননুকরণীয়।

অপৌত্তলিক উপাসনা।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যে অপৌত্তলিক উপাসনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য কি? কেন আমরা এই ব্রত[illegible] হইয়া

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম হইতে কতক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি? "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" কিসের জন্য আমাদের এই প্রতিজ্ঞা। পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া স্বীকার, তবুও কেন রামমোহন রায় এই ব্রতরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন? মহর্ষি পিতৃদেব কিসের জন্য গৃহবিচ্ছেদ লাঞ্ছনা গঞ্জনা—এত আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন? উত্তর এই যে পৌত্তলিক উপাসনায় তাঁহাদের আত্মার শান্তি—আত্মার তৃপ্তি হয় নাই। যাঁহ'কে পাইয়া ঋষিরা জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্ধানে তাঁহারা ব্যাকুল চিত্তে ফিরিতে লাগিলেন, পরে সেই অনন্ত-দেবের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলেন। সেই অতীন্দ্রিয়, অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা-প্রচার তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইল। আমরাও দেখিতেছি এদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা নানাকারণে দুর্গতি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তোমরা এই পৌত্তলিক উপাসনায় এত বীতরাগ কেন; যাঁহারা মূর্ত্তি-পূজক তাঁহারা ত কেহ জ্ঞাতসারে কেহ বা অজ্ঞাতসারে সেই একেরই উপাসনা করেন; ইহাঁদের সঙ্গে যোগরক্ষা করা সত্য সত্যই কি কঠিন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই,—

১। প্রথমতঃ, আমরা জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের স্বরূপকে খর্ব্ব করিতে পারি না—অসত্যকে সত্য রূপে বরণ করিতে পারি না। আমরা যে ঈশ্বরকে চাই, তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—দেশেতে কালেতে তিনি সীমাবদ্ধ নন—তিনি অচেতন জড় নহেন, কিন্তু শুদ্ধ-বুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ। আমরা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে তাঁহার স্বরূপ খর্ব্ব করিব। ইহাতে আমরা আপনাদের চক্ষে অপনারাই হীন হই। অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকেরা না বুঝিয়া যাহা করে করুক—তাহাদিগকে বলিব যে পৌত্তলিক উপাসনা সোপানমাত্র—এ সোপান অতিক্রম করিয়া আরো উচ্চে উঠিতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানী যাঁরা—বিজ্ঞ ও শিক্ষিত যাঁরা, তাঁহারা আপনাদের আদর্শকে উন্নত করুন, আপনার অধিকারকে প্রশস্ত করুন। বহু দেবতার স্থানে উপনিষদ প্রদর্শিত অমূর্ত্ত একেশ্বরের উপাসনা গ্রহণ করুন।

২। দেবমূর্ত্তিকে—প্রতিমাকে সত্য মনে করিতে হইলে, আসলে নকলে কতক সাদৃশ্য চাই। যেমন বন্ধুর অবর্ত্তমানে আমরা তাঁর ছবি রাখি—এই ছবি জীবন্ত মূর্ত্তির যত কাছাকাছি হয়, ততই আদরণীয়। কিন্তু যদি মানুষের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অন্য কিছু গড়াইয়া রাখি, তাহা হইলে কি তাহা আমার বন্ধুকে স্মরণ করিবার সাহায্য করে? নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গহস্তা, লোলজিহ্বা, পতিবক্ষোপরি দণ্ডায়মানা কালীমূর্ত্তি দেখিয়া সেই করুণাময় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কারুণ্যভাব কি কাহারো নিকট প্রতিভাত হইতে পারে? এই কি সেই মঙ্গল সুন্দর মোহনমূর্ত্তির প্রতিরূপ, না নিরাহপশুবলির রক্তস্রাব তাঁর পাবনী পালনী শক্তির উদ্দীপক ও পরিচায়ক? এই যে শালগ্রাম এইবা কিরূপে সেই অনন্তদেবের স্মৃতি-চিহ্ন হইতে পারে? উহা হইতে কি সেই জ্ঞানোজ্জ্বল সত্যস্বরূপের আভা মনে স্থান পায়? এই যে পরিমিত সীমাবিশিষ্ট মন্দিরের বিভিন্ন-রূপী মূর্ত্তি সকল ইহা কি সাধককে সেই অনন্তজ্ঞানস্বরূপে পৌঁছিয়া দিতে পারে?

আপনারা দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম শুনিয়া থাকিবেন—তিনি আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

মূর্ত্তিপূজার প্রতি কিরূপে তাঁর বিরাগ উপস্থিত হইল, তাহার বিবরণ তাঁহার জীবনীতে আছে। শৈব-পরিবারে তাঁর জন্ম—শিব-মন্ত্রে দীক্ষা। এক দিন শিবরাত্রির জাগরণে তিনি মন্দিরে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তাঁর পিতা ও আর সকলে ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন—একমাত্র তিনি জাগ্রত রহিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, ইন্দুরেরা মিলিয়া ঠাকুরের উপর মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে—বাদাম মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোগের সামগ্রী যাহা কিছু ছিল—তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ ভোগ চলিতেছে—ঠাকুর না আপনাকে আপনি সামলাইতে পারেন, না তাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন। তাঁর সহজে মনে হইল যিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম, তিনি কি সেই জগন্নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর হইতে পারেন? এই ঘটনা থেকে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মিল। এবং ভবিষ্যতে ব্রহ্মনাম প্রচারে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৩। আমাদের অগণ্য দেবদেবীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অতি উচ্চ আসন। পূর্ব্ব-পশ্চিম দক্ষিণ-উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁর পূজা প্রচলিত। আমাদের বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে কৃষ্ণ-চরিত বর্ণিত আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি—তাঁর সেই জীবনী কি মানুষের আদর্শ-জীবন হইতে পারে, না তাঁর সেই প্রেমলীলা—রাধাকৃষ্ণের প্রেম—গোপিনীদের সঙ্গে বিহার—প্রেমের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইতে পারে? এই কি স্বর্গীয় প্রেম, না কলুষিত পার্থিব প্রেম? নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই প্রেম আধ্যাত্মিক ভাবে কোন কোন গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে বটে—যেমন বৈষ্ণবদের ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে—সে ভাবে গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু হায়! কয়জন সে ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম? সাধারণ লোকের চক্ষে সে প্রেম কিরূপ? ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহাদের কোন কোন নীতি-বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারই উহার পরিচায়ক। প্রধান সাক্ষী গুজরাটের বল্লভাচার্য্য মহারাজ সম্প্রদায়। তাহাদের মধ্যে যে বিষম অনীতি অনাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে, করসনদাস মূলজী নামক গুজরাটের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা জগতের সমক্ষে প্রচার করেন। তাঁহার নামে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বোম্বাই হাই-কোর্টে এক মোকদ্দমা আনেন, তাহাতে মহারাজদের অঘোর-কৃত্য সকল উদ্ঘাটিত হয়। তাহাদের পুরোহিতেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি হইয়া গুজরাটী কুলবালাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করে—সে কাহিনী শুনিয়া সত্য সত্যই অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। বর্ত্তমান বঙ্গ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

তাহা ছাড়া—মহাভারতের কৃষ্ণচরিতে কি দেখা যায়? শ্রীকৃষ্ণ একজন বুদ্ধিমান সুচতুর পাণ্ডবনায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির কেবল ধর্ম্মযুদ্ধেরই অনুরাগী। কিন্তু কোন কোন সময়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই পরামর্শে তিনি ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন—সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্র পন্থা অবলম্বন করেন। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" প্রভৃতি কথা তাহার প্রমাণ।

আমরা সরল সহজ ধর্ম্ম চাই, ধর্ম্মের ভিতরে জটিলতা চাই না। সহজজ্ঞানে যাহা ধর্ম্মের আদর্শের প্রতিকূল, তাহাই ধর্ম্মের জীবন্ত আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। প্রতিমাপূজাকে

অজ্ঞের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনার সোপান বলিতে পার, কিন্তু লব্ধ-বিদ্য লোকের জন্য ধর্ম্মের উন্নততম আদর্শ চাই। আমরা স্বয়ংপ্রভ সত্য চাই—স্বয়ংপ্রভ আদর্শ চাই, যাহা নিজে দাঁড়াইবার জন্য প্রক্ষিপ্তবাদ বা টীকা-টীপ্পনির অপেক্ষা করে না, কিন্তু যাহা অন্তরের সহিত পূর্ণমাত্রায় সায় পায়, যাহা সহজ অমায়িক অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একান্ত অবিরোধী।

আমরা তবে কোন্ দেবতার উপাসনা করিব? সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম—যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর—সকল দেবতার পরম দেবতা—ভূলোকে দ্যুলোকে যাঁর এই মহিমা—এই ধন ধান্যপূর্ণ শোভাময় পৃথিবী যাঁহার রাজ্য—এই প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর যাঁর ঐশ্বর্য্য, যাঁর শাসনে সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে—যাঁর শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র—পক্ষ মাস ঋতু বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, যাঁর শাসনে পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রগর্ত্তে প্রবেশ করিতেছে। যিনি প্রাণের প্রাণ—যে মহাপ্রাণে এই বিশ্বজগৎ অনুপ্রাণিত—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

আমরা সেই দেবতাকে অর্চ্চনা করি যিনি

সত্যং জ্ঞানমনন্তং।

সকল সত্তার মূল সত্তা—সকল শক্তির মূল শক্তি—চৈতন্যময় আদ্যশক্তি। যিনি সমুদয় বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যাঁর ইচ্ছা সর্ব্বজগতে সমস্ত ঘটনায় দীপ্যমান, যাঁর কর্ম্মের বিরাম নাই, যিনি সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিয়া জীবের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, "প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন" অবিরত বর্ষণ করিতেছেন, যিনি সেতুস্বরূপ হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—

স সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

আমরা সেই দেবতার পূজা করি যিনি

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং—

একদিকে যেমন পাপের শাস্তা, অন্যদিকে তেমনি পাপীর পরিত্রাতা, একদিকে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, অন্যদিকে অমৃতের সোপান। যিনি আমাদের 'বন্ধু জনিতা বিধাতা।' সুখে দুঃখে মৃত্যুতে সকল সময়ে আমাদের সঙ্গের সঙ্গী। পরিমিত মূর্ত্তির ভিতরে কোথায় তাঁর দর্শন পাইব? পাষাণমূর্ত্তির ভিতরে সেই অনন্তের আভাস কোথায়?

যদি তোমরা ব্রত-পালনে দুর্ব্বলতা অনুভব কর, তবে মহতের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া উৎসাহিত হও। সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক ঋষিগণকে স্মরণ কর, বর্ত্তমান সময়ের রামমোহন রায়, দয়ানন্দ স্বরস্বতী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সকল মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর।

দয়ানন্দ স্বরস্বতী বেদকে ধর্ম্মের ভিত্তি করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। বেদের উপদেশ কি?

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে,—
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

যিনি আত্মদা বলদা—সমুদয় বিশ্ব যাঁর উপাসনা করিতেছে—সেই এক সৎস্বরূপ, বৈদিক ঋষিদের দেবতা। মহর্ষি উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক রত্ন সংগ্রহ করেন, উপনিষদ কি বলিতেছেন?

নতস্য প্রতিমাঽস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।

তাঁহার প্রতিমা নাই মহদ্যশ যাঁহার নাম। একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাই উপনিষদের বীজমন্ত্র।

আমরা সেই ধর্ম্ম চাই, যাহাতে বাহ্যআড়ম্বর নাই, যাহা কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডে পর্য্যবসিত নয়—যাহা অন্তরের ধর্ম্ম—আত্ম

সত্য ক্ষমা দয়া যাহা শিক্ষা দেয়, বিপদে ধৈর্য্য—ধর্ম্মযুদ্ধে বীর্য্য—প্রলোভন অতিক্রম করিতে শক্তি দেয়, যাহা মৃত্যু হইতে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। আমরা সেই ধর্ম্ম চাই, ঈশ্বরের পিতৃভাব—মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব—যার মূলমন্ত্র।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমাদের জ্ঞানচক্ষে তোমার সত্যের আলোক প্রকাশিত কর। যাহাতে আমরা তোমার সত্য বরণ করিতে পারি, তোমার সত্য ধারণ করিতে পারি, তোমার সত্য অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি—তোমার সত্য জগতে প্রচার করিতে পারি, এরূপ বল দেও। পরিমিত দেবতার উপাসনাতে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না—তোমার সেই অসীম সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি দেখাও। যাহা কিছু বাহ্য আচার অনুষ্ঠান—কেবল আড়ম্বর মাত্র সার—তাহাতে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের পথ দেখিতে পাই না; তুমি তোমার পুণ্য পথ—তোমার অমৃত পথ প্রদর্শন কর। তোমার অনন্ত আদর্শ—তোমার মহানুভাব সম্মুখে ধারণ কর; তোমার বিরাট-স্বরূপ অন্তরে চিরমুদ্রিত কর। যাহাতে তোমার সহচর অনুচর হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি—পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধার মধ্যে তোমার আদিষ্ট ধর্ম্ম পালন কারতে পারি, তোমার গুরুগম্ভীর ভাব জগতে ঘোষণা করিতে পারি, এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

"ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ—দেহ দেহ ও পদ আশ্রয়।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নানা কথা।

চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠন। কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠনের স্থান অতীব উচ্চে। পৌরাণিক দেবতা-কল্পনার ভিতর দিয়া ঐ উভয় বিদ্যা বহুকাল হইতে আপন সজীবতা নানাবিধ রাজবিপ্লবের ভিতরে অদ্যাপিও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপের শিল্পিগণ মৃণ্ময় দেবতা মূর্ত্তি নির্ম্মাণে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেয়। নিরক্ষর হইলেও বংশপরম্পরা ক্রমে তাঁহাদের এই বিদ্যা কিছুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। লক্ষ্ণৌ ও চুনার অঞ্চলে খেলেনা ও ক্ষুদ্র মনুষ্যাদি মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে তদ্দেশীয়গণ বিলক্ষণ নিপুণতা প্রদর্শন করে। চিত্রাঙ্কনে দিল্লী লক্ষ্ণৌ ও কাংরা উপত্যকায় চিত্রকরেরা কি বর্ণবিন্যাসে কি কোমল-ভাবের বিকাশে কি মূর্ত্তির নৈসর্গিক-ভাব ফুটাইয়া তুলিতে, যে ক্ষমতার নিদর্শন দেয়, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। লাহোর মিউসিয়মে কলিকাতা আর্ট-স্কুলে এবং জয়পুর মহারাজার প্রাসাদে এবম্বিধ অনেকগুলি চিত্র সংগৃহীত আছে।

মোগলগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পরে বাদসাহগণ পারস্যের অনুরূপ অলঙ্কৃত অক্ষর প্রচলন করিবার জন্য এদেশে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং পারস্যের হস্তলিখিত কোরাণের আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ মনুষ্য-চিত্রাঙ্কনের বিরোধী হইলেও বাদসাহগণের মধ্যে অনেকেই অলঙ্কৃত কার্শি অক্ষর-লিখনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উদার-হৃদয় বাদসাহ আকবর বলিতেন, "অনেকে মনুষ্যচিত্রাঙ্কনের বিরোধী হইলেও আমি উহার বিরোধী নহি। যাহারা চিত্রকর, তাহারা ঈশ্বরকে বিশেষ ভাবে সন্দর্শন করে; কেন না তাহারা ঠিকই বুঝিতে পারে, যে মূর্ত্তির হস্তপদাদিঅঙ্কন সকলই তাহাদের সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু অঙ্কিত মূর্ত্তিতে প্রাণদান, একেবারেই তাহাদের সাধ্যের বহির্ভূত। সে সাধ্য কেবল এক ভগবানেরই আছে।"

দিল্লী বা লক্ষ্ণৌএর চিত্রকরেরা কাগজের উপর চিত্র অঙ্কিত করে, কখন বা হস্তিদন্তের উপর চিত্র ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু কাংরা উপত্যকার চিত্রকরের চিত্রে দেখা যায়, যে স্বর্ণকারগণ অলঙ্কার গড়িতেছে, বণিকেরা উষ্ট্র লইয়া চলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ জানালার অন্তরাল দিয়া রন্ধনরত রাধিকাকে দেখিতেছেন। তাহারা প্রত্যেক সামান্য অতিক্ষুদ্র বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ চিত্র অঙ্কন করে, তাহাতে তাহাদের অঙ্কিতচিত্রে উচ্চ অঙ্গের কলা-বিদ্যার আভাস মিলে। সময়ে সময়ে তাহাদের অঙ্কিত পত্র-পুষ্পের সুন্দর বর্ণচ্ছটা, বিখ্যাত চিত্রকর

রস্কিনের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। পর্ব্বত-নন্দিনী পার্ব্বতী, শিব-গঙ্গা-গণেশ, কুসুমিত-কাননবিহারী মহাদেব এ সকল ছবির ভিতরে তাহারা কল্পনাশক্তির সুন্দর পরিচয় দেয়। দাক্ষিণাত্যে দেবমন্দির-গাত্রে, অজন্তের ও সিংহলের পর্ব্বতখোদিত গুহার ভিতরে যে সকল চিত্র অদ্যাপিও বিরাজমান, তাহা রুচিবিরুদ্ধ হইলেও কোন কোনটি বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক।

বিগত অগষ্ট মাসের Modern Review নামক মাসিক পত্রে কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমার স্বামী ডি, এস, সি, উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করিয়া বিলাত হইতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা লাহোর বোম্বাই জয়পুর ও সিংহলে যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ঐরূপ ভাবে শিক্ষিত চিত্রকর রাবিবর্ম্মার সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে তাঁহার চিত্র সকল উল্লেখ-যোগ্য হইলেও, উহাতে উচ্চ অঙ্গের কল্পনাশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্যমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি এতদুভয়ের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহার অনটন তাঁহার চিত্রে অনুভূত হয়। কলিকাতা আর্ট-স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে তিনি ভারত চিত্রকরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে প্রস্তুত। অবনীন্দ্র বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র। অবনীন্দ্রবাবু মেঘদূত হইতে "নির্ব্বাসিত যক্ষের" "বিমান বিহারি সিদ্ধগণের" ও "সাজাহানের অন্তিম দশার" যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় বিশেষত্ব, কল্পনার মৌলিকতা, ভাবের উচ্ছ্বাস ও চিত্রের সজীবতা, তাঁহার মতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। ভারতে না হইলেও ইংলণ্ডের কলাবিদগণের নিকট অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

এইত গেল চিত্রাঙ্কনের কথা। বৌদ্ধযুগে সিংহলে গয়ায় সারনাথে যাবাদ্বীপেও শ্যামদেশে (যেখানকার শিল্প ভারতীয় বলিতে হইবে) মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ বিদ্যা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঐ সকল মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দর্শককে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। দক্ষিণ ভারতের পিত্তল-মূর্ত্তিতে সুঠাম ও সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হয়। মাদ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত নটরাজ শিবের মূর্ত্তিতে ভারতীয় নৃত্যভঙ্গের ছন্দ সুস্পষ্ট ও সুরক্ষিত বলিয়া মনে হয় এবং বুদ্ধ-দেবের কঠিন প্রস্তর-মূর্ত্তি শান্ত ও কোমল-ভাবেরই সাক্ষী দেয়। প্রাচীন হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির প্রায়ই সন্ধান মিলে না; দিল্লী-প্রদর্শনীর সময় উড়িষ্যা হইতে কৃষ্ণেরই মূর্ত্তি কেবল প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠে খোদাই কার্য্য অতুলনীয়। বর্ত্তমান কালে নেপালে ধাতু-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি সৌন্দর্য্য ও ভাবের বিশেষ পরিচায়ক।

সৌন্দর্য্য তত্ত্ব।—জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই চিত্তকে আকৃষ্ট করে। কল্পনায় যাহা কিছু সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তাহাই ভগবান; তাই তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। অনেকের মতে পৌরাণিক সময়ে পুরাণকারগণের হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি কল্পনায় এই কথাই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। তাই দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিকের প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি কল্পনায় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা পড়িয়াছিল। তাই তাঁহারা কৃষ্ণের বিমোহন মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে কালক্রমে ঐ সকল বিমোহন মূর্ত্তিই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিল। অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসক আমরা। আমরাও বলি, সকল সৌন্দর্য্যের আকর তিনি। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য মনুষ্য সৌন্দর্য্যের বা সৌন্দর্য্য-জাত পরিপুষ্ট যৌবনের অনুরূপ নহে। তাঁহার আকর্ষণের ভিতরে রূপজ-মোহ নাই, ইন্দ্রিয়ের গন্ধ নাই; তাঁহার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে যুগপৎ আকর্ষণ করে—স্তম্ভিত করে। মোহন ও গম্ভীর তাঁহার ভাব। তাঁহার স্বরূপে ভীম ও কান্ত ভাবের অলৌকিক সমাবেশ। হায়! কয়জন লোক তাঁহার সেই অতুলন স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে। প্রেমে আকুল হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, আবার তাঁহার মহান গম্ভীর ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে পিছাইয়া পড়ি। গীতাকার একাদশ অধ্যায়ে তাহাই বলিয়াছেন—

> অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
> ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। ৪৫ শ্লোক

অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার মূর্ত্তি,তাহা দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে আমার মন অচ্ছন্ন হইতেছে। অতএব কৃপা করিয়া তোমার প্রসন্ন রূপ দেখাও।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবাদ।—বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সুবোধ পত্রিকায়, মূল ও তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম তদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বক্তৃতা (খুত্‌বা)।—প্রতি শুক্রবার ও মুসলমানদিগের দুই একটি পর্ব্বদিনে, মধ্যাহ্ন কালের নমাজের অন্তে, খাতিব অর্থাৎ বক্তা পুল্‌পিট হইতে আরব্য ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার ভিতরে মহম্মদ এবং রাজার জন্য প্রার্থনা থাকে। বৎসরের ভিতরে প্রতি শুক্রবারের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থনা, নানা বিখ্যাত বক্তা কর্ত্তৃক রচিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মহম্মদ বলিতেন "বক্তৃতা যত সংক্ষেপ হয়,

তত‍ই ফলপ্রদ। ব্যক্তিগত প্রার্থনা দীর্ঘ হওয়া চাই, কিন্তু নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির পরিচায়ক"। নিজের জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রার্থনা কর ; কিন্তু বক্তৃতা দীর্ঘ হইতে দিও না।" কানপুরের আবদর রহমণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বক্তৃতামালা হইতে তৃতীয় বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "দয়াময় ঈশ্বরের নামে। ঈশ্বরের নাম প্রশংসিত হউক। যিনি আমাদিগকে এই ধর্ম্মের পথ দেখাইলেন, তাঁহাতে সকল প্রশংসা। তিনি যদি পথ না দেখাইতেন, আমরা পথ খুঁজিয়া পাইতাম না। আমি সাক্ষী, যে তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তিনি এক, কেহ তাঁহার সঙ্গী নাই ; আমি তার সাক্ষী। মহম্মদ সত্যবক্তা, ঈশ্বরের ভৃত্য—তাঁহার প্রবক্তা। ঈশ্বর মহম্মদের প্রতি, তাঁহার বংশীয়গণের প্রতি, তাঁহার অনুচরগণের প্রতি, দয়াকরুন —শান্তিবিধান করুন। মনুষ্যগণ! ঈশ্বরকে ভয় কর, বিচার দিনকে ভয় কর, সে দিনে পিতা পুত্রের পুত্র পিতার সাপক্ষতা করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। বর্ত্তমান জীবনে অহঙ্কারী হইও না। বিপথে নীত হইও না। বিশ্বাসিগণ! নমুধার (ব্যক্তিবিশেষ, কাহারও মতে অনুতাপীর) ন্যায় ঈশ্বরের দিকে আইস। তিনি পাপ ক্ষমা করেন, তিনি দয়ালু পাপত্রাতা। তিনি দয়ালু কৃপালু, তিনি রাজা, তিনি পবিত্র, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাময়।"

এই বলিয়া তিনি বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া নীরবে নিজে প্রার্থনা করিয়া পুনরায় মঞ্চে উঠিয়া বলেন "কৃপালু ঈশ্বরের নামে, তিনিই ধন্য। আমরা তাঁহার প্রশংসা করি তাঁহার নিকট সাহায্য চাই, পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁহাতে বিশ্বাস করি। মন্দবাসনা এবং কৃতপাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাঁহার আশ্রয় অন্বেষণ করি। ঈশ্বর যাহার পথপ্রদর্শক, তাহার বিনাশ নাই ; তিনি যাহাকে বিপথে লইয়া যান, কে তাহাকে সুপথে আনিতে পারে। তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তিনি এক, কেহ তাঁহার সাথী নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের সেবক ও প্রবক্তা, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া করুন। মহম্মদ আমাদের সকলের অপেক্ষা উচ্চ। ঈশ্বর মহম্মদের বংশীয়গণের ও অনুচরের প্রতি দয়া করুন—তাহাদিগকে শান্তি দিন। আবু বেকার সাদিক, মিতাচারী ওমার ইবনখাত্তাব, বিশ্বাসী ওথমান, বীর আবু তালেব, আত্মত্যাগী হাসেন হোসেন, উহাদের মাতা গরীয়সী ফতেমা, হামজা, আব্বাস ও অন্যান্য অনুচরের প্রতি শান্তি-বিধান করুন। হে করুণাময় পরমেশ্বর! মুসলমান বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা কর। তুমিই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাক। যাহারা মুসলমানধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করে, তুমি তাহাদের সহায় হও। তাহাদিগকে দুর্ব্বল কর—যাহারা মুসলমানধর্ম্মকে হীনবল করিতে চায়। রাজাকে আশীর্ব্বাদ কর, তিনি যেন প্রজাদিগের প্রতি দয়ালু ও অনুকূল হন। ঈশ্বরের সেবকগণ! ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কৃপা করুন। ঈশ্বরের আদেশে সকলের প্রতি সুবিচার কর, সৎকর্ম্ম কর, আত্মীয়গণের ভিতরে দান কর। অপকর্ম্ম অনিষ্ট ও অত্যাচার করিতে, ঈশ্বর নিষেধ করিতেছেন। তিনি সাবধান করিয়া দিতেছেন, সমনস্ক হও। হে মনুষ্যগণ। মহান ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দিবেন। স্মরণে রাখ, তিনি মহান, মঙ্গলময়, পুণ্যময়, শক্তিময় গৌরবময়।"

তুরস্ক ও মিসরে (খাতিব) বক্তা কাষ্ঠময় তরবারি হস্তে লইয়া বক্তৃতা করেন। রাজ্যের রাজা মুসলমান হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়—

"হে ঈশ্বর! মুসলমান ধর্ম্মের সহায় হও, ইহার স্তম্ভকে সুদৃঢ় কর, অবিশ্বাসকে প্রকম্পিত কর, অবিশ্বাসের সামর্থ্যকে বিনাশ কর। তোমার ভৃত্য—তোমার ভৃত্যের পুত্র—যিনি তোমার বিক্রম ও গৌরবের নিকট অবনত —তুমি যাহার সহায়—আমাদের রাজা আমির সের আলিখাঁ—যিনি আমির দোস্তমহম্মদখাঁর পুত্র, তাঁহাকে রক্ষা কর, তাঁহার রাজত্বকালকে প্রবর্দ্ধিত কর ; তাঁহার ও তাঁহার সৈন্য-সামন্তের সহায় হও। হে ধর্ম্মরাজ, পৃথিবীর অধীশ্বর ভগবন্! মুসলমান সৈন্যদিগের সহায় হও ; যাহারা অবিশ্বাসী ও বহুঈশ্বরবাদী, যাহারা তোমার শত্রু, তোমার ধর্ম্মের শত্রু, তাহাদের সৈন্যগণকে বিচ্ছিন্ন কর।" *

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে ধর্ম্ম বিষয়ে নিষ্ঠা, মহম্মদের উপর অকৃত্রিম অনুরাগ, এক ঈশ্বরে গভীরতম বিশ্বাস, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সারল্য ও আড়ম্বর-শূন্যতা মুসলমান ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

---

* "Notes on Muhammadanism" by Rev Hughes, missionary to the Afgans. Peshewar

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪০৬॥৪
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৯৮॥/৩
সমষ্টি	...	৩২০৫ /৭
ব্যয়	...	৫০১॥ ৭
স্থিত	...	২৭০৩॥/০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
হুসকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩০৩॥/০

২৭০৩॥/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	...	২৫১ ৶৪

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

কোম্পানীর কাগজের সুদ

৫১৶৪

২৫১৶৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৫০
পুস্তকালয়	...	৯।০
যন্ত্রালয়	...	১২০।৶০
গচ্ছিত	...	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৭॥০
সমষ্টি	...	৪০৬॥ ৪

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১২॥ ১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪/৯
পুস্তকালয়	...	১।০
যন্ত্রালয়	...	১৩৫৫৬
গচ্ছিত	...	৮০৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১।/৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৬।/০
সমষ্টি	...	৫০১॥ ৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

১৮২৯ শকের বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়	কলিকাতা	৪৲
শ্রীযুক্ত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	কাশিমবাজার	১২।৶০
" বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	জীবনপুর	৬।৶০
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	বালীগঞ্জ	৩৲
" " সতীশচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
" " গোরীশঙ্কর রায়	কটক	৩।৶০
" " প্রসাদদাস মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
" " বেহারীলাল মল্লিক	ঐ	৩৲
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৩৲
" " দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	১৲
" " কেদারনাথ রায়	ঐ	৩৲
" " রামচন্দ্র মিত্র	ঐ	৩৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সৈয়দাবাদ	১০৲
" " চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	পাকুড়	৩।৶০
" " হরিশ্চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
" " মনোহর মুখোপাধ্যায়	[illegible]রপাড়া	১৬৸০
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেব[illegible]পুর	১০৶০
শ্রীযুক্ত বাবু কিত্তীবাস সরকার	ঝিরপাই	৩৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
প্রথমভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

৭৭১ সংখ্যা

১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ।

গত বারে পৌত্তলিক অপৌত্তলিক উপাসনায় পরস্পর তুলনা করিয়া বলিয়াছি কেন আমরা অপৌত্তলিক উপাসনার পক্ষপাতী। আমার ত মনে হয় না তাহাতে এমন কিছু বলিয়াছি যাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগিতে পারে। প্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনায় ধর্ম্মের আদর্শ যে উন্নত নয়, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল। যার যে ধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস, সেই ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ভক্তের মনে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অন্যায়, এ কে না স্বীকার করিবে? আমার যাহাতে বিশ্বাস তাহাই সত্য, আর তার বিপরীত যাহা কিছু সকলি অসত্য, একেই বলে গোঁড়ামি, এরূপ অনুদারতা মনে স্থান দেওয়া অনুচিত। যেখানে আন্তরিক বিশ্বাস —আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখা যায়, তা অপাত্রে পড়িলেও তাহাতে দোষ ধরা যায় না; যদিও ভ্রমও কুসংস্কার দূর করিবার ইচ্ছা মনে প্রবল হইতে পারে। কিন্তু যেখানে মনে এক মুখে আর, অন্তরে বাহিরে মিল নাই, লোক দেখাইবার জন্য কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান, যাহাদের আচার এইরূপ তাহাদের আচরণ অবশ্য নিন্দনীয়।

বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিতে গেলে আমরা যে ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। আমাদের শাস্ত্রে অধিকার ভেদের কথা আছে। মূর্ত্তিপূজার বিধান অনধিকারির পক্ষে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাঁহারা আরো উচ্চ-পদবীতে উঠিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ব্রহ্মোপাসনাই প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোমরাও যদি মূর্ত্তিপূজাকে ব্রহ্মপূজার সোপান মনে কর, তবে সেই অধঃস্তরেই চিরজীবন পড়িয়া থাকা ঠিক হয় না। ক্রমে সেই সোপান অতিক্রম করিয়া যাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে পার, তাহার উপায় দেখ—সেইরূপ সাধনা অভ্যাস কর। সাধনা বলে যে নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন লাভ করা যায়, সাধু-ভক্তের জীবনে আমরা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাই। আপনারাও উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সৎকার্য্যে রত থাক, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মধ্যান—

পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন হও—এই সকল উপায়েই ব্রহ্ম দর্শন লাভ হয়। উপনিষদে আছে—

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং
পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

এই বচনে জ্ঞান, চিত্তশুদ্ধি ও ধ্যান এই ত্রিবিধ মার্গ সূচিত হইতেছে। যখন জ্ঞান দ্বারা জানিলাম—ব্রহ্ম যিনি তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং—একমেবাদ্বিতীয়ং"—যখন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইল—তখনই ধ্যানযোগে সেই নিবরব্য নিরঞ্জন ব্রহ্মের দর্শন সুলভ হইল। এইরূপ সাধনার অভ্যাস করা চাই—চিরদিনই যদি আমরা নিকৃষ্ট পন্থা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা কোথায়?

যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইয়াছেন—যাঁহারা জানিয়াছেন যে 'পরাবিদ্যা' সেই, যদ্দ্বারা অবিনাশী সত্যস্বরূপকে জানা যায় আর যাঁহারা সেই পন্থা অন্বেষণ করিতেছেন যাহা মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাঁহাদের আমি দু-চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভ্রাতৃগণ! ভগিনিগণ! তোমরা জানিয়াছ—ঈশ্বর সসীম নন—তিনি অনন্ত—দেশেতে অনন্ত কালেতে অনন্ত। তিনি অসীম আকাশে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। উপাসনার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। তিনি যেমন দূর দূরস্থিত আকাশে, তেমনি এখানেই বর্ত্তমান—এখানে থাকিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যেমন সকল জগতের অধীশ্বর, তেমনি আমারও ঈশ্বর। ক্ষুদ্র কীট যে আমি, তিনি আমাকেও বিস্মৃত নহেন। তিনি আমারও পিতা—আমাকেও প্রীতি করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিধান করিয়া আমাকেও আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। 'স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।' উপনিষদের এই মহা বাক্য আমরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখি। এই কথা গুলি শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই হইল, তা নয়, হৃদয়ে অনুবিদ্ধ করিতে হইবে। তা হ'লেই দুঃখ শোকে সান্ত্বনা পাইবে, সকল ঘটনাতেই শান্তি ও আরাম পাইবে। উপাসনার অগ্রে ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করিবে—ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রহ্মোপাসনা হয় না। যেমন কোন মূর্ত্তিপূজক তাঁর মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া পূজা করে, তেমনি আমরা যদি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতারূপে আরাধনা করিতে পারি, তা হ'লেই সে উপাসনা সার্থক হয়; মৌখিক উপাসনায় কোন ফল নাই।

আর একটি কথা। শুধু উপাসনার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম, তাঁর নাম উচ্চারণ করিলাম, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল তা' মনে করিও না। গৃহকার্য্যে কর্ম্মক্ষেত্রে—সকল সময়ে তাঁকে মনে রাখিতে হইবে—সেই হচ্চে ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি? না যদ্‌যদ্‌কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা ব্রহ্মেতেই সমর্পণ করিবে। আমি ধনের জন্য, মানের জন্য, নামের জন্য, লোকের মনোরঞ্জনের জন্য, অন্যের উপর জয়লাভের জন্য কর্ম্ম করি—এ ত অনেকেই করে—এতে আমার পৌরুষ কি—আমার মনুষ্যত্ব কোথায়? ঈশ্বর-উদ্দেশে কর্ত্তব্যসাধনেই আমাদের মনুষ্যত্ব। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরের ধ্যানধারণা করিবে, তাহা নহে; কিন্তু গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্ম আমাদের লক্ষ্য—কাজকর্ম্মে আমরা যতই ব্যস্ত থাকি, আমরা যেন কখন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা জীবনতরী পরিচালিত করিব। সেই কর্ণধার

হাল ধরিয়া থাকিলে আমরা সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমাদের গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিব।

ব্রহ্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে রোগে শোকে—নির্জ্জনে সজনে, কর্ম্মক্ষেত্রে বিষয়-কোলাহলের মধ্যে সকল সময়, সকল অবস্থাতে, সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অন্তরে অনুভব করা—ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। এই ব্রহ্মনিষ্ঠার ফল কি? না অভয় প্রাপ্তি।

যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে-ঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে; অথ সোঽভয়ংগতোভবতি।

সাধক যখন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম কিরূপ? না—"অদৃশ্যে অনাত্ম্যে" অদৃশ্য অশরীরি—তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন—অনিরুক্তে—বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। "অনিলয়নে"—নিরাধার অথচ সর্ব্ব মূলাধার—এই যে ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি ভয়শূন্য হন। এই ভয়াবহ সংসারে নির্ভয় হওয়া কিছু সামান্য কথা নয়। দেখ এখানে কত প্রকার বিভীষিকা চারিদিকে রহিয়াছে—রোগের ভয়—বিপদের ভয়—প্রিয়জন বিচ্ছেদের ভয়—পাপের ভয়—লোকের ভয়—রাজার ভয়—মৃত্যুর ভয়—এই সকল ভয়ের মধ্যে যাহাতে অভয় পাওয়া যায় যদি এমন কোন ঔষধ থাকে, তবে কি তাহা মহৌষধ নহে?

দেখ আমরা লোকভয়ে কি না করি? যাহা অকর্ম্ম তাহা করিতে উদ্যত হই—যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে ভয় পাই। কত সময় সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি—যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা গ্রহণ করিতে ভীত হই—যাহা সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা পালন করিতে ভীত হই। কিন্তু কি ভয় লোকভয়ে? যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার কি ভয়? বিশ্বপতি রাজরাজেশ্বর যাঁর আশ্রয় তাঁহার কি ভয়? পৃথিবীর ইতিহাসে—ভারতের ইতিহাসে আমরা কত কত সাধু সজ্জনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাঁহারা সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন—প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বল সাহস ধৈর্য্য উৎসাহ দেখিয়া আমরা অবাক হই—তাঁহাদের প্রবর্ত্তক কে? কে তাঁদের নায়ক—সেই মহাশক্তিধারী পরমেশ্বর। যাঁর বলে বলীয়ান হইয়া আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার?"

শিখ-ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে পাই? শিখেরা অল্প সময়ের মধ্যে দেখ কিরূপ মহত্ত্ব-শিখরে আরোহণ করিল! শিখদের দ্বাদশ গুরু—গুরু নানক প্রথম, আর গুরু গোবিন্দ শেষ গুরু। নানকের সময় শিখেরা এক ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্র ছিল; ক্রমে যেমন তাহাদের জাতীয় জীবন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; মোগলদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোগলদের তখন বিরাট রাজ্য—প্রভূত বল—অতুল ঐশ্বর্য্য—সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্তের অভাব নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র শিখসম্প্রদায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কখন জয় কখন পরাজয়—এই উত্থান পতনের মধ্য হইতে তাহারা অচিরাৎ এক প্রবল জাতির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিল। তাদের নিয়ামক কে? সেই অলখ নিরঞ্জন বিশ্বেশ্বর, যিনি মৃত্যুর মধ্য হইতেও অমৃত বর্ষণ করেন—অলখ নিরঞ্জন!

মহারব উঠে, বন্ধন টুটে, করে ভয় ভঞ্জন।

সে সময়ে যে বিষমকাণ্ড বাধিয়া গিয়াছিল, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে ?
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ, পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে
বীরগণ জননিরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল
পঞ্চনদীর তীরে।

যখন আমরা ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হই— যখন ধর্ম্মের অনল আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয়—তখন আমাদের কি ভয় ? সাধু যার ইচ্ছা, সাধু যার চেষ্টা, ঈশ্বর তাহার সহায়। কোন পার্থিব শক্তি তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। রাজা তোমাকে কারা-রুদ্ধই করুক, দেশান্তরে নির্ব্বাসিতই করুক, তোমার আত্মশক্তি অপরাজিত। তোমার অন্তরের আলো নির্ব্বাণ হইবার নহে। বন্ধুগণ শ্রবণ কর, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের অন্তরে অভয়-বাণী দিতেছেন। সেই অভয়দাতা বিধাতা পুরুষ—

যিনি নানা কণ্ঠে ক'ন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার ?
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল' তোল' শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির!

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। সত্য অর্থাৎ সত্তা, —তিনি আছেন, কোথায় আছেন ? সর্ব্বত্র —এই মন্দিরে—হৃদয় মন্দিরে, সএবাধস্তাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। তিনি—সর্ব্বকালে বিদ্যমান, এক সময় ছিলেন না—এক সময়ে থাকিবেন না— তাহা নয়,সর্ব্বকালে বিদ্যমান তিনি,—সএ-বাদ্য সউশ্বঃ।

সত্যং—সত্য যে বস্তু তা জড় নহে, জ্ঞান —আমরা যখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞাতসারে কার্য্য করি, তখন জানিতে পারি—আমি জ্ঞান। কিন্তু আমি অপূর্ণ জ্ঞান—কতক জানি, কতক জানি না। সত্য যিনি, তিনি পূর্ণ-জ্ঞান। আমি শক্তিতে অপূর্ণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর ইচ্ছায় বিশ্ব-সংসার বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; তাঁর অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে সমুদয় জগৎ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—সে ইচ্ছার বিরাম হইলে পৃথিবী প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয়।

সত্য যে বস্তু তা আশ্রিত ও পরতন্ত্র নহে—কাহারো ইচ্ছার অধীন নহে—তার কোন অভাব নাই—অতএব পরিপূর্ণ ঈশ্বরই সত্য।

সেই চৈতন্যময় অমৃতপুরুষ, সকল সত্তার সত্তা—সর্ব্বমূলাধার যে পরমেশ্বর, তিনি আমাদের উপাস্য দেবতা। উপাসনার সময় যদি তাঁর সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহলেই উপাসনা সার্থক হয়। ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রহ্মোপাসনা হয় না। মূর্ত্তি-পূজক যেমন মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া পূজা করে, ব্রহ্মকে সেইরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। কিন্তু উপাসনা সাধনা মাত্র—এই সাধনার সিদ্ধি হয়—জীবনে। জীবনের সকল কার্য্যে,সকল ঘটনা সকল অবস্থাতে, যদি সেই সত্যের সত্তা অনুভব করতে পারি, তা হলেই আমাদের জীবন-তরি সরল পথে চলিয়া আমাদিগকে গম্য স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত করে।

সংসারে নানা বিঘ্নবিপত্তি বিভীষিকা প্রলোভন—পাপের প্রলোভন,মৃত্যুর বিভীষিকা। এই ভবসাগরের যে দুই কূল আমরা তার মধ্য দিয়া চলিয়াছি ; একদিকে আলো একদিকে অন্ধকার, অরোগিতা রোগ, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, হর্ষ শোক, মিলন বিচ্ছেদ, জীবন মৃত্যু। জীবনমৃত্যুর মধ্যে যে দুদিন এখানে কাটাইতে হইবে তা কিরূপে যাপন করিব ?

শ্রেয় প্রেয় এই দুইপথ—এক দিক দিয়া স্বার্থ-সাধন—অন্য দিকে পরসেবা। প্রেয় বলে—

হেসে খেলে নেওরে ভাই মনের সুখে।

ইহা অপেক্ষা অদূরদর্শিতা আর কি হইতে পারে ?

প্রেয়ের মন্ত্রণা এই যে,—ধনের জন্য,মানের জন্য—গৌরবের জন্য, শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য যে কোন উপায়ে চেষ্টা কর। পরে এই প্রশ্ন আসে—ততঃ কিং। এ সব তোমার কারায়ত্ত হইল তাতেই বা কি ? শ্রেয় বলে—ঈশ্বরের উদ্দেশে পরসেবা কর। আত্মসংযম অভ্যাস কর—আপনার উপর জয়লাভ কর, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের মঙ্গল সাধন কর, ঈশ্বরের জন্য বিষয় সুখ বিসর্জ্জন কর। ঈশ্বর আমারদিগকে নানা উপায়ে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন—বিপদ প্রেরণ করিয়া—শোকে নিমগ্ন করিয়া, বলিতেছেন আমার কাছে এস—আমি তোমাকে প্রকৃত শান্তি দিব। যাহারা আত্মসুখে রত, তাহাদের কাছে সংসার প্রহেলিকা মাত্র। যখন শ্রেয়কে অবলম্বন করি,তখন সে প্রহেলিকার অর্থ পাই।

তখন বল পাই—শান্তি ও অভয় পাই—মৃত্যুও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না।

হে মূঢ় মানব—কেন শোকে মুহ্যমান, জর্জর বিষাদে ; "যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে—তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা।"

জানো সনোবন্ধুর্জনিতা সবিধাতা। সেই মঙ্গলস্বরূপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন কর, কোন ভয় নাই। হে ভ্রাতৃগণ! হে ভগিনীগণ! আমাদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে ? যখন আমরা জনিয়াছি যে আমাদের পূজার যিনি দেবতা, তিনি মঙ্গলময় পরম দেবতা ; আমরা যেখানে যাই তাঁরই মঙ্গলরাজ্যে বাস করিব, চিরকাল তাঁর আশ্রয়ে থাকিব ; তখন কিসের ভয় ? সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না। মৃত্যুতে যখন বিনাশ ও দুর্গতির আশঙ্কা থাকে, তখনই বাস্তবিক তাহা ভয়ের জিনিস হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যখন দেখি যে মৃত্যুই সেই অমৃতের সোপান, তখন আর কি ভয় ? যদিও সেই মৃত্যুর পরপার হইতে কেহ কখন ফিরিয়া আসিয়া আমারদিগকে কোন কথা বলে নাই,তথাপি ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে অভয় বচন দিতেছেন, যে আমার শরণাপন্ন হও—কোন ভয় নাই।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচঃ।
তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর লহ এক আমারি শরণ।
হরিব সকল পাপভার করিও না শোক অকারণ।

ধর্ম্মজীবন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, যে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—উপাসনার এই দুই অঙ্গ। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহী ধর্ম্ম। আমাদের ব্রত সন্ন্যাস নয়। অরণ্যে গিয়া ঋষিরা যেমন ব্রহ্মসাধন করিতেন, আমাদের বিধান তাহা নয়। বর্ত্তমান যুগের নববিধান এই, যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে—গৃহস্থাশ্রমে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে

হইবে। একদিকে প্রেমভক্তির উৎকর্ষ চাই, অন্য দিকে কর্ত্তব্যসাধন চাই। এই দুয়ের মিলনে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা হয়।

প্রথম কর্ত্তব্য আপনার প্রতি। শরীর-রক্ষা, আত্মোন্নতি, জ্ঞানার্জ্জন, সংযম, সদভ্যাস, ইহাদের প্রভাবেই চরিত্র গঠিত হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আপনার প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিলে চলিবে না; যেমন আপনার প্রতি, তেমনি অন্যের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে। ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া ভালবাসা স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-ভক্তি এই সকল ভাবের ক্ষেত্র সমাজ। এক দিকে আত্মসুখ, আর এক দিকে পর-সেবা, এ দুইই চাই। এই দুয়ে অভেদ সম্বন্ধ। এই দুয়ের যখন মিল হয়—ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য যখন রক্ষিত হয়, তখন পরসেবাতেই আত্মতুষ্টি, কর্ত্তব্যসাধনেই আনন্দ। তখন আর কোন ভাবনা থাকে না। কিন্তু কখন কখন এমন সময় আসিয়া পড়ে, যখন আত্মসুখ ও পরসেবা এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন এই উভয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন দেখিতে হইবে, কোন্‌টা শ্রেয় এবং কোন্‌টা প্রেয়। যিনি প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহারই মঙ্গল। যিনি শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। এই দুয়ের সংঘর্ষের সময় শ্রেয়ের উদ্দেশে আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ-সাধন।

প্রীতির স্থান উচ্চতর হইলেও কর্ত্তব্যেরও স্থান আছে। প্রেম রক্তমাংস প্রাণ, কর্ত্তব্য—অস্থি-হাড়। প্রেম বিনা কর্ম্ম কঙ্কালসার, আবার শুধু ভাবের উপর ধর্ম্ম-স্থাপন ভিত্তিহীন। ভাব ক্ষণস্থায়ী। প্রেম ও কর্ম্ম এই দুয়ের যোগে জীবন। ধর্ম্মকে জীবনে আনিতে হইলে এ দুইই চাই। প্রীতির পরিচয় এই কর্ম্মক্ষেত্রে। কিন্তু প্রীতিলাভ আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রীতি থাক্ বা না থাক্, কর্ম্ম করিতেই হইবে। ঈশ্বরপ্রীতি যদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হয় ত ভালই। কিন্তু প্রীতির অভাবেও জীবন নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে। সমাজে থাকিতে গেলে কর্ম্মসাধন বিনা গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে? গীতার উপদেশ এই যে নিষ্কাম ভাবে ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইবে।

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং।

আমি বলিয়াছি যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন আমাদের ব্রত। কিন্তু ধর্ম্ম কি? কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ। বৈদিক কালে যখন হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন জ্ঞানবাদী ঋষিরা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

> অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সাম অথর্ব্ব বেদ এ সমুদয়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আমাদেরও সেই গম্ভীর উক্তির প্রতিধ্বনি করা আবশ্যক। আমাদেরও ঘোষণা করিতে হইবে যে ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু; বাহ্যক্রিয়া ধর্ম্ম নয়। প্রেম-বিশ্বাস, ন্যায়-সত্য মায়া দয়া, এ সকল ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। বাহ্যিক আচার সোপানমাত্র—উহা বহিরাবরণ (খোসা), তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ধর্ম্ম যে পরিমাণে হৃদয়কে উন্নত ও

পবিত্র করিতে পারে, তাহাতেই তাহার বল পরীক্ষা হয়। আমাদের সমাজে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষেরা উদয় হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, তাঁহাদের জীবনীতে আমরা কি দেখিতে পাই ? সত্য তাঁহাদের ব্রত, ঈশ্বর তাঁহাদের জীবনের ধ্রুবতারা, ব্রহ্মকে তাঁহারা জীবনমিত্র রূপে বরণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহাদের মহত্ব, তাঁহাদের সাধুতা ; এবং এই কারণেই তাঁহারা সাধারণের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। সকলে তাঁহাদের সেই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর ; ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হও, কার্য্যে ন্যায়বান হও, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল হও, নিজে অন্তঃশুদ্ধি লাভে যত্নশীল হও, মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল হইবে।

আপনি ভাল হওয়া—আপনাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ ও উন্নত করা প্রতিজনের প্রধান কর্ত্তব্য। তার পর অপরকে ভাল করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। আপনি ঠিক থাক, সৎকর্ম্মে রত থাক। যদি আপনি ঠিক থাকিতে পার, আপনার চরিত্রের প্রভাবে, নৈতিক বলে অপরকেও ঠিক পথে টানিয়া আনিতে পারিবে। তোমার বাক্যে তোমার কার্য্যে তোমার দৃষ্টান্তে লোকে আকৃষ্ট হইবে। যখন তুমি তোমার চরিত্রের আলোক তুলিয়া ধরিবে, তখন সে উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া যে দুর্ব্বল সে সবল, যে ভীরু সে অভয় হইবে, তোমার বিপন্ন ভ্রাতাগণ ধর্ম্মের পথে,—কল্যাণের পথে উন্নীত হইবে। তুমি আত্মবলে আত্মসাধনগুণে যে আধ্যাত্মিক রত্ন আহরণ করিতেছ তাহা পরসেবায় নিযুক্ত কর। আপনাকে পবিত্র কর, ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন কর, দেখিবে কর্ত্তব্য সকল গঙ্গাস্রোতের ন্যায় সহজে স্যন্দমান হইবে, তাহার কঠোরতা চলিয়া যাইবে, কর্ত্তব্যসাধনে অপার আনন্দ ও উৎসাহসঞ্চার হইবে।

প্রারম্ভে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি,যে যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে,তাঁহার আদেশ বলিয়া পালন করিবে। ফলকামনা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে সকলই সমর্পণ করিবে। আত্মসমর্পণই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ সমর্পণ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, যদি তাঁহার হস্তে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের হাল ছাড়িয়া দেই, কদাপি আমাদের বিনাশ নাই। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থিরভাবে রাখিয়া তাঁহাকে প্রীত করা, নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন করা, ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন জানিবে।

ঈশ্বর-প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন।

গত কয়েক দিনের উপদেশ শ্রবণে আমাদের বিশেষ রূপে হৃদ্‌গত হইয়াছে যে ঈশ্বরেকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই প্রকৃত উপাসনা। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করা, তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতম যোগ নিবদ্ধ করা, সাধনাপ্রভাবে তাঁহার সমীপস্থ হওয়া এ সকলই নিজ নিজ যত্ন-চেষ্টা ও আয়াস সাপেক্ষ। সম্মুখে পবিত্রতম পরমেশ্বর —আর দীন ভক্ত আমি তাঁহার সম্মুখে যোড়করে দণ্ডায়মান। অপার প্রেমের জলধি সম্মুখে বিস্তারিত, আমি আমার অতি ক্ষুদ্র প্রেমকণা তাঁহাকে উপহার দিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্যাকুল। পাপে তাপে

বিষাদে গ্লানিতে কলঙ্কিত, আমি তাঁহার চরণের পূত-বারিতে আত্মার চিরসঞ্চিত কালিমা ধৌত করিবার জন্য লালায়িত। পৃথিবীর ক্ষুদ্র বিষয়ে—নশ্বর রূপলাবণ্যে প্রীতিস্থাপন করিতে গিয়া প্রতারিত আমি এইক্ষণে তাঁহার অগাধ প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া প্রেমের সার্থকতা সম্পাদনার্থ সমুৎসুক। এইত তাঁহার সহিত প্রীতিস্থাপনের ব্যাকুলতার প্রথম অবস্থা। উচ্চে তিনি রহিয়াছেন, অথচ সূর্য্য চন্দ্র বহু সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও যেমন ক্ষুদ্র পৃথিবীর সমুদ্র-জলকে আকর্ষণ করিয়া প্রতিদিন দুইবার করিয়া জোয়ার ভাঁটার সংঘটন করায়, তেমনি তিনি তাঁহার প্রেমরজ্জু দিয়া মনুষ্য হৃদয়কে নিয়তকাল আকর্ষণ করিতেছেন—তাঁহার পবিত্রস্বরূপে তাঁহার সস্নেহ-উদার-বাহুবেষ্টনের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন। কে তাঁর সে টান বুঝিতে পারে, যে তাঁহাকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিয়াছে। আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতে শিক্ষা করিতেছি বলিয়া, তাঁহার মধুর আহ্বান আমাদের সকলের কর্ণকে স্পর্শ করিতেছে; তাই আমরা বাহিরের কোলাহল হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক্ষণে তাঁহার আশ্রয়ে অপার তৃপ্তি লাভ করিতেছি। তিনি এখানে অজস্রধারে প্রীতি-দান করিতেছেন, তাঁহার ভালবাসা মুক্তহস্তে পরিবেশন করিতেছেন, তাই সম্ভ্রমে তটস্থ হইয়া নহে—কিন্তু নির্ভয়ে তাঁহাকে বলিতেছি যে তুমি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু, তোমার সঙ্গে যে মৈত্রী তাহা বড়ই মধুর, জগৎ সে প্রেমের তুলনা কোথায় পাইবে।"

ঈশ্বরের সহিত প্রীতি বন্ধনে আমি একদিকে, আর একদিকে ভূমা পরমেশ্বর; জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, মধ্যে আর কেহ নাই; বাহিরের বস্তুর ব্যবধান নাই। কিন্তু ঈশ্বরের যে প্রিয় কার্য্য-সাধন, তাহা অপরকে লইয়া জনসমাজকে লইয়া। এই প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রথমতঃ আপনাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, হৃদয়ের ভিতরে যে সকল সাধুভাব আছে,তাহা উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। এ জীবন যাহা ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা উদ্দাম ভোগ-বিলাসের জন্য নহে, কিন্তু উহা পরের জন্য, এ ভাব নিয়তকাল স্মরণে রাখিতে হইবে। যদি বৈরাগ্য বলিয়া জগতে কোন মূল্যবান পদার্থ থাকে, তবে তাহা সংসারে থাকিয়া পরসেবায় তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে। সমস্ত দিন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়া যে উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছ, তাহাতে কি তোমার সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ পিতা মাতা, অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয়-স্বজনের প্রাণরক্ষা হইতেছে না; দীনদরিদ্রআতুর অন্ধবধিরদৃষ্টিহীন সহায়হীন তোমার দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা লাভে কি দিনাতিপাত করিতেছে না। সংসারি! তোমরা পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখ দেখি, একথা কি সত্য নয়, যে সেই পরমমাতা—বিশ্বগৃহিণী তাঁহার অনন্ত উদার সদাব্রত—অসংখ্য রন্ধন-শালা জগৎময় প্রমুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্রকন্যা অসংখ্য নরনারীর অন্নপরিবেশন ভার তোমাদের সকলের হস্তে কি অর্পণ করিয়া রাখেন নাই। ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য অরণ্যে যাইতে চাও, ফিরিয়া আইস! সংসারের ভিতরে ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা কর। গঙ্গা নিজে বিশুদ্ধ হইবার আশঙ্কা না করিয়া যেমন তাহার উচ্ছ্বসিত সমস্ত বারিরাশি মহাসমুদ্রে দিবারাত্রি

ঢালিতেছে, তেমনি নিজ পরিবারের উদ্দেশে—আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশে, নিজ গ্রাম ও স্বদেশের উদ্দেশে—সর্ব্বশেষে অপরের উদ্দেশে মুক্তহস্ত হও। অর্থে না পার সামর্থ্য দিয়া, শক্তি না থাকে পরামর্শ দিয়া, কিছুই না থাকে সাধুকার্য্যে উৎসাহ দিয়া, সেবাব্রতে সকলের কল্যাণ সাধন কর। জীবিকার জন্য সমস্তদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে শীর্ণ হইতেছ, মনের শান্তি তিরোহিত হইতেছে, বিষণ্ণ হইও না, সান্ত্বনা লাভ কর। উৎসাহী হও, ধন্য তুমি! বিশ্ব-পরিবেশনের ভার তোমারই হস্তে রহিয়াছে! সাধু সেখ সাদী বলিতেছেন, ধনবান। প্রভূত অর্থ তোমাদের হস্তে রহিয়াছে, ঈশ্বর তোমাকে তোমার সঞ্চিত অর্থের উপর প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখেন নাই; তিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের যে অবসর দিয়াছেন দরিদ্রের ভাগ্যে তাহা সম্ভবপর নহে; পরসেবা গ্রহণ কর, মুক্ত হস্ত হও, পর দুঃখ দূর কর, কঙ্কালবশেষ দরিদ্রের জঠর-জ্বালা নির্ব্বাণ কর, শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইয়া দাও। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। শুদ্ধ সংসারীকে কেন, ঈশ্বর সকলকেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের অবসর প্রদান করিয়াছেন। স্বাধ্বী স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী থাকিয়া সংসারের শৃঙ্খলায়, গৃহধর্ম্ম পালনে, রোগীর শুশ্রূষায়, অতিথি-আত্মীয় সেবায় প্রবৃত্ত থাকুন। এইখানেই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। যুবা চরিত্রকে বিমল রাখিয়া জ্ঞান শিক্ষায়, অর্থোপার্জ্জনে, পাত্রবিবেচনায় স্নেহ মমতা শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে কৃতার্থতা লাভ করুন, শরীরকে নিরোগ রাখিতে অভ্যাস করুন। এইখানেই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। বৃদ্ধ-পঙ্গু সদুপদেশদানে তৎপর হউন; এইখানেই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধন। এইরূপে সকলে নিজে উন্নত হও, অপরকে উন্নত কর, স্বদেশ স্বজাতির ও পরের সেবা কর। একভাবে বলিতে গেলে ঈশ্বরকে প্রীতি করা অন্তর্ম্মুখী-সাধন এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করা বহির্ম্মুখী-সাধন। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে এমনই ঘনিষ্ঠতম যোগ, যে ঈশ্বর-প্রীতি সমধিক প্রবর্দ্ধিত না হইলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে না।

দুর্ব্বল আমরা! আইস আমরা সকলে জোড়করে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলি, হে ভগবন্! তোমাকে ভালবাসিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও, তুমি যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এ সত্য আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও। তোমাকে পাইলেই যে আমাদের দেবত্ব—এবং তোমার প্রিয় কার্য্য-সাধনেই যে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব, এ শিক্ষা আমাদিগকে কৃপা করিয়া প্রদান কর। তোমার নিকট জোড়করে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

জীবাণু-বিদ্যা।

জড় ও জীব বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা লইয়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় জীবাণু-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। অতি অল্প-কাল মধ্যে এই শাস্ত্রটি এত অধিক প্রসার-লাভ করিয়াছে যে, তাহার বিশেষ বিবরণ শুনিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। উদ্ভিদ্‌বেত্তা, রসায়নবিদ্ এবং নিদানতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতই বলিতেছেন, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের সহিত জীবাণু-তত্ত্বের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

এই শিশুবিদ্যার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর সাহেবই (Pasteur) ইহার জন্মদাতা। দুগ্ধে দধি-বীজ দিলে অতি অল্পকাল মধ্যে সমস্ত দুগ্ধ অম্লস্বাদযুক্ত হইয়া দধিতে পরিণত হয়; দ্রাক্ষা বা চিনির রসে কিণ্ব (yeast) দিলেও তাহা মদ্যে পরিণত হয়। এই অভিষবণ ব্যাপারকে (Fermentation) প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ কোন প্রকার রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাষ্টর সাহেব প্রাচীনদিগের এই ব্যাখ্যানে তুষ্ট না হইয়া, গত শতাব্দীর মধ্যকালে বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জানা গিয়াছিল, অভিষবণ কেবলি রাসায়নিক কার্য্য নয়; এক এক জাতীয় অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীব দুগ্ধ ও শর্করাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জীবন ধারণের জন্য তাহারা ঐ সকল জিনিস হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাতেই সেগুলি বিকৃত হইয়া দধিমদ্যাদিতে পরিণত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে জীবনধারণের জন্য যতটা অক্সিজেন লওয়া আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অক্সিজেন জীবাণুগণ আশ্রিত পদার্থ হইতে বাহির করিয়া ফেলে। আশ্রিত বস্তুকে এই প্রকার অনাবশ্যকরূপে বিশ্লিষ্ট করা জীবাণুগণের একটা প্রধান বিশেষত্ব। এই কার্য্য কিপ্রকারে তাহাদের জীবন ধারণের সহায়তা করে, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। জীবাণুসকল কেবল তাহাদের আশ্রিত পদার্থ হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সাধারণ জীবের ন্যায় উহাদিগকে বায়ু হইতেও কিছু কিছু অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়াছে।

শাস্ত্রমাত্রকেই সাধারণতঃ বিশুদ্ধ ও ব্যাবহারিক (pure and mixed) এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। জীবাণুতত্ত্বকে ঐ দুই শ্রেণীর যে—কোনটিতে ফেলিতে পারা যায়। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান হিসাবে ইহা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার (Botany) অন্তর্গত।

ব্যাবহারিক শাস্ত্র হিসাবে দেখিলে ইহাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নানা প্রকার শিল্পবাণিজ্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, যক্ষ্মা, প্লেগ্ ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া পূর্ব্বোক্ত জীবাণু দ্বারাই প্রাণি-শরীরে উৎপন্ন হয়, এবং তামাকের সুগন্ধ ও নানা গব্য মিষ্টান্নের স্বাদুতা ঐ জীবাণুরই কয়েক জাতির (দ্বারা) সুসম্পন্ন হয়। কাজেই জীবাণু-বিদ্যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বাণিজ্য-শিল্প উভয়েই নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

উদ্ভিদ্ সকল কি প্রকারে বায়ুর নাইট্রোজেন (Nitrogen) সংগ্রহ করিয়া দেহস্থ করে, এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া তাহা জানা ছিল না। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে ক্ষেত্রস্থ এক প্রকার জীবাণু বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে। বৃক্ষমূলে বা ক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহাদের সংগৃহীত নাইট্রোজেনই উদ্ভিদ্ সকল গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। কাজেই কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণও জীবাণু-বিদ্যাকে কৃষিশাস্ত্রের অন্তর্গত করিতে চাহিতেছেন।

নানা ব্যাপারে জীবাণুর এই সকল কার্য্য দেখিয়া বহু জীবাণু হইতে বিশেষ বিশেষ জাতিকে পৃথক্ করিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুকে সুকৌশলে পৃথক্ করিয়া, কি প্রকার অবস্থা তাহাদের বংশবৃদ্ধির অনুকূল এবং কি প্রকার অবস্থায় পড়িলেই

বা তাহারা মরিয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক নবতথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

বিশেষ বিশেষ রোগের জীবাণু ধরিতে হইলে তথ্যান্বেষিগণ প্রথমতঃ রুগ্ন প্রাণীর শরীরে যত প্রকার জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া দিয়া থাকেন, এবং পরে তাহাদের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল পাত্র জীবাণুর পুষ্টিকর কোন পদার্থে পূর্ণ রাখা হয়, এবং যাহাতে বাহিরের বাতাস হইতে নূতন জীবাণু আসিয়া পাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারও সুব্যবস্থা থাকে। এই পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় যে কোন বিশেষ পীড়ায় রোগি-শরীরে এক বিশেষ-জাতীয় জীবাণুরই বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তখন ঐ রোগের সহিত এই জীবাণুর নিশ্চয়ই কোন নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্থির হয়। ইহার পর পরীক্ষক ঐ সকল জীবাণুকে সুস্থ প্রাণীর রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই অবস্থায় যদি দেখা যায় যে, প্রাণীটি সেই বিশেষ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন ঐ জীবাণুগুলিকেই উক্ত রোগের উৎপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে।

পীড়ার উৎপাদক জীবাণুকে পৃথক্ করার পর তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বায়ু, মৃত্তিকা, জীবশরীর, বা প্রাণিরক্ত-প্রভৃতি নানা পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি ঐ জীবাণুর স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহা সর্ব্বপ্রথমে স্থির করা হয়, এবং এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, ইহাদের বংশবৃদ্ধির নিয়ম আবিষ্কার করিবার আয়োজন করা হইয়া থাকে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, অপুষ্পক উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি দেখা যায়। এই সকল উদ্ভিদের পত্রাদিতে এক প্রকার বীজাণু (spores) জন্মায়, এবং ইহাই বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িলে, তাহা বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। পরীক্ষায় কতকগুলি জীবাণুর বংশবিস্তার অবিকল অপুষ্পক উদ্ভিদের ন্যায় হইতে দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া জীবদেহের একটি-মাত্র কোষ যেমন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বহু কোষের উৎপত্তি করে, একটিমাত্র জীবাণু-কেও ঠিক ঐ প্রকারে বিভক্ত হইয়া বহু জীবাণুর উৎপত্তি করিতে দেখা গিয়াছে।

যক্ষ্মা রোগের জীবাণুগুলি এ পর্য্যন্ত পরভুক্ (parasit) শ্রেণীর জীব বলিয়া স্থির ছিল। জীবাণুবিদ্ মাত্রেই বলিতেন প্রাণীর রক্তের অনুরূপ উষ্ণতা না পাইলে ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সম্প্রতি ইহাদের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, শীতল স্থানেও ইহারা সজীব থাকিতে পারে, কিন্তু রক্তের উষ্ণতা না পাইলে ইহারা সুস্থ থাকিতে পারে না এবং বংশবিস্তারেরও সুযোগ পায় না।

ধনুষ্টঙ্কার রোগের (tetanus) জীবাণু লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, মৃত্তিকাতেই ইহারা গুপ্তাবস্থায় থাকে, এবং কোন ক্রমে প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় বংশবিস্তারের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেই, পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই সকল ব্যাধি-জীবাণু মৃত্তিকায় থাকিয়া কি প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং প্রাণিদেহ ব্যতীত অপর কোন বস্তুতে বংশবিস্তার করিতে পারে কি না, এই সকল প্রশ্নের আজও সুমীমাংসা হয় নাই।

নানা ব্যাধি-জীবাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ

করিলে, প্রাণী সকল কি প্রকারে পীড়িত হইয়া পড়ে, এবং ইহাদের এই হানিকর কার্য্যে বাধা দিবার কোনও উপায় আছে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য এপর্য্যন্ত অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল, রোগীর শরীর যখন কোটী কোটী জীবাণুতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন বুঝি প্রাণীর শরীরটাকেই উহারা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার ক্ষয় সাধন করে। আজ কাল এই সিদ্ধান্তটিকে সকলে ভুল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জীবাণুগুলি সত্যই নিজেরা সুশীল জীব। ইহারা নিজের শরীর হইতে বা আশ্রিত প্রাণীর শরীর হইতে যে একপ্রকার বিষময় পদার্থ (toxin) নির্গত করে, তাহাই যত অনিষ্টের মূল। প্রাণিদেহের কণাপ্রমাণ অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া লক্ষ লক্ষ জীবাণু বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু ইহারা তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া কি উদ্দেশে বিষময় পদার্থ নির্গত করিয়া আশ্রিত প্রাণীর প্রাণনাশ করে, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

বাহিরের প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য সৃষ্টির সকল বস্তুকেই জগদীশ্বর সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। গাছ যতই দীর্ঘ হয়, তাহার কাণ্ডও ততই কঠিন হয়। প্রবল ঝড়ের আঘাত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য এই বিধান। পুষ্প-পত্রের অঙ্কুরগুলি কত যত্নে বৃক্ষে ঢাকা থাকে। শীতাতপ ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব হইতে রক্ষা করার জন্যই এই সুব্যবস্থা। আকাশ ও মৃত্তিকাস্থ সহস্র সহস্র ব্যাধি-জীবাণুর মধ্যে যখন প্রাণী-মাত্রকেই সর্ব্বদা বিচরণ করিতে হয়, তখন এই সকল বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য কোনপ্রকার বিধান কি প্রাণি দেহে নাই? সত্যই ঐপ্রকার এক সুব্যবস্থা প্রাণিশরীরে ধরা পড়িয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবাণু সকল যখন সেই বিষময় পদার্থ (toxin) উৎপন্ন করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে এক প্রকার বিষঘ্নপদার্থও (Antitoxin) স্বতঃই নির্গত হইয়া পড়ে। রোগীর শরীরে কিছু দিন ধরিয়া ঐ দুই পদার্থের ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলে, এবং শেষে অবস্থা-বিশেষে কোন এক পক্ষ জয়ী হইয়া রোগীকে রোগবর্জ্জিত বা মৃত করিয়া ফেলে।

ডিপথিরিয়া ও প্লেগ্ প্রভৃতি নানা ব্যাধির টিকা দিবার কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এই সকল টিকার বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমে কোন বিশেষ ব্যাধির জীবাণু অতি অল্পমাত্রায় কোনও নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। ইহাতে দেহাভ্যন্তরে যে অত্যল্প বিষের উৎপত্তি হয়, তাহা শরীরস্থ সেই বিষঘ্ন পদার্থ দ্বারা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে একই প্রাণীর দেহে বর্দ্ধিত-মাত্রায় জীবাণু প্রবেশ করাইতে থাকিলে বিষঘ্ন বস্তুটা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া পড়ে, যে তখন পীড়ার জীবাণু প্রাণী-টির কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। এই প্রকার প্রাণীর শোণিতই টিকার বীজ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্য-রক্তের সংস্পর্শে আসিলেই শরীরস্থ বিষময় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কাজেই যখন সেই লোকটি সত্যই রোগাক্রান্ত হয়, তখন বিষ ও বিষঘ্ন পদার্থের সংগ্রামে বিষঘ্নই জয়যুক্ত হইয়া পড়ে।

টিকাদ্বারা প্রযুক্ত বিষঘ্নপদার্থ কি-প্রকারে মনুষ্য দেহে আজীবন সঞ্চিত থাকে,

এই রহস্যের আজও মীমাংসা হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, প্রযুক্ত বিষঘ্ন-পদার্থটা সত্য সত্য প্রাণিদেহে সঞ্চিত থাকে না। ইহা দ্বারা আবশ্যকমত বিষঘ্নপদার্থ প্রস্তুত করিবার একটা অভ্যাস উৎপন্ন হয় মাত্র। কাজেই যখন জীবাণুর আক্রমণে দেহ সত্যই বিষযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন পূর্ব্বের অভ্যাস মত প্রচুর বিষঘ্নপদার্থ উৎপন্ন হইয়া বিষের ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে।

প্রাণিরক্তস্থ শ্বেতকণাগুলি (White blood corpuscles) নানা বিষের উপদ্রব হইতে শরীরকে রক্ষা করে। কণ্ঠনালীর প্রবেশ-পথ এবং হস্তপদাদির সন্ধিস্থল ইহাদের বাসস্থান। নগরের লোকবহুল স্থানে প্রহরী বসাইয়া আমরা যেমন দুষ্টলোকের উপদ্রব হইতে নাগরিকগণকে রক্ষা করি, রক্তের শ্বেতকণাগুলিও সেইপ্রকার শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিয়া, রক্তস্থ দুষ্ট অংশগুলির পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়, এবং শেষে সেগুলিকে একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। কিছুদিন পূর্ব্বে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল, বিষময়পদার্থ টিকার সহিত দেহে প্রবিষ্ট হইলে, বুঝি ঐ শ্বেতকণাগুলিকেই শক্তিশালী করিয়া তুলে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ঐ অনুমান ঠিক্ হয় নাই। শ্বেতকণাসকল যেমন জীবাণু-প্রভৃতি হানিকর পদার্থকে হাতে পাইলেই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে, বিষঘ্নপদার্থও (Antitoxin) ঠিক্ সেইপ্রকারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবাণুবিশেষের ক্ষয় সাধন করে।

ব্যাধি-জীবাণুর নানা অপকারিতার কথা ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ায়, ইহাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আজকাল অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আবার যে সকল জীবাণু মৃত্তিকার উর্ব্বরতাদি বৃদ্ধি করিয়া অশেষপ্রকারে মনুষ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহাদিগকে পালন করিবার জন্যও অনেক কল্পনা চলিতেছে। সূচ্যগ্র-প্রমাণ স্থানে যে জীবাণুর শত-শতটি অনায়াসে বাস করিতে পারে, তাহাদের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। তথাপি লর্ড লিষ্টার-(Lord Lister) প্রমুখ পণ্ডিতগণ জীবাণুর উপদ্রব শান্তির জন্য যে সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রতি বৎসর সহস্র-সহস্র লোক মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইতেছে।

আহার কার্য্যটা প্রাণীর যেমন হিতকর, তেমনি বিপজ্জনক। এক আহারই বাহিরের শত্রুকে ঘরে আহ্বান করিয়া আনে। আজকাল এই বিপদের দিক্‌টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। খাদ্য-পানীয়ের সহিত যাহাতে ব্যাধি-জীবাণু শরীরস্থ হইতে না পারে, তজ্জন্য আজকাল নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, পদার্থের উষ্ণতা ৭০ অংশে পৌঁছিলে, তাহাতে কোন জীবাণুই সজীব অবস্থায় থাকিতে পারে না; এবং তাহা ক্রমে বাড়িয়া ফুটন্ত জলের উষ্ণতা অর্থাৎ ১০০ অংশে উঠিলে তখন জীবাণুর বীজ (spores) পর্য্যন্ত ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যে সকল খাদ্যে ব্যাধি-জীবাণুর অস্তিত্ব সম্ভাবনা থাকে, সে গুলিকে আহারের অনতিকাল পূর্ব্বে বেশ গরম করিয়া লইবার জন্য অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

মৃত্যুর সহস্র সহস্র পথ উন্মুক্ত রাখিয়াও, নানা জাতীয় ব্যাধি-জীবাণুর সৃষ্টিদ্বারা মৃত্যুর আর একটা নূতন পথ উদ্‌ঘা-

টন করার মূলে জগদীশ্বরের কি মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা স্থির করা সত্যই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। জীবাণুগুলিকে দেহশত্রু রূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অপকারিতা ক্ষালনের জন্য দেহে এত সুব্যবস্থা করিবারই বা উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমরা বুঝি না। জগদীশ্বরের শাসন-বিধানের শত শত ব্যাপারের ন্যায়, ইহাও বোধ হয় চিররহস্যময় থাকিয়া যাইবে।

নানা কথা।

ধর্ম্মপ্রচারক।—১০ই আগষ্ট তারিখের Christian lifeএ প্রকাশ যে বর্ত্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন (theological school) ধর্ম্ম-শিক্ষাগারে ছাত্রের সংখ্যা ৭৪০১ জন। বিগত ১৫ বৎসরের ভিতরে উহার বিশেষ তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় নাই। ঐ দেশে ১৮৮০ সালে যে লোকসংখ্যা গৃহীত হয়, তাহাতে ৭৭৫ জনের উপর একজন, এবং ১৯০০ সালের লোকগণনায় ৬৮১ জনের উপর একজন ধর্ম্মযাজকের পরিচয় মিলে। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, যে যাজকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও সুশিক্ষিত যাজকসংখ্যা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। এদেশে চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রসংখ্যা ও হ্রাস পাইতেছে। ইহা যে বাস্তবিকই দেশের দুর্গতির পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

খৃষ্ট-সমাজ।—খৃষ্টান সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা আছে। মতামত পার্থক্যই উহার অন্যতম কারণ। ঐ সকল দলের মধ্যে যাহাতে মিলন হয়, তৎসম্বন্ধে উদারচেতাগণ বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। অবশ্য রোমানকাথোলিকদিগের সহিত মিলন ঘটা সহজে সম্ভবপর নহে।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী—ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হইতে সাধকগণ একে একে বিদায় লাভ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। জীবনে ও সাধনে—ধর্ম্ম, তর্কে বা মতে নহে, একথা অনেকেরই ঠিক হৃদ্‌গত হইতেছে না। সকলে নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এ কথা স্মরণে রাখিতে হইবে, যে আধ্যাত্মিক সম্পদ-বাহুল্য যতদিন না প্রতিব্রাহ্মের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইবে, এবং এরূপ লোকের সংখ্যা ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে প্রবর্দ্ধিত না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। জীবনে নিষ্ঠায় রামতনু বাবুর অদ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল। কয়েক বৎসর হইল, আমরা দেখিয়াছি, যে ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব আদি-ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ভূতলে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় রামতনু বাবু দ্বিতীয়তলে পদচারণা করিতেছেন। জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন, ভূতলে আমার উঠিবার সামর্থ্য নাই জানিয়াও বাটী হইতে আসিয়াছি; কি করিব, আজ মাঘোৎসবের দিন, মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বাড়িতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না, উপরে উৎসব হইতেছে, সব শুনিতে পাইতেছি না বটে, তথাপি এখানে আসিয়া মন তৃপ্তিলাভ করিল, উহার ব্যাকুলতা খর্ব্ব হইয়া আসিল। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ নিষ্ঠার কয়টি নিদর্শন দেখাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ, স্বর্গীয় রামতনু বাবুর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, আমরা আহ্লাদের সহিত উহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মিকী তমসাতীরে বসিয়া গাহিয়া গিয়াছেন,—

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যাণাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

কুসুম-সৌরভ কেবল অনুকূল বায়ুভরেই বিকীর্ণ হয়, কিন্তু মানুষের ধর্ম্মজীবনের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইয়া থাকে। বঙ্গীয় কবিও কহিয়াছেন,—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

তিনিই সুকৃতিমান, যিনি দেশের লোকের মনোমন্দিরে নিত্য সেবা পাইয়া থাকেন। বাহিরের মন্দিরে যাঁহার পূজা হয়, অনেক সময় সে পূজার উপকরণাদি যোগাড় লইয়া বিব্রত হইতে হয়; কিন্তু মনোমন্দিরে যাঁহার আসন, তাঁহার সেবার জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহে ছুটাছুটি করিতে হয় না—ভক্তিচন্দনে প্রেমপুষ্প চর্চ্চিত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালেই সে পূজাকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মানবজগতে সাধারণ মানবচক্ষে তিনি মৃত হইলেও, তাঁহার পার্থিব দেহ ধূলিরাশিতে মিশিয়া গেলেও, তাঁহার জীবনের প্রভাব চিরদিনই মানুষকে ধর্ম্মে ও নীতিতে অনুপ্রাণিত করে।

লাহিড়ী মহাশয় আজীবন শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, বিদ্যার্থিগণের কোমল হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজের

সহিত পবিত্রতা সত্যনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তির বীজও বপন করিতে যত্ন করিতেন। বালকগণের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তি জন্মানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ও লক্ষ্য ছিল। অসত্যকে এবং অন্যায়কে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। নিতান্ত বন্ধু কিম্বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও অন্যায় করিলে তিনি কিছুতেই তাহা নীরবে সহ্য করিতেন না। কবিবর দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

"একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন।"

বাস্তবিক মানুষের মনের উপর এমন নৈতিক প্রভাব যিনি বিস্তার করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ।

ঝটিকাসংক্ষুব্ধ অন্ধকারময় সাগর-বক্ষে পোতাধ্যক্ষ যেমন দূরস্থিত আলোকস্তম্ভের ক্ষীণ স্থিরালোক দেখিয়া আপনার গতি নির্দ্দেশ করে, তেমনি অশেষ দুঃখদুর্দ্দশা-পূর্ণ সংসারসাগরে মানুষ যখন নানা বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া যায়, তখন সাধুপুরুষ-দিগের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে প্রাণে বল আইসে; কেমন ধীর ও স্থির ভাবে তাঁহারা জ্বালা যন্ত্রণা উৎপীড়নাদি সহ্য করিয়াছেন, চিন্তা করিতে গিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, ক্রমে কষ্ট সহ্য করি-বার শক্তি আইসে। লাহিড়ীমহাশয় জীবনে বহু দুঃখ শোক সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঋষির ন্যায় এক-দিনের তরেও তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসের ছায়াপাতে মলিন হয় নাই। আজকাল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি হইয়াছে, এখন আর ব্রহ্মভক্ত-গণ লোকের চক্ষে হেয় নহেন—এখন ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্ব্বস্থানেই পূজিত ও আদৃত। কিন্তু যখন লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অশেষ গঞ্জনা ও পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মগণের সমাজ আছে, স্থান আছে, সব আছে, তখন কিছুই ছিল না। অথচ এই দৃঢ়চিত্ত পুরুষ তখনই ভগবানের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে প্রাণ সবল করিয়া "এক-মেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ ও ছাত্রগণ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া তাঁহাকে চিরকাল দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন; তাঁহারাই বিপদের সময় নানা রূপে তাঁহার যন্ত্রণালাঘব করিতে সযত্ন হইতেন। কিন্তু ভগবানে যিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, পার্থিব দুঃখকষ্টে কি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে? জলযানস্থিত কম্পাসের কাঁটা, তরণী নানা দিকে ঘুরিলেও, প্রবল তরঙ্গে আন্দো-লিত হইলেও, যেমন উত্তর দিকই নির্দ্দেশ করে, তেমনি পৃথিবীতে তিনি নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইলেও, তাঁহার মন, চিরকাল করুণাময় ভগবানের চরণেই নিবদ্ধ ছিল।

১৮৯১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে যান। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আগ্রহে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিবেন, এইজন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। আহ্লাদে তাঁহার ঋষিমূর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এমন আগ্র-হের সহিত কথোপকথন হইল, যাহাতে উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গ সকলেই প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র বাবু প্রস্থানকালে লিখিয়াছিলেনঃ—

১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১।

অনেক বৎসর পরে আজ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সেই যৌবনের স্ফূর্ত্তি উৎসাহ উদ্যম—সেই অটল জ্ঞানস্পৃহা, সেই সকল পুরাণ কথা মনে পড়িল। এখন আর সে ভাব নাই—বার্দ্ধক্যের মুখ-শ্রীতে আর এক অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। রামতনু বাবুর ঠিক বয়স কত জানি না; তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল এখনো সতেজ দেখিলাম—স্মরণশক্তিও জাগ্রত। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহরা পা যদিও পৃথিবীর ধূলি স্পর্শ করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আত্মা আশা ভরসা সকলি স্বর্গের দিকে উন্নত।

"As some tall cliff that lifts its awful form,
Swells from the vale, and midway leaves the storm,
Though round its breast the rolling clouds are spread,
Eternal sun-shine settles on its head."

বিশাল অটল হেন হিমগিরিবর,
মেঘমালা ভেদ করি পরশে অম্বর;
ঘনঘটা ঝঞ্চা বায় ছায় বক্ষোপরে,
অখণ্ড তপন তাপ জ্বলিছে শিখরে।

এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনালেখ্য দর্শনে আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার হয়।

'Lives of great men oft remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.—

'Footprints that perhaps another,
Sailing over life's solemn main
A farlorn and shipwrecked brother
Seeing may take heart again.

Let us then be up and doing,
With a heart for any fate
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."

মহত-চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে ;
রেখে যেতে পারি, ছাড়ি সংসারনিলয়,
কালের সাগর-তটে পদচিহ্নচয়—

সেই চিহ্ন হেরি কোন ভগ্নতরী জন,
দুস্তর ভব-সাগরে করি সন্তরণ,
তখন হৃদয় অতি বিগত ভরসা
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

উঠ তবে লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর,
যা হয় হোক্ না কেন নাহি তাহে ডর।
উঠে পড়ে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম,
শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি—এই সার মর্ম্ম।"

সিদ্ধিলাভ বহু সাধনা সাপেক্ষ। সংসারে দুঃখ কষ্ট অনেককেই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত নীরবে মস্তকোপরি সহ্য করাই মহাপুরুষের লক্ষণ। লাহিড়ী মহাশয় জীবনে বহু পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনটি হইতেই কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করেন নাই। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখিয়া অক্ষতমানে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল এবং পবিত্র জীবনের সংশ্রবে যিনি আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরলতা সত্যনিষ্ঠা ও ভগবৎ প্রেমের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।"

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৪৪৸৶১
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭০৩॥৴০
সমষ্টি	...	৩১৪৮।৶১
ব্যয়	...	৪১৪ ৶১০
স্থিত	...	২৭৩৪।৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩৩৪।৩

২৭৩৪।৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩১১।৶১

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

বড়বাজার পোঃ আঃ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত

১১১।৶১

৩১১।৶১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৪ ৶০
পুস্তকালয়	...	৮॥৴০
যন্ত্রালয়	...	৪৬৲
গচ্ছিত	...	৪॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	২০৲
সমষ্টি	...	৪৪৪৸৶১

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৯৴৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৲
পুস্তকালয়	...	৪৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৪৬৸০
সমষ্টি	...	৪১৪৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুঃপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।
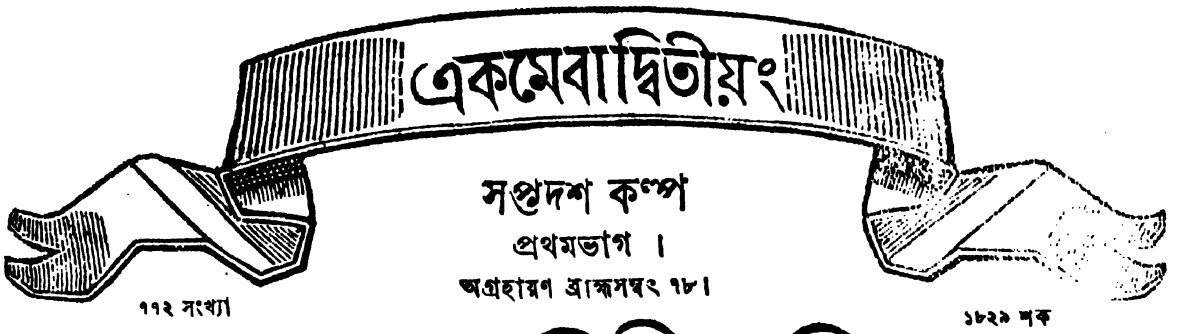
শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
প্রথমভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।
৭৭২ সংখ্যা
১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

অদৃশ্যম গ্রাহ্যং।

পরমেশ্বর অদৃশ্য—চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না—জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দেখা চাই। এমন কত পদার্থ আছে, যাহা আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না—তাই বলিয়া কি তাহাদের অস্তিত্ব নাই? কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর—যেমন তাড়িত—মাধ্যাকর্ষণ—ইথার, তাহাদের অস্তিত্ব কি আমরা বিশ্বাস করি না? উপরে দূরস্থিত নক্ষত্র-রাজি দীপ্তি পাইতেছে, একবিন্দু জলে অসংখ্য কীটাণুপুঞ্জ রহিয়াছে, কিন্তু এ চক্ষে দেখিতে পাই না, দিব্যচক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে হয়—দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব প্রতীতি হয়। পরব্রহ্মও সেইরূপ। সেই নিরাকারকে দেখিতে আমাদের দিব্যচক্ষু চাই—জ্ঞাননেত্র চাই। চক্ষু যদি রোগাক্রান্ত হয়, সে যেমন দেখিতে পায় না, আমাদের মনশ্চক্ষুও সেইরূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী পুরুষ—তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—আমরা অন্ধ, তাই তাঁহাকে দেখিতে পাই না। কে অন্ধ করিয়াছে?—না দুশ্চিন্তা—কুপ্রবৃত্তি—পাপপ্রলোভন—বিষয়াসক্তি। আমরা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টিহীন—দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। যদি সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, সে তাঁহাকে দেখাইতে পারে না—চন্দ্র তারা অগ্নিও তাঁহার সন্ধান দিতে পারে না। তখন গীতোক্ত কথা সপ্রমাণ হয়

> নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
> মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ং।

যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়া আমি লোকের নিকট অপ্রকাশ থাকি—তাই মূঢ় আমাকে দেখিতে পায় না।

তিনি সর্ব্বসাক্ষী জগতের পিতামাতা। এমন কি হইতে পারে, তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে আমাদের দেখা দিবেন না? না—কখনই না—যে চায় সেই পায়। তাঁকে দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে তাঁর দ্বারে আঘাত করিলেই তিনি দ্বার খুলিয়া দিয়া গ্রহণ করিবেন—কেন না

> "সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা"

তিনি আমাদের বন্ধু—পিতা—তিনি বিধাতা—তাঁর প্রেমদৃষ্টি আমাদের উপর সর্ব্বদাই রহিয়াছে। তিনি চান কখন্ আমরা

তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই। আমরা সেই মায়ের ডাক শুনিয়াও শুনি না। আমরা সাধন-ভজনহীন হইয়া আপনারাই তাঁহাতে আমাতে ব্যবধান করিয়া রাখি।

মনে করিয়া দেখুন, আপনাকে পবিত্র না করিলে সেই পবিত্রস্বরূপকে কিরূপে দেখিতে পাইব? কিন্তু পবিত্র হইব কি উপায়ে? সদাচার শুদ্ধাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান উহার উপায়। মহাত্মা ঈশা বলিয়া গিয়াছেন—শুদ্ধান্তঃকরণেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন। আমরা যদি তাঁর দর্শনলাভ করিতে চাই, তবে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইতে হইবে। আমরা পাপে কলঙ্কিত, তাই আধ্যাত্মিক চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ইহা নিশ্চয় সত্য। সাধুসজ্জনের চরিত্র দেখ তাঁহারা তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধ হইয়া থাকি—যে সমস্ত সাধন নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন করি না। সুতরাং যিনি দ্রষ্টব্যের মধ্যে পরম দ্রষ্টব্য, তিনি আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকেন।

হে ভক্ত সজ্জন! তোমরা যদি সেই ভক্তবৎসলকে দেখিতে চাও—হৃদয়ের অন্তঃপুরে গিয়া সেই মায়ের কাছে দাঁড়াও—বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া নির্জনে ধ্যান কর—হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া একান্তচিত্তে ভজনা কর।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্ততস্তু তং
পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

জ্ঞান প্রসাদে পবিত্র হইয়া ধ্যানযোগে তাঁহার দর্শন পাইবে। একটা কথা মনে রেখ, ব্রহ্মসম্মিলনের পূর্ব্বে ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করা চাই। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত সম্মিলন করিতে হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে সমান হওয়া চাই। তাঁহার সঙ্গে সমান হইবার উপায় এই—তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছাকে এক করা।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

শুদ্ধাচারী শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। প্রখর বুদ্ধি যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে, সরল হৃদয়ে তাঁর নিকটে গেলে অচিরাৎ তিনি দেখা দেন। "ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে।"

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় কি না—তাঁর কথা শোনা যায় কি না। কেবল মুখে বলা নয়, হৃদয়ে অনুভব কর। তোমাদিগকে সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, চক্ষু যাঁকে দেখে নাই—কর্ণ যাঁর কথা শুনে নাই, আমরা তাঁকে দেখিয়াছি—জানিয়াছি। হাঁ! আমরা দেখিয়াছি—আমরা তাঁর কথা শুনিয়াছি—সহজ ভাবে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ইহা তোমারদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে—জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিলে বুঝিতে পারিবে, সাকার কল্পনা অনাবশ্যক—মূর্ত্তি গড়িবার প্রয়োজন নাই—আত্মায় আত্মায় সম্মিলন হয়—ইহা জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে যেমন দেবী পূজার বাদ্যোদ্যম গগণভেদ করিয়া উঠিতেছে—তোমরা ও তেমনি উচ্চরবে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম ঘোষণা কর, তোমাদের জীবনে দেখাও সেই নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে তেমনি স্পষ্ট রূপে দর্শন করা যায়—

করতলন্যস্ত আমলকবৎ স্পর্শ করা যায়। সেই সত্যং শিবং সুন্দরং—সেই করুণাময়ী মা তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তিনি হিমালয় হইতে তিন দিনের জন্য আসিয়াছেন, তা নয়। গেলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়, ডাকিলেই তিনি সাড়া দেন। তখন জগৎবাসীর সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারিবে

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে অমৃতধাম-নিবাসী দেবতা সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রপ্তির অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রেয় ও প্রেয়।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ো-
স্তেউভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ যউ প্রেয়ো বৃণীতে।

এক শ্রেয় এক প্রেয়, ইহারা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পুরুষকে আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁর মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

কঠোপনিষদে আছে যে এই উপদেশ নচিকেতা যমের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। নচিকেতার উপাখ্যান এই:—নচিকেতার পিতা বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্বদান সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দান-সামগ্রীর মধ্যে কতকগুলি অস্থিচর্ম্মসার রুগ্ন বন্ধ্যা গাভী দেখিয়া নচিকেতার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন "পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া"—এইরূপ গো দানে পুণ্য লাভ হয় না বরং নিরানন্দ লোকে অধোগতিই হয়। তাই তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।

হে পিতঃ! আমাকে কোন্ যজমানকে দান করিবেন? বার বার জিজ্ঞাসা করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন

মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।

আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করব। বলিয়াই তাঁহার পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইল, হঠাৎ রাগের মুখে কি বলিয়া ফেলিলাম। এই শাপে না জানি আমার পুত্রের গতি কি হইবে? কিন্তু নচিকেতার মন বিচলিত হইবার নহে। তিনি বিস্তর অনুনয় করিয়া পিতাকে বলিলেন, আপনি যখন একবার কথা দিয়াছেন, তখন অন্যথা করা উচিত হয় না।

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে

পিতৃপিতামহদের চরিত অনুধাবধন করিয়া দেখুন—বর্ত্তমানে অন্যান্য সাধু পুরুষদের ব্যবহার দৃষ্টি করুন; তাঁহারা কখন কথা দিয়া সত্য হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। সুতরাং মুনি অগত্যা সম্মতি দিলেন —নচিকেতাও যমালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন যম বাড়ি নাই—তিন দিন নিরাহারে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পরে যমরাজা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, যে একজন ব্রাহ্মণ-অতিথি গৃহে অনশনে তিন দিন রহিয়াছেন। এ ত ভয়ানক কথা। ব্রাহ্মণ অতিথির যথোচিত আতিথ্য না হইলে আশা প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়—প্রিয়বাক্য যজন যাজনের পুণ্যফল নষ্ট হয়—অতএব ইহার কোন প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। তাই তিনি নচিকেতাকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—হে ব্রহ্মণ্! তুমি আমার গৃহে অনশনে তিন রাত্রি যাপন করিয়াছ—ইহার প্রতিকার-স্বরূপ তিনটি বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। নচিকেতা

বলিলেন আমার পিতা গৌতম যাহাতে আমার প্রতি শান্তসঙ্কল্পও সুপ্রসন্ন হন—আমি এখান থেকে ফিরিয়া গেলে আমাকে সস্নেহে অভিবাদন করেন—তিন বরের মধ্যে এই আমার প্রথম বর। যম তথাস্তু বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় বর—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি
উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।
সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্ধধানায় মহ্যং
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই—হে মৃত্যু তুমি ও সেখানে নাই। জরার ও ভয় নাই—লোকে ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া বীতশোক হইয়া স্বর্গলোকে রমণ করে। স্বর্গলোকে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এই স্বর্গলাভের উপযোগী যে অগ্নি, তা তুমি জান। শ্রদ্ধধান যে আমি আমাকে সেই অগ্নির উপদেশ দেও। আমি এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।

যম এই অগ্নিচয়নের সমুদায় প্রণালী শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন এবং প্রীত হইয়া আরো বলিলেন, হে নচিকেতঃ! এই অগ্নি তোমার নামেই অভিহিত হইবে। ইহার নাম—নাচিকেত-অগ্নি রাখা হইবে। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা বলিলেন

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বর স্তৃতীয়ঃ।

প্রেতাত্মা বিষয়ে মনুষ্যের মনে যে সংশয় আছে—কেহ বলে আত্মা অমর কেহ বলে মরণশীল, এ বিষয়ের তথ্য আমাকে বলিয়া দাও এই আমায় তৃতীয় বর। যম উত্তর করিলেন, দেবতারাও পূর্ব্বে এ বিষয়ে সংশয়বাদী ছিলেন। এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সুজ্ঞেয় নহে। নচিকেত! এ বর পরিত্যাগ কর, ক্ষান্ত হও; আমাকে আর উপরোধ করিও না। অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা বলিলেন আপনি বলিতেছেন দেবতারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত, ইহা সুজ্ঞেয় নহে। আপনার মত এ তত্ত্বের উপদেষ্টা কোথায় পাইব? আমি এই বর চাই, অন্য বরের প্রার্থী নহি। যম বলিলেন, শতায়ু পুত্র পৌত্র প্রার্থনা কর, অনেক পশু হস্তি হিরণ্য অশ্ব, বৃহদায়তন ভূমি, যাহা চাও তাহা দিব। যত কাল ইচ্ছা জীবিত থাকিবে; বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হও; আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিব। মর্ত্ত্যলোকে যে যে কামনা দুর্লভ—বিত্ত দীর্ঘায়ু সরথা সতূর্য্যা অপ্সরা তাহা এক এক করিয়া বল, আমি সকলি দিব কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও না। নচিকেতা বলিলেন এই সকল পদার্থ 'শ্বোভাবা' ক্ষণস্থায়ী—আজ আছে কাল নাই। ইহারা সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে—আর এই যে পরমায়ু—সুদীর্ঘ হইলেও ইহা অল্প। হে যমরাজ—এই অশ্ব রথ নৃত্য গীতাদি তোমারই থাকুক।

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎত্বা
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।

বিত্তেতে মানুষের তৃপ্তি নাই—যখন তোমাকে দেখিয়াছি তখন বিত্তের অভাব কি? যতকাল তুমি রাজত্ব করিবে ততকাল আমরা জীবিত থাকিব। তোমার নিকটে আমি এ সকল কিছু চাহি না—আমি যে বর চাহিয়াছি, তাহাই আমার বরণীয়।

তখন নচিকেতার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মৃত্যু উপদেশ দিলেন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃণীতে।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথে আকর্ষণ করে, ধীর ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া লন; যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। নচিকেতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যম আরো বলিলেন, হে নচিকেতঃ তুমি এই প্রিয় ও প্রিয়রূপ কামনা সকল পরিত্যাগ করিলে—এই বিত্তময়ী পন্থা--এই ধনলালসা যাহাতে বহুতর লোক নিমগ্ন হয়, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে—তুমি ধন্য।

এই পৃথিবীতে শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রাম নিয়তই চলিতেছে—এই উভয়ের টানাটানির মধ্যে আমরা বাস করিতেছি—কখন এ-পথে যাইতেছি,কখন ও-পথে যাইতেছি। একদিকে ইন্দ্রিয়সেবা যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেকিতা,অন্য দিকে আত্মপ্রসাদ পুণ্যপ্রভাব ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর। অন্তর-হলাহল মধুরভাষী প্রেয় আসিয়া বলে—

"শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ। বহূন্ পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্।"

তুমি শতায়ুবিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর; হস্তি-হিরণ্য অশ্ব-রথ তোমার জন্য সকলি প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; "সুগন্ধ গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস অহর হ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয়সুখদ গন্ধামোদ সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ অপ্সরাগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে; যত লোক তোমার পদানত হইবে, তুমি সকলের অধীশ্বর হইবে, তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে—তোমার যশঃকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।

সুধীর সাধু যুবা প্রেয়ের এই সকল অনর্থকর মোহবাক্য শুনিয়া গম্ভীর মহাসাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর করিলেন

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।

তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্পকালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে; অন্তক আমার পার্শ্বে লুকায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধনপ্রাণ সকলি হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার অশ্ব রথ নৃত্য গীত তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কখনই হইবে না।

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।"

আমি কোন প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। আমি জানি সংসার আমাকে শান্তি বিধান করে নাই, করিবে না। যদি তোমার নিকটে এমন কোন সুন্দর অমূল্য বস্তু থাকে যাহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর সকলকে প্রীতি করা যায়, যাহা লাভ করিলে অক্ষয় শান্তি লাভ হয়, যদি এমন কোন অমূল্য ধন থাকে, তবে তাহা আমার হস্তে দিয়া আমার ব্যাকুলতাকে শান্তি কর, আমি চিরজীবনের নিমিত্তে তোমার পদানত দাস হইয়া থাকিব। ইহাতে প্রেয় মৌনী হইল ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এই প্রকার অবস্থাতে পতিত হইয়া যখন সেই সাধু যুবা বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিলেন, যখন অসহায় হইয়া জীবন-সহায়কে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শুভ্রবসন মঙ্গলেচ্ছু শ্রেয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন,

তুমি কেন শোকে মগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তিহীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি-সুধাতে জগৎসংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেমময় মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখসন্তপ্ত অশ্রু-ধারাকে প্রেমাশ্রুধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না, যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না, তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর—মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব।

মঙ্গলময় শ্রেয়ের এই সকল নিগূঢ় হিতকর বাক্য শুনিয়া সেই সাধু যুবা পরমশরণ্য পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন এবং আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। সংসার তাঁহার নিকটে এক নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল; তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হইল। তিনি প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরেতে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমৃত লাভ করিলেন।"

শ্রেয় ও প্রেয় ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু হে বন্ধুগণ, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তোমাদের হস্তে।

তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

ধীর ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে ভালমন্দ বাছিয়া লন। তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন কর ত মঙ্গল, আর প্রেয়ের পথে যাও ত অমঙ্গল। তোমাদের আপনাদের উন্নতি অবনতি আপনাদেরই হাতে। তাই শাস্ত্রে বলে মনুষ্য আপনিই আপনার শত্রু, আপনিই আপনার বন্ধু। তোমার কর্ম্মফল—সুকৃত দুষ্কৃত—তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম করিবে, ক্রমে তাহা ভাল কিম্বা মন্দ অভ্যাসে পরিণত হইবে; অভ্যাস হইতে চরিত্র—চরিত্র হইতে ভাগ্য—ইহকাল পরকালের গতি নিরূপিত হইবে। ভাগ্যের নিন্দা করিও না—তোমার ভাগ্যের রচনাকর্ত্তা তুমি নিজেই—এই বুঝিয়া সাবধান হও। যদি কিছু করিতে হয় এখনি কর। আজ যাহা করিতে পার কালিকার জন্য ফেলিয়া রাখিও না। তোমার জীবন-তরির হাল তোমারই হাতে। হাল ধরিয়া থাক ত নৌকা ঠিক পথে চলিবে, আর হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া যাও ত নৌকাডুবি হইয়া মহা বিপদে পড়িবে।

মন যদি ছুটি চলে
ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান
বায়ু যথা তরণী ডুবায়।

প্রেয়ের পথ এইরূপ শঙ্কটাকীর্ণ। আর যদি তোমরা নচিকেতার ন্যায় প্রেয়ের প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর, তবে তোমরাও মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিয়া অমৃত লাভ করিবে—অমৃত লাভ করিবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমরা তোমার উপর অবাত-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থির দৃষ্টি রাখিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট সরল সুপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি এবং জীবনের কর্ম্ম সমাপন করিয়া নির্ভীক চিত্তে তোমার নিকটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি, এইরূপ অনুগ্রহ কর, প্রভু অনুগ্রহ কর।

দুর্গম পথ এ ভব গহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন!
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।
সন্ধ্যাবেলায়, লভিগো কুলায়
নিখিল-শরণ চরণে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পিতৃপূজা।

বেদ-উপনিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতম-যোগ-যুক্ত না হইলেও,বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতে সমুৎপন্ন শারদীয়া মহাপূজা, ব্যাপককাল ধরিয়া আমাদের এই বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আশ্বিনের যে শুভ শুক্লপক্ষে এই জাতীয় মহোৎসব, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বপক্ষ পিতৃপূজার জন্য পরিনির্দ্দিষ্ট। প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মের অব্যবহিত পরেই যদি কেহ আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রীতি-কৃতজ্ঞতার বিমল অঞ্জলি পাইবার অধিকারী থাকেন, তবে তাহা আমাদের পিতা-মাতা ভিন্ন আর অন্য কেহ নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও তারস্বরে তাই ঘোষণা করিতেছেন "পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব"। কিন্তু যে পিতামাতা, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিনিধি, যাঁহাদের করুণা ও সহিষ্ণুতা একত্রে মিলিত হইয়া জীবনপথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন, আমাদিগের কৃতজ্ঞতা কি কেবল ততদিনই তাঁহাদের অভিমুখীন থাকিবে? মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ব্যাকুল-কৃতজ্ঞতার অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্য কি প্রতিধ্বনিত হইবে না? মৃত্যুর সঙ্গেই কি তাঁহাদের সহিত এই অযোগ্য পুত্র-কন্যার সকল সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যাইবে! স্নেহের কোমল বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে! কৃতজ্ঞতার বিমল উচ্ছ্বাস একেবারে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে! তাহা কখনই হইতে পারে না।

হৃদয়কে সরল কর, ইহাই সকল ধর্ম্মের অনুশাসন ও শিক্ষা। প্রতিদিন যেমন ঈশ্বরকে স্মরণ করি, তেমনি তাহার সঙ্গে কি পরলোকগত পিতামাতাকে স্মরণ করিব না? ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঈপ্সিত সংসারের মঙ্গলকার্য্য কি সুসম্পন্ন করিব না? তাঁহারা আমাদের দুর্ব্বল হস্তে যাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের রক্তবিন্দু দিয়া কি এইরূপ ক্ষুদ্র ভ্রাতা-ভগিনীকে পোষণ করিব না? নয়নের অন্তরালে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জীবন্ত ভাবে অনুভব করিয়া সভয়ে কি নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা করিব না? যথাযোগ্য পাত্রে স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিব না?

জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব কি এই সকল চিন্তা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠে না। হায়! যদি পিতৃপিতামহ জননী-পিতৃজননীর জীবন্ত সত্বা—তাঁহাদের মৃত্যুর পরে, এখানে আমরা অনুভব করিতে শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে ভ্রাতৃবিরোধ—কলহ বিবাদ—স্বজনদ্রোহ, লজ্জাতে ম্রিয়মান হইয়াও সংসারক্ষেত্র হইতে কবে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইত।

কর্ত্তব্যরাশি লইয়া আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, ইতর জন্তুর প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হইলে চলিবে না। বিবাহের সময়—সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সন্ধিপথে শাস্ত্রের অনুশাসন এই "শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে" দ্বিপদ চতুষ্পদ সকল

প্রাণীর প্রতি অনুকূল হও; সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর; আত্ম-চিন্তায় ও ঈশ্বর চিন্তায়—ধ্যানধারণা-সমাধিসাধনে তৎপর হও। যাঁহাদের নিকট হইতে জীবন পাইয়াছ, যাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছ, তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে ভিন্ন লোকে গমন করিলেও, অধ্যাত্ম-রাজ্যের অতি সূক্ষ্মতম অথচ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে তুমি এখনও তাঁহাদের সহিত স্নেহ-কৃতজ্ঞতার দ্বিবিধ তন্তুতে বিজড়িত। তাঁহারা যে লোকে থাকুন, তাঁহাদিগকে অতি নিকটে জানিয়া, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতরতার সহিত প্রার্থনা কর; বল তাঁহারা চিরতৃপ্তি লাভ করুন। হৃদয়কে আরও সরসতর ও উদারতর কর। যাঁহারা তোমার কুলে জাত—পুরুষ বা স্ত্রী যাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে তোমার বংশে বা অপরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের বংশলোপ হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আপনার বলিবার আর কেহ নাই, "যেষাং নৈবান্যসিদ্ধিঃ," যাঁহারা তোমার পরিচিত, বা অপরিচিত, সকলেরই আত্মার উদ্দেশে দেবপ্রসাদ ভিক্ষা কর। সকল আত্মার পরমকল্যাণ—চরমশান্তি ভগবানের নিকট হইতে যাচ্ঞা কর। ইহাই এক ভাবে মনুষ্যত্ব সাধন। এ সাধনে পরলোকের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়, আধ্যাত্ম জগতের প্রতি প্রত্যয় জাগিয়া উঠে, এবং উহার সঙ্গে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাব বিমল ও সতেজ হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সত্যসত্যই কি পিতৃলোকে—আমাদের মাতাগণ—তাঁহাদের এই দুর্ব্বল পতিত সন্তানগণের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অপেক্ষা করেন। তাহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য নহে—কেন না তাঁহারা পারলৌকিক জগতে স্বীয় স্বীয় সাধনা বলে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ ত লাভ করিবেনই, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য পিতৃপিতামহচিন্তা প্রতি মনুষ্যের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির চরিত্র অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবে যে জাতীয় রক্ষণশীলতার মূলে যদি কোন শক্তি কার্য্য করে, তবে তাহা দেশপ্রচলিত পিতৃপূজা তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। যে জাতি তাহার পিতৃপিতামহকে সহজে ভুলিতে চাহে না, তাহাদের কার্য্যে পিতৃপিতামহের অনুসরণ আপনা হইতেই স্থান পায়। সমাজের ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারের সময়, এই অন্ধ-অনুসরণ সে জাতিকে একেবারে চূর্ণ হইতে দেয় না। তাই এত বিপ্লবের ভিতর এখনও আমরা দাঁড়াইয়া আছি। যখন জ্ঞানের ক্ষীণালোক বাহির হইতে আরম্ভ হইল, রামমোহন রায়ের আকুল চেষ্টা পূর্ব্ব পিতামহগণের গ্রন্থরাশি উৎভেদ করিয়া সত্য, উপনিষদের জীর্ণ পত্র হইতে বাহির করিয়া দিল। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ ধীরতার সহিত ঐ সকল সত্যরাজি চয়ন করিয়া উহাকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করিল এবং বর্ত্তমান যুগে জাতিনির্ব্বিশেষে উন্নততম সাধকের পক্ষে উহাকে উপসেব্য করিয়া দিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদের প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহারই প্রসাদে এবং তাঁহারই যুক্তি তর্ক বলে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। যদি সত্যের আদর থাকে, জ্ঞানের মর্য্যাদা থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, এই ধর্ম্ম সমস্ত ভার-

জের কেন সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া এক দিন দণ্ডায়মান হইবে।

একই ধর্ম্মের উপাসক, ভ্রাতা ভগিনী আমরা। রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মক্ষেত্র এই ব্রাহ্মসমাজ। ইহারই কার্য্যে তাঁহারা দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। এই অনুকূল সময়ে ও এই পবিত্র স্থানে আইস আমরা সকলে জোড়করে কৃতজ্ঞতাভরে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার শান্তি-সাগরের পবিত্র মলয়-হিল্লোলে আমাদের ধর্ম্মপিতাগণকে সুশীতল করুন। তাঁহাদের আত্মার ক্ষুধা শান্ত করুন। তাঁহাদিগকে সুতৃপ্ত করুন। তিনি আপনার চরণের ছায়াতে নিয়তকাল তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। অদ্যকার দিনে তর্পণ-পক্ষে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা।

বৈদিককালের ব্রাহ্মণগণ, মনু ব্যাস কপিলাদি শাস্ত্রকারগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ, অতুল্যকীর্ত্তি সীতাপতি রামচন্দ্র, পঞ্চ পাণ্ডব সহ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম বিদুর নারদাদি ধর্ম্মবক্তাবর্গ এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত সাধু ও আচার্য্যগণ, উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পরিস্ফুরণস্থল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব এই যে উহা সকল প্রকার বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক মূল ধর্ম্ম লইয়া সমুত্থিত হইয়াছেন। গীতা গ্রন্থ

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

ঋষিভি র্বহুধা গীতং—

ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকে একত্র নিমন্ত্রণ করিবার আশায় ছিল, ব্রাহ্মসমাজ কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সেই পরম দেবতার উপাসনার নিমিত্ত নিঃসঙ্কোচে সকল মনুষ্যকে সমাহ্বান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি একটী মন্দির বলিয়া ধরা যায়, তাহার ভিত্তিমূলপ্রস্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য যেন খোদিত দেখা যাইবে—

অথ ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং।
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥

ঋষিগণ একমাত্র তোমাতেই মন বাক্য ও কর্ম্ম অর্পণ করেন। মৃৎ পাষাণ ইষ্টকাদি যে কোন বস্তুর উপরে পদ রক্ষা কর, তাহাতে এক পৃথিবী আশ্রয় স্থান হয়েন, ইহার অন্যথা হইবে কেন?

ইহারই প্রতিধ্বনি প্রত্যেক শিবপূজকের মুখে বিশ্রুত হয়ঃ—

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

ব্রাহ্মসমাজরূপ মন্দিরের অন্তপৃষ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের এই মূল বাক্য অঙ্কিত বিবেচনা করা যায়ঃ—

বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলা যায়। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান্ বলেন।

একই পরমাত্মা নানা নামে আরাধিত হয়েন, মনু বাক্যে এমন ধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥

সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ প্রজাপতি মনু বলেন, কেহ ইন্দ্র বলেন, কেহ প্রাণ বলেন এবং অপর কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।

ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ব্রহ্ম নামের সার্ব্বভৌমিকত্ব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ভাগবতোক্ত

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।"

এই তত্ত্ব সুব্যক্ত হইতেছে।

শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে অসম্যগ্‌দর্শী লোকের মনে হইত, শাস্ত্রে যে পরমতত্ত্ব-বোধক ব্রহ্ম শব্দ দেখা যায়, তাহা অর্থবাদ (প্রশংসাপর বাক্য) মাত্র। এক্ষণে জ্ঞাতব্য শাস্ত্র সকল সম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায় সম্যগ্‌দর্শনে প্রত্যয় হইতেছে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন কোন শাস্ত্রেরই অর্থসঙ্গতি হয় না। বর্ত্তমান কালে নানা বিধানে যত শাস্ত্রব্যাখ্যা চলিতেছে, ততই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রচার-দ্বার ব্যায়ত হইতেছে।

যেমন গীতা গ্রন্থে তেমনি যোগবাশিষ্ঠে নিষ্কাম কর্ম্মের বহু উপদেশ আছে।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।"—গীতা

সেই উপদেশের সার। পরন্তু এই কর্ম্মক্ষেত্রে—ধরামণ্ডলের সর্ব্ববিভাগে প্রতিযোগিতামূলক নীতি এবং জয়-পরাজয় লক্ষণোপেত রাজসিক কর্ম্মের এত বাহুল্য হইতেছে যে এক্ষণে—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। গীতা ২।৩৭

এবম্বিধ উগ্রকাম কর্ম্মাত্মক উত্তেজনা বাক্যেরই অধিক প্রচার দেখা যায়। এমত অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াইলেন, আত্মত্যাগী ও ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া সর্ব্বশক্তিতে লোকমঙ্গল সাধনা করিতে হইবে। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি শিরোধার্য্য হইল,

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ। ১১।২০।৮

সাংসারিক কর্ম্মে ক্লিষ্টমনা হইবে না; অত্যন্ত আসক্তও হইবে না, ভক্তিযোগে ঈশ্বর-সেবা বোধে কর্ম্ম কর, তাহাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

নিঃশ্রেয়স বা পরম পুরুষার্থলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। এই পথে চলিতে চলিতে সুখ দুঃখ বন্ধন ও মুক্তির পরিচয় স্পষ্টতর হইতে থাকিবে। তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ সাধনা হইবে এবং ঈশ্বর নিষ্ঠায় ও ঈশ্বর কৃপায় সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল, ইহাতে জানা যাইবে যে,—ব্রাহ্মসমাজ "বিগতবিবাদং"। সর্ব্ব সাধারণ লোকের মধ্যে অবিরোধ অর্থাৎ শান্তি স্থাপন উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু শ্রীমদ্‌গৌড়পাদাচার্য্যের সময় হইতে যে নির্ব্বিরোধ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী বীজরূপে রোপিত হইয়া ছিল, মহাত্মা রামমোহন রায় তাহাতে জল সিঞ্চন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া এই বৃক্ষরূপে শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মূল দেশে যে রস সঞ্চারিত ছিল, শাখা প্রশাখায় তাহারই আস্বাদ মিলিবে, রসান্তর ঘটিবে না। যদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কাহারও বিরোধাভাস ঘটে, তাহাতে এই তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইবে যে "অহম্পূর্ব্বমহম্পূর্ব্বম্" আমি অগ্রে আমি অগ্রে এবম্প্রকারে তিনি বা তাঁহার সম্প্রদায় ধর্ম্মপথে অগ্রগামী হইতে চাহিবেন।

তথাস্তু। ব্রাহ্মসমাজ কাহারও প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের চিরদিনের কথা এই যে অধর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা কর, নতুবা ধর্ম্মের উন্নতি হইবে না, অজ্ঞান অপসারিত কর, নতুবা জ্ঞানের উন্নতি হইবে না।

অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মকে পরাভূত করে। কালে কালে যুগে যুগে ধর্ম্মের এবম্প্রকার গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত নূতন

বিধানে কার্য্য হয়। সেই বিধানে ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে।

ফলতঃ অজ্ঞান ধ্বংস এবং অধর্ম্মের পরাভব আবশ্যক। এতন্নিমিত্ত সর্ব্ব দেশীয় গুরু আচার্য্য ও সর্ব্বভূতহিতেরত সাধুসজ্জনের অবিরাম যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ একনিষ্ঠায় তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন।

বর্ষা ও শরৎ ঋতু চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল। এই কালে এ দেশের লোক কর্ত্তৃক বিবিধ ব্রতের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্ম সমাজেও এই লক্ষণ দেখা যাইবে।

১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে এই আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহের দক্ষিণে প্রথম ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসের মধ্য ভাগে অনন্তচতুর্দ্দশী তিথিতে ইংলণ্ডে মর্ত্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবেশ করেন। তাহার ৬ বৎসর পরে দেবপ্রভাব দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে তত্ত্ববোধিনী-সভা স্থাপন করেন। তাহার ৪ বৎসর পরে ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হয়।

এবম্প্রকারে ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মতত্ত্ব সংস্থাপনরূপ যে এক মহাব্রতের আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই কার্য্য উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে।

শান্তিশতকের কবি শিহ্লন মিশ্র খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

> সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপন
> ক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।

গৃহস্থেরা দুঃসহ শীতবাত তপন ক্লেশ সহ্য করে, কিন্তু তদ্দারা তাহাদের তপস্যা হয় না। যৌবনকালে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় প্রান্তে দুঃসহ শীত-বাত-তপন ক্লেশ সহ্য করিয়া রাজৈশ্বর্য্যশালী গৃহস্থের তপঃ প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সেই পথের পথিক হইতে সকলকে বলিতেছেন। তাহাতে বাস্তবিক তপশ্বি-জন সাধনীয় মহাপুণ্যের অর্জ্জন হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য।

অমূর্ত্ত্য ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা এই উন্নত লক্ষ্যের কতদূর অভিমুখীন হইলাম, ঈশ্বরের বিশাল সত্তা হৃদয়ে কতটা প্রতিভাত হইল, গন্তব্যপথে আমরা বাস্তবিকই অগ্রসর হইতেছি কি না, মধ্যে মধ্যে তাহার সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক। সমুদ্রতরঙ্গ চারিদিকে উথলিয়া উঠিতেছে, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সমুদ্র বক্ষ ফেনিল হইয়া পড়িতেছে, নাবিক তাহার মধ্য দিয়া পোত সঞ্চালন করিয়া চলিতেছে। তাহার সমস্ত মনোযোগ সম্মুখে প্রসারিত মানচিত্রের উপরে—তাহার সমস্ত গণনা গ্রহ-উপগ্রহের সহিত যন্ত্রযোগে নিজ-সংস্থান নিরূপণে। সমুদ্রের ভীষণ কলরব কিছুতেই তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারিতেছে না। যদি পারিত, বিপথে গিয়া গুপ্ত-শৈলের সংঘর্ষণে অর্ণব পোত অচিরে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

নাবিকের কর্ত্তব্য কি, অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে, প্রথম কর্ত্তব্য আত্ম-সংস্থান-নিরূপণে অর্থাৎ কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা স্থির করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কি না, যে দিকে যাইতে হইবে অর্ণব-পোতকে তাহার অভিমুখীন করিয়া পরিচালন করা এবং বায়ুকে আয়ত্তের ভিতরে আনিয়া গতিবেগ প্রবর্দ্ধনের জন্য সেই-ভাবে পাল খাটাইবার আদেশ দান করা।

কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, নাবিক যদি সে সংবাদ না রাখে, তবে কোথায় যাইবে, তাহার নিরূপণই হইতে পারে না। অর্ণবপোত এখন কিছু আর কোন সংকীর্ণ নদীর ভিতরে—বাণিজ্য-বহুল কোন নগরীর ক্রোড়ে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। সে সকল শৃঙ্খল খুলিয়া উন্মুক্ত মহা-সমুদ্রে ভাসিতেছে। আপনার স্থান নিরূপণ করিয়া তবে তাহাকে গন্তব্য-স্থানের দিকে ছুটিতে হইবে।

আমাদের যে এই ক্ষুদ্র দেহতরী, তাহা এতদিন কালপরম্পরাগত বিশেষ ভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এক্ষণে নবালোকের তরঙ্গ তাহার গাত্র দিয়া বহিয়া যাইতেছে, নবভাবের প্রবাহ তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। নূতন চিন্তা নবসাধনা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। আত্ম-জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ এবং কোন দিকেই বা যাত্রা করিবে।

মনুষ্যের এমন অনেক অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন সে কার্য্য করিতেছে, অথচ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কার্য্য করিতেছে। তখন উদ্দেশ্যের সহিত কার্য্যকে মিলিত করিয়া দেওয়াই অপরের কর্ত্তব্য। হিন্দু-সমাজের ভিতরে থাকিয়া আহার বিহারে অন্ধভাবে এমন অনেক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসতেছি, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সদুত্তর দিতে পারি না। সেই জন্য আত্মজিজ্ঞাসা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্ধ ও মৃতভাবে কার্য্য করিবার জন্য মানবাত্মার এখানে জন্ম হয় নাই। সকল কার্য্য তাহাকে বিচারের সহিত সজ্ঞানে ও জাগ্রত ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই খানেই মনুষ্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠতা।

পরব্রহ্মের উপাসক হইয়াছ। সাধনমার্গ হয়ত সহজ মনে কর। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহার সাধনার প্রকৃত পন্থা কি জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত অনেক সময়ে সদুত্তর দিতে পারিবে না। কিন্তু এই খানেই তোমার আত্ম-সংস্থান নিরূপণ প্রয়োজন। যদি অসমর্থ হও, কেন ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া মিলিত হইয়াছ, কোন্ মুখে যাইবে যদি তাহার সদুত্তর দিতে না পার, তবে ভ্রান্ত নাবিকের ন্যায় তোমারও যাত্রা উদ্দেশ্য বিহীন, দিগ্‌বিদিগ্ শূন্য; তোমার ব্রহ্মপূজা শূন্যপূজার নামান্তর মাত্র।

প্রতি সপ্তাহে যে বৈদিক মন্ত্রে এখানে বসিয়া পূজা কর, তাহারই ভিতরে সকল সন্ধান পরিস্ফুট ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখ না, তাই হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। আমরা অগ্নির উপাসক নহি, কিন্তু "যোদেবোঽগ্নৌ" যিনি অগ্নির ভিতরে রহিয়াছেন, আমরা জলের উপাসক নহি, কিন্তু যিনি জলে রহিয়াছেন, সুশীতল বারি যাঁহার স্নেহ-ধারা, আমরা জড়োপাসক নহি, কিন্তু যিনি বিশ্বভুবনে বিরাজমান "যঃ বিশ্বভুবনং অবিবেশ" অথচ তাহা হইতেও অতিরিক্ত, ওষধি-বনস্পতির যিনি প্রাণ, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। তাই বলিয়া তিনি কি মরণশীল প্রাণ, তাহা নহে, তিনি সত্যং। সে প্রাণের বিনাশ নাই। তিনি কি অন্ধ শক্তি, তাহা নহে তিনি জ্ঞানং। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তির কথঞ্চিৎ বিকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের আবর্ত্তনে। পশু পক্ষীর কলরব, কীটাণু হইতে উন্নততম জীবের যে উদ্দাম নৃত্য-বিহার, তাহাদের আনন্দ-প্রবাহের মূল নির্ঝর কোথায় না তাঁহাতে, মানবাত্মার প্রেমানন্দের আকর কে, না তিনি। তবে তিনি কি কেবল দূরদূরান্তরে—অগ্নি বায়ু বিশ্বভুবন ওষধি বনস্পতির অন্তরালে সঙ্গো-

পানে স্থিতি করিবেন ; আমাদিগকে দর্শন দিবেন না। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কি কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই ? তিনি কি জড়-বস্তুর অন্তরালে বিরাজিত থাকিবেন ? আমাদের সঙ্গে তাঁহার কি গাঢ়তর যোগ নাই ? বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে না। উপাসনার মন্ত্রের ভিতরেই দেখিবে-"পিতা নোঽসি" তিনি আমাদের পিতা, সবিতা, মাতা সকলই। যখন পিতা বলিয়া তাঁহাকে প্রতীতি করি তখন বুঝিতে পারি ধর্ম্মরাজ্যের শিক্ষক ও রাজা তিনি উভয়ই। যখন মাতা বলিয়া তাঁহাকে দর্শন করি, তখন জানিতে পারি, অপার তাঁহার প্রেম ও করুণা। আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানগণের জন্য তিনি তাঁহার সকরুণ-বাহু বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

তুমি কে, এখন কোথায় আসিয়াছ, বুঝিতে পারিলে। তুমি আর অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির উপাসক নহ। কিন্তু তাহাদের অন্তর্যামী বিধাতার পুত্র, সেবক ও উপাসক। কোথায় যাইবে ? ব্রহ্মই তোমাদের গম্যস্থল, তিনিই তোমার পিতা মাতা বন্ধু সকলই ; তিনিই তোমার শান্তি নিকেতন।

অতএব সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষণ্ণ হইও না। পরমপিতার কর্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর। "সমনস্কঃ সদা শুচিঃ" সমনস্ক ও পবিত্র হও। দেখিও যেন চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়। পাপতাপের বন্ধন ছেদন করিয়া, সংসারের মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অগ্রসর হও। তাঁহার করুণা-সমীরণ—তাঁহার প্রেমাশীর্ব্বাদের মলয়হিল্লোল অবশ্যই তোমাকে ব্রহ্মধামে উপনীত করিবে। তিনি যতদিন এখানে রাখেন, নির্লিপ্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর। মুগ্ধ হইলে চলিবে না। জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা বিপথে পতন অবশ্যম্ভাবী। নিয়তকাল তাঁহার নিকট অনুকূল-বায়ু ভিক্ষা কর, সেই ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া থাক, এ ভাবে জীবন তরিকে চালাইতে পারিলে অচিরেই দূর হইতে ব্রহ্মধামের আভাস দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে বলিবে "ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম, অপূর্ব্ব শোভন, ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ম্ময়" এবং সংসার-দগ্ধ সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিতে পারিবে "শোক তাপিত জন সবে চল সকল দুঃখ হবে মোচন।"

সেখ সাদি।

প্রজার সহিত সদ্ব্যবহার কর যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে। বিপদের সময় প্রজাগণই তোমার সৈন্য হইয়া দাঁড়াইবে।

একজন দুর্দ্দান্ত রাজা জনৈক সাধুকে তাঁহার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে, সাধু কহিলেন, হে ভগবন্ ! এই রাজাকে বিনাশ কর। রাজা বলিলেন, এই কি আমার হিতের জন্য প্রার্থনা ? সাধু উত্তরে জানাইলেন, আপনার ও আপনার প্রজাগণের জন্য ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর প্রার্থনা আর কি হইতে পারে ? কিসের জন্য আপনি রাজা ? অত্যাচার করিবার জন্য নহে ; মৃত্যুই আপনার শ্রেয়স্কর।

একজন সাধুকে কোন অত্যাচারী রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার পক্ষে কল্যাণকর কি ? সাধু বলিলেন, দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া। আপনি অত্যাচার করিবার যত অল্প অবসর পান, ততই ভাল। হায় ! জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রা যাহার বাঞ্ছনীয়, মৃত্যুই কি তাহার পরম কল্যাণকর নহে ?

বিষয় কার্য্য করিতে গিয়া নিষ্কলঙ্ক থাকিলে তোমার ভয় কি? রজকেরা মলিন বস্ত্রকেই প্রস্তরের উপর আছড়াইয়া থাকে।

বাণিজ্যের কারণ সমুদ্রযাত্রায় লাভের বিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও সমুদ্র বিপদ-সঙ্কুল। যাহারা কেবলমাত্র নিরাপদ থাকিতে চায়, উপকূল তাহাদেরই জন্য।

সম্পদের সময় আনুগত্যে নহে কিন্তু বিপদের সময় উদ্ধার করিবার জন্য হস্ত প্রসারণেই প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয়।

বিপদে হতাশ হইও না, ঈশ্বরের লুকায়িত দয়া যে কোন্ সময়ে তোমাতে প্রকাশ পাইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বিপদের সময় লোকে পদদ্বয় দিয়া বিপন্নের গলদেশ চাপিতে যায়; কিন্তু সম্পৎকালে লোকের মুখে তাহার প্রশংসা ধরে না।

রাজার সেবা কর, প্রভূত অর্থাগম হইবে, কিন্তু বিপদও অবশ্যম্ভাবী। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমুদ্রগামী বণিক নিজ দেশের উপকূলে ফিরিয়া আইসে, কিন্তু তরঙ্গাঘাতে অনেকেরই জীবন ও ধন বিনষ্ট হয়।

সাধুলোকের পরামর্শ তুচ্ছ করিতেছ; লৌহশৃঙ্খল পরিধান করিবার তোমার আর বড় বিলম্ব নাই। সর্পগর্ত্তে অঙ্গুলি দিতেছ; হায়! তাহার দংশন সহ্য করিবার তোমার শক্তি কোথায়?

যদি সুনাম অর্জ্জন করিবার বাসনা থাকে, দানশীল হও। ঈশ্বর তোমাকে প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর করিয়াছেন এই জন্য যে তুমি ভোগ করিবে ও দান করিবে; তিনি তোমাকে ধনের প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখেন নাই, যে কেবলই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিবে।

প্রজার বৃক্ষ হইতে রাজা একটিমাত্র ফল গ্রহণ করিতে চাহিলে তাঁহার ভৃত্যগণ বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলে। রাজা প্রজার নিকট হইতে চারিটি ডিম্ব লইবার আদেশ দিলে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্রজার সহস্র গৃহপালিত পক্ষী বিলুণ্ঠন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

যদি ঈশ্বরের দয়া পাইতে চাও, অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। অন্যায় করিয়া অপরের হৃদয়ে ব্যথা দিও না, তাহার একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে তোমার সমস্তই জ্বলিয়া যাইবে।

উজির রাজাকে যেরূপ ভয় করে, ঈশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিলে সে নিশ্চয়ই স্বর্গদূত হইতে পারিত।

মরুভূমির উপর প্রবল বাত্যার ন্যায় মনুষ্য জীবন শীঘ্রই চলিয়া যায়। শোক দুঃখ সৌন্দর্য্য মলিনতা সবই যায়, কিছুই থাকে না। অত্যাচারী মনে করিতে পারে যে অপরকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু হায়, সে পাপ অত্যাচারীর কণ্ঠে দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে।

রাজার অভিমতের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করা বড়ই বিপৎ সঙ্কুল। রাজা যদি দিনকে রাত্রি বলেন, আমাকেও বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, তাইত সত্যসত্যই যে চন্দ্র ও সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখিতেছি।

একজন অপরের নিন্দাবাদ করিয়াছিল, তাহাতে সে বলিল ভাই, তুমি আমার যে সকল দোষের কথা বলিতেছ, আমার দোষের মাত্রা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। আমার দোষ আমি যতটা বুঝিতে পারিতেছি, তুমি ততটা অনুভব করিতে পার নাই।

দাসত্বে প্রাচুর্য্য উপভোগ করা অপেক্ষা মোটা রুটি খাইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা গৌরবের।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু মৃত হইয়াছে ইহাতে কি আনন্দ করিব? আমি ত চিরজীবী নহি। আমাকেও যাইতে হইবে।

প্রভুত্ব ও সৌভাগ্য অনেক সময়ে বিদ্যার উপর নির্ভর করে না।

নানা কথা।

সারনাথ।—বারাণসী হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে সারনাথের মন্দির আছে। নিকটে উচ্চ ভূমি, ইষ্টক প্রস্তরে পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ৫ ফুট নিম্নে যে ছাদহীন গৃহাদি বাহির হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যের সুন্দর আভাস রহিয়াছে। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোকে চারিদিক ভাস্বর হইয়াছিল, সেই দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে সারনাথ বৌদ্ধ-বিহারের পত্তন অনুমিত হয়। অনেকগুলি স্তূপ, প্রস্তর-স্তম্ভ, পাষাণের সুন্দর ও মসৃণ মূর্ত্তি, ছত্র ও প্রকোষ্ঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে আরও বাহির হইবে। প্রস্তরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র সরোবরের পরিচয় মিলে। কথিত আছে এইখানে বুদ্ধদেব স্নান করিয়াছিলেন। একটি সুবৃহৎ ভগ্ন স্তম্ভ-গাত্রে সম্ভবতঃ কয়েকটি অনুশাসন খোদিত আছে। যেখানে খনন কার্য্য চলিতেছে তাহার মোট পরিমাণ প্রায় ১৫।২০ বিঘা হইবে। উহাকে বেষ্টন করিয়া যে জলপ্রণালী প্রবাহিত ছিল, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার এক অংশে আধুনিক জৈন মন্দির স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উহার পূর্ব্ব উত্তরে উচ্চ ও অতি স্থূল ভগ্ন ইষ্টকস্তম্ভ গাত্রে প্রস্তরের যে খোদাই কার্য্য রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। মৃত্তিকার ভিতর হইতে গৃহাদি যে বাহির হইতেছে তাহার সৌন্দর্য্য ও নিপুণতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। সমস্ত মৃত্তিকা অপসারিত হইলে সুদূর অতীতের যে কত মুক্তামালী বাহির হইয়া পড়িবে তাহা কে বলিবে? গবর্ণমেণ্ট আবিষ্কার ও রক্ষাকল্পে অর্থব্যয় করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কাশীযাত্রীগণকে আমরা সারনাথ দেখিয়া আসিবার অনুরোধ করি।

শিল্প-বিদ্যা।—হিন্দুরাজত্ব সময়ে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে হিন্দুগণ বিশেষ নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিলেও মোগলবাদসাহগণের সময়ে এ বিদ্যা যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, অলৌকিক সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাহারা উহাকে স্থায়ী করিবার কূট সন্ধান পাইয়াছিল এবং গৃহাদি গঠনের মৌলিকতার যে তাহারা আমাদের বিস্ময়কে জাগাইয়া তুলিবার যে উপাদান ও অনুপম কৌশল বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরে দাঁড়াইয়া মসজিদের গগনস্পর্শী খিলান ও উপরের স্তম্ভদ্বয় নিরীক্ষণ কর, সত্যসত্যই মনে হইবে যেন তাহারা আকাশের দিকে অনন্ত ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। হুমায়ুন ও আকবরের সমাধি-ভবন, সাহজাহান বিনির্ম্মিত তাজবিবির অক্ষয় স্মৃতিমন্দির সন্দর্শন কর, চারিদিকে কি প্রকাণ্ড চত্বর ও উদ্যান, তাহারা যেন গুরু গম্ভীর ভাবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সমাধি-মন্দিরের এত সৌন্দর্য্য! কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের ভিতরে বিলাস নাই, চাঞ্চল্য নাই। রক্ত প্রস্তর এবং দুগ্ধধবল মর্ম্মরের ভিতর হইতে বিষাদের ছায়া বাহির হইতেছে। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে নীরবে নিঃশব্দে তাহার উপর দিয়া পদসঞ্চার করিতে হয়, মৃতের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়। দিল্লী আগরার প্রাচীন দুর্গের মধ্যে প্রবেশ কর। তাহার ভিতরকার মর্ম্মর-প্রাসাদ মতি-মসজিদের অব্যক্ত সৌন্দর্য্য এখনও তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু সকলই শূন্য। ইংরাজরাজ সভ্যজাতিগত সম্ভ্রমের সহিত তৎসমস্ত রক্ষা করিতেছেন। আগরার দুর্গমধ্যস্থ যোধবাই-ভবন মোগল বাদসাহগণের রাজপুত জাতির সহিত মিলন-চেষ্টা ঘোষণা করিতেছে, কি করিয়া মর্য্যাদাদানে বিজিতকে আপনার করিয়া লইতে হয় তাহার অব্যক্ত সাক্ষী প্রদান করিতেছে। ভাস্করের তাড়নে কঠিন মর্ম্মরও যে কমনীয়তা লাভ করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে যে প্রফুল্লিত কুসুম লতাপত্রসহ বিকশিত হইতে পারে, যদি কেহ দেখিতে চান তবে মোগল কীর্ত্তি দর্শন করুন। ২০০ বৎসর হইল মোগল শক্তি নির্ব্বাপিত, কিন্তু তাহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বসংহারক কালের প্রভাবকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।—শ্রীযুক্ত সেখ জমিরুদ্দীন সাহেব নদিয়া জেলার অন্তর্গত গাঁড়াডোব হইতে লিখিয়াছেন, ১৮৯৪ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে আমার স্বদেশী ও ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পার্কষ্ট্রীটে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পরিচয় হইলে তিনি আমাকে বলিলেন;—"যে সমাজেই থাক, ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন কর। তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর ও তাঁহার আরাধনা কর; তাহা হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। যাকে

কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলে, তিনি যেমন সন্তানকে কোলে তুলিয়া লন, তদ্রূপ ব্যাকুল অন্তরে পরম মাতাকে ডাক, তিনিও তোমাকে অচিরে সস্নেহে গ্রহণ করিবেন।" [illegible]রে ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দান করুন এই আশীর্ব্বাদ করিয়া সে দিন আমাকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর ১৩০৭ সালের ২১শে মাঘ সোমবার ৯টার সময়ে তাঁহার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিতে গেলে বলিলেন;—"যো সারা মুলুকো কা মালেক হাঁয়, মাহ উন্‌কা পরস্তিশ করতা হুঁ।" "যিনি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, আমি তাঁহার উপাসনা করি। এই ভূমা মহাপুরুষে সকলের সমান অধিকার।" এই উপদেশ দিতে দিতে তিনি একেশ্বরের ভাবে এমনি নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

১৩১০ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতঃকালে মহর্ষির সহিত তৃতীয় বার সাক্ষাৎ করি। এইবার তিনি বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। অধিক কথা হইল না। হায়! কে জানিত যে এই তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা। তিনি বলিলেন আমিত চলিলু। "তোমাকে আমি অতি আহ্লাদের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" দিতেছি, যত্নের সহিত প্রতিমাসে পাঠ করিও, অনেক শিক্ষা মিলিবে।"

হায়! জীবনে এইরূপ সাধু সজ্জনের সাক্ষাৎ ভাগ্যক্রমে মিলিয়া থাকে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, আশ্বিন মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৩২৸৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৩৪। ৩
সমষ্টি	...	৩৩৬৭৶৬
ব্যয়	...	৬৮০॥/৯
স্থিত	...	২৬৮৬॥/৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ ছয় কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ২৮৬॥/৯

২৬৮৬॥/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২১৪৸৶৩

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত ২০০৲

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন শির হইতে উঠাইয়া লইয়া ব্রাহ্মসমাজে জমা দেওয়া যায় ৩৸৶৩

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র ১৲

২১৪৸৶৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৬ ৶০
যন্ত্রালয়	...	৩০১৸৶০
সমষ্টি	...	৬৩২৸৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৪১৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৭ ৶৩
পুস্তকালয়	...	।৶৬
যন্ত্রালয়	...	২৪৭।/৬
গচ্ছিত	...	৮॥৶৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৩৸৶৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১ ৫৩
সমষ্টি	...	৬৮০॥/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বরপ্রেম।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে অন্তরতম পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়তর।

তাঁর প্রেম ত আমাদের উপর অজস্র বর্ষিত হইতেছে, আমরা কি সেই প্রেমের প্রতিদান করিব না? যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই তাঁহার করুণা, তাঁহার প্রেমের পরিচয়। বারিসাগরে জলচরের ন্যায়, এবং বায়ুসাগরে প্রাণীমাত্রের ন্যায় আমরা তাঁহার প্রেমসাগরে নিমজ্জিত রহিয়াছি। আমাদের জন্মে তাঁহার প্রেমের পরিচয়, বৃদ্ধিতে তাঁহার প্রেম, এবং মৃত্যুতে তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাইতেছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে সেই করুণাময়ের হস্ত মুদ্রিত রহিয়াছে। সুখের দিনে, আনন্দের দিনে তাঁহার করুণা ত দেখিয়াইছি—আবার যখন দুঃখ শোকের দংশনে ক্লিষ্ট হই তখন সেই দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়াও তাঁহার করুণার পরিচয় বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিচিত্র ঘটনাবলির মধ্যে তাঁহার অযাচিত করুণা, তাঁহার অজস্র প্রেমধারা দেখিয়া চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হয়। "যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে তারেও করিছেন প্রেম দান।" আমরা কি এই প্রেমের প্রতিদান করিব না? কিরূপে ইহার প্রতিদান করিব? কোন্ পদার্থ দিয়া? আমাদের প্রেমই তার প্রতিদান। তিনি আমাদের নিকট হইতে আর কিছু চাহেন না—তিনি আমাদের প্রীতি চাহেন। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি পাপী, তুমি অপরাধী, তবু তিনি ত তোমাকে ছাড়িতেছেন না, তুমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে যাইবে? ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমিও ব্রহ্মকে যেন পরিত্যাগ না করি—তিনি আমা কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়ে এই প্রেম প্রদীপ্ত হয় তাঁহার জীবনে আনন্দ,

মরণে অভয়। এই সংসারে কত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি, দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক, পাপ তাপ রহিয়াছে—এই প্রেম সকল বিঘ্ন দূর করে, দুঃখ কষ্ট প্রশমন করে, শোকের অশ্রু মার্জ্জনা করে, পাপ তাপ হরণ করে। এই স্বর্গীয় প্রেমে আমাদের পার্থিব বস্তুর প্রতি প্রেম কি আচ্ছন্ন বা ম্লান হয়? না, ইন্ধন পাইয়া তাহা আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের উপর পড়িয়া যেমন চাঁদের কমনীয় কান্তি প্রসব করে সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমের আভায় পার্থিব প্রেম আরো উজ্জ্বল সুন্দর হয়। জননীর স্নেহ, সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসা, সতীর প্রেম—সেই স্বর্গীয় প্রেমে রঞ্জিত হইয়া নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই প্রেম কি আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিঘ্ন-কারী? না, তাহা নহে। সেই প্রেম আমাদের সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক—আমাদের তাবৎ পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহদাতা। প্রেমবলে আমরা প্রেয়ের কুহক মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যের আদেশ পালন করিতে অসীম বল ও সাহস পাই। যদি বা মোহবশতঃ কখন বিপথে পদার্পণ করি সেই প্রেম-কাণ্ডারীর আশ্রয়ে আবার সৎ-পথে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। ভাগীরথী যেমন হিমালয় হইতে স্যন্দমান হইয়া বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা ও ধন ধান্যে পূর্ণ করে, আমাদের প্রীতি সেইরূপ ঈশ্বর হইতে সংসারক্ষেত্রকে সারবান্ ও ফলবান্ করত ভিন্ন ভিন্ন মার্গে প্রবাহিত হয়।

মৃত্যু কি সেই প্রেমকে হরণ করিতে পারে? না, তাহা নহে। সেই প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়। সংসারের আর যে কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন কর না কেন, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তোমার যে প্রিয় সে তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে; হয় সে তোমা হইতে নয় ত তুমি তাহা হইতে বি-যুক্ত হইবে—কিন্তু সেই যে স্বর্গীয় প্রেম তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। যখন আর সকলেই চলিয়া যাইবে তখন সেই প্রেম তোমার সঙ্গের সঙ্গীএবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সেই প্রেমময়ের সহিত আরো গাঢ়তর রূপে সম্মিলন করাইয়া দিবে।

তৃতীয় খণ্ড।

সত্য সুন্দর মঙ্গল।

মঙ্গল।

আমাদের সত্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইয়া এক্ষণে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, অধ্যাত্মবিদ্যা, ন্যায়, তত্ত্ববিদ্যা সেই জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরের ধারণা হইতে রস-শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং মঙ্গলের ধারণা হইতে সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের উৎপত্তি।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে যে নৈতিক ধারণা বদ্ধ তাহা মিথ্যা ও সং-কীর্ণ। যেরূপ ব্যক্তিগত নীতি আছে, সেইরূপ সার্ব্বজনিক নীতিও আছে। মানুষে মানুষে যে সাধারণ সম্বন্ধ, সেত আছেই, তা ছাড়া এক নগরের লোক—এক রাষ্ট্রের লোক বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সকল সম্বন্ধও সার্ব্বজনিক নীতির অন্তর্ভূত। মঙ্গলের ভাব যেখানে লেশ-মাত্র আছে, সেইখানেই নীতির অধিকার। রাষ্ট্রিক জীবনের রঙ্গভূমিতে, এই মঙ্গলের ধারণা, ন্যায় অন্যায়ের ধারণা, সুকৃতি দুষ্কৃতির ধারণা, বীরত্ব দুর্ব্বলতার ধারণা, যেরূপ অনাবৃতভাবে ও বলবৎরূপে প্রকাশ

পায়, এমন আর কোথায় ? নীতির উপর—এমন কি, ব্যক্তিগত নীতির উপর,—লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, ও রাষ্ট্রপ্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার যে প্রভাব সেরূপ প্রভাব আর কোথায় লক্ষিত হয় ? যদি মঙ্গলের সীমা অতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে মঙ্গলকে ততদূর পর্য্যন্তই অনুসরণ করিতে হইবে। সুন্দরের ধারণা যেরূপ আমাদিগকে কলা-রাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, মঙ্গলের ধারণা সেইরূপ আমাদিগকে রাষ্ট্রিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্রেও আনিয়া ফেলিবে। দর্শনশাস্ত্র কোন অপরিচিত নূতন শক্তিকে জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করে না, পরন্তু মানব-প্রকৃতির যে সকল মহতী অভিব্যক্তি দর্শনশাস্ত্র সেই সকল অভিব্যক্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে না। যে দর্শনশাস্ত্র নীতি-তত্ত্বে পর্য্যবসিত না হয় তাহা দর্শন নামের যোগ্য কি না সন্দেহ; এবং যে নীতি অন্ততঃ সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত না হয়, সে নীতি নিতান্তই শক্তিহীন, মানবের দুঃখ-কষ্ট বিপদআপদে সে নীতি কোন সুপরামর্শ দিতে পারে না, কোন নিয়মের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

একথা মনে হইতে পারে—ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে তত্ত্ববিদ্যা ও যে রসতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছি তাহা হইতেই নীতি-সমস্যার মীমাংসা আপনা-আপনি হইয়া যাইবে—কোন্‌টি নীতি, কোন্‌টি নীতি নহে, সহজেই নির্দ্ধারিত হইবে।

মনে হইতে পারে—আমরা যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছি, তাহার দ্বারা মঙ্গলের এই দূর-পরিণাম-স্পর্শী ও বৃহৎ সমস্যাটি পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের সত্যসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ও সুন্দরসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হইতেই, স্বাভাবিক যুক্তিপরম্পরাক্রমেই আমরা নীতিসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব; হয়ত পারিব কিন্তু আমরা তাহা করিব না। তাহা হইলে, আমরা এ পর্য্যন্ত যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রণালী প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত, কোন স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির উপর স্থাপিত নহে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরামর্শ অনুসারে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। পরীক্ষাকার্য্যে যেন আমরা ক্লান্তি বোধ না করি; আধ্যাত্মবিদ্যার প্রণালী যেন আমরা যথাযথরূপে অনুসরণ করি। উহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটে, পুনরাবৃত্তি হয়, এ সমস্তই সত্য; কিন্তু উহা আমাদিগকে সমস্ত বাস্তবতার—সমস্ত জ্ঞানালোকের মূলে লইয়া যায়।

অধ্যাত্মবিদ্যার অনুমোদিত প্রণালীর মূলসূত্রটি এই :—প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র, উদ্ভাবন করে না, উহা নির্দ্ধারণ করে ;—যে জিনিসটি যাহা, তাহারই বর্ণনা করে। এস্থলে জিনসটি কি,—না, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস। অতএব মঙ্গল-সম্বন্ধে, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসটি কি—আমাদের নিকট ইহাই প্রধান সমস্যা।

এক দিক্ দিয়া মানবজাতি এবং অপর দিক্ দিয়া দর্শনশাস্ত্র যাত্রা আরম্ভ করে—এ কথা আমরা বলি না। দর্শনশাস্ত্র মানবজাতির ব্যাখ্যাকর্ত্তা। মানবজাতি যাহা কিছু বিশ্বাস করে ও চিন্তা করে (অনেক সময়ে আপনার অজ্ঞাতসারে) দর্শনশাস্ত্র তাহাই সঙ্কলন করে, ব্যাখ্যা করে, স্থাপনা করে। উহা সমগ্র মানব-প্রকৃতির যথাযথ ও পূর্ণ অভিব্যক্তি। যে মানব-প্রকৃতি প্রত্যেকের

অন্তরে বিদ্যমান, তাহা প্রত্যেকেরই অহং-জ্ঞানে উপলব্ধি হয়; এবং যে মানব-প্রকৃতি অন্যের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা অন্যের বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ পায়। উভয়কেই জিজ্ঞাসা করা যাক্, বিশেষতঃ আমাদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্; সমস্ত মানবজাতি কি চিন্তা করে, অনুসন্ধান করিয়া জানা যাক্। তাহার পর আমরা দেখিব দর্শনের প্রকৃত কাজ কি।

এমন কোন জাতি কি আমাদের জানা আছে যাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, ন্যায় অন্যায়—এই সকলের প্রতিশব্দ নাই? এমন কোন ভাষা কি আছে, যাহাতে, সুখ, স্বার্থ, প্রয়োজন, হিত—এই সকল শব্দের পাশাপাশি—স্বার্থবিসর্জ্জন, নিঃস্বার্থভাব, ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠা—এই সকল শব্দ লক্ষিত হয় না। প্রত্যেক ভাষার ন্যায় প্রত্যেক জাতিও কি স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য ও স্বত্বাধিকারের কথা বলে না?

এইখানে বোধ হয়, কঁদিযাক্ ও হেল্‌ভেস্যসের কোন শিষ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—পর্য্যটকেরা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে যে সকল অসভ্য জাতি দেখিয়াছেন, তাহাদের ভাষার কোন প্রামাণিক অভিধান আমার নিকট আছে কি না?—না, আমার নিকট নাই; কিন্তু আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের উপধর্ম্ম ও কুসংস্কার লইয়া আমাদের দার্শনিক ধর্ম্মমত গঠন করি নাই; কোন দ্বীপবাসী অসভ্যজাতির মানব-প্রকৃতি অনুশীলন করা আবশ্যক, ইহা আমরা একেবারেই অস্বীকার করি। অসভ্যদিগের অবস্থা—মানবজাতির শৈশবাবস্থা, মানবজাতির বীজাবস্থা, উহা মানবজাতির পরিণত অবস্থা নহে। মানবজাতির মধ্যে যে মনুষ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃত মনুষ্য। যেমন, যে মানব-সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত মানব-সমাজ, সেইরূপ যে মানব-প্রকৃতি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত মানব-প্রকৃতি। অ্যাপলো বেল্‌ভিডিয়ার সম্বন্ধে কোন অসভ্য মনুষ্যের মতামত কি, তাহা আমরা জানিবার জন্য লালায়িত হই না। কি কি মূলতত্ত্ব লইয়া মানবের নৈতিক প্রকৃতি গঠিত তাহাও আমরা অসভ্য মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, অসভ্য মনুষ্যের নৈতিক প্রকৃতির সবেমাত্র রেখাপাত হইয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। আমাদের সপ্তদশ শতাব্দির বিপুল দর্শনশাস্ত্র অনেকস্থলে বিবিধ সিদ্ধান্তের অবতারণায় একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে ঈশ্বরই কর্ম্ম-রঙ্গভূমির প্রধান নায়ক, তাহাতে মনুষ্যের স্বাধীনতা একেবারে বিদলিত হইয়াছে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দির দর্শনশাস্ত্র ঠিক্ তাহার বিপরীত সীমায় উপনীত। উহা অন্য ধরণের সিদ্ধান্ত সকল অবলম্বন করিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই;—আদিম মানবের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেই এখনকার সমস্ত মনুষ্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য রুসো অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর—দেখিবে, এই স্বাভাবিক অবস্থার মত-প্রচারক, এক দিকের আতিশয্যে চালিত হইয়া বিপরীত দিকের আতিশয্যে উপনীত হইয়াছেন; বন্য স্বাধীনতার মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে, তিনি ল্যাসিডেমোনিয়া-প্রচলিত সামাজিক চুক্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার কঁডিয়াক একটি প্রতিমূর্ত্তিতে কি করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় ক্রমেক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল তাহাই কল্পনা করিয়া দেখাই-

য়াছেন। প্রতিমূর্ত্তিটি, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরে পরে লাভ করিল, কিন্তু একটা জিনিস লাভ করিল না—সে জিনিসটা মনুষ্যের মন—মনুষ্যের আত্মা। ইহাই তখনকার পরীক্ষা পদ্ধতি। এই সকল আনুমানিক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দেও। সত্যকে জানিবার জন্য সত্যের অনুশীলন আবশ্যক—শুধু কল্পনা করিলে চলিবে না। পরিণত মনুষ্যের বাস্তবিক লক্ষণ ও অবস্থা এখন যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বন্য অবস্থার—আদিম অবস্থার মনুষ্যের কিরূপ প্রকৃতি ও লক্ষণ ছিল, তাহা শুধু অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। অবশ্য বন্যদিগের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শৈশব-অন্ধকারের মধ্যেও দুই একটা বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ পায়, এখনকার ন্যায় উচ্চতর ধর্ম্মবৃত্তির নিদর্শন উপলব্ধি হয়—পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে ইহা আমরা দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার এ স্থান নহে। কিন্তু যাহাতে আমরা প্রকৃত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যথাযথরূপে অনুসরণ করিতে পারি, এই জন্য শিশু ও বন্য মনুষ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া একটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব—সেই বিষয়টি বর্ত্তমানকালের মনুষ্য, প্রকৃত মনুষ্য, পূর্ণবিকশিত মনুষ্য।

এমন কোন ভাষা কিংবা জাতি কি দেখাইতে পার যাহার মধ্যে "নিঃস্বার্থভাব" এই কথাটি নাই? লোকে কাহাকে সাধু ব্যক্তি বলে? যে বিষয়কর্ম্মে খুব দক্ষ ও হিসাবী তাহাকে, না যে আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধেও ন্যায়ধর্ম্ম পালন করিতে সতত ইচ্ছুক—তাহাকে? নিজ স্বার্থের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে লোক-মত ও সুখ-সুবিধার বিরুদ্ধেও কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ—এই ভাবটি যদি কোন সাধু ব্যক্তির চরিত্র হইতে উঠাইয়া লও, তাহা হইলে তাহার সাধুতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। যাহাতে আমার নিজের সুখ হয়, যাহা কিছু আমার নিজের কাজে লাগে তাহাই আমার বরণীয়—এইরূপ মনের প্রবৃত্তি যে পরিমাণে কম কিংবা বেশী হয়, ক্ষীণ কিংবা প্রবল হয়, অল্প কিংবা অধিক স্থায়ী হয়, সেই অনুসারে সাধুতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। খুব সামান্য অবস্থার লোকই হউক, কিংবা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয়ের পাত্রই হউক, যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্বার্থভাব, আত্মোৎসর্গের সীমায় উপনীত হয় তবেই তাহাকে আমরা বীরপুরুষ বলিয়া থাকি। দুই প্রকার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখা যায়—এক প্রকার আত্মোৎসর্গ অপ্রকাশ্য, আর এক প্রকার আত্মোৎসর্গ জ্বলন্ত-ভাবে জগজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রণক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় সাহস ও দেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি যেমন বীরপুরুষ নামে অভিহিত হয়, সামান্য জীবন ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, অসাধারণ ঋজুতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, তাহাকেও আমরা বীর নামে আখ্যাত করি। সকল ভাষাতেই এই সকল শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সুপরিচিত; এবং ইহা হইতেই এই তথ্যের সার্ব্বভৌমতা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয়। এই তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এক বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক;—ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেন আমরা ইহার মূলোচ্ছেদ না করি। স্বার্থপরতাই নিঃস্বার্থপরতার মূল—এই বলিয়া কি আমরা এই নিঃস্বার্থভাবের ব্যাখ্যা করিব? লোকের সহজ জ্ঞান একথায় কখনই সায় দিবে না।

কবিদিগের কোন বিশেষ দর্শন-তন্ত্র নাই। মানুষের মনে ভাবোৎপাদন করিবার জন্য, মানুষ এখন যেরূপ—সেই মানুষের প্রতিই তাঁহারা সম্ভাষণ করেন। কবিগণ, সুনিপুণ স্বার্থপরতার—না, নিঃস্বার্থ সাধুভাবের গুণ কীর্ত্তন করেন? মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার সফলতার জন্য—না সাধুতার স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বার্থত্যাগের জন্য তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে প্রশংসা চাহেন? মানব-আত্মার অন্তঃস্তলে নিঃস্বার্থভাবের ও ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার কি এক আশ্চর্য্য প্রভাব আছে—কবি তাহা জানেন। তিনি নিশ্চয় জানেন, হৃদয়ের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটি উত্তেজিত করিলেই মানব-হৃদয়ে একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিবে—করুণ-রসের সমস্ত উৎস উৎসারিত হইবে।

মানব-জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন কর, সর্ব্বত্রই দেখিবে, লোকেরা বেশী বেশী স্বাধীনতার জন্য ক্রমাগত দাবী করিতেছে। এমন কি মনুষ্য শব্দটি যত দিনকার, এই স্বাধীনতা শব্দটিও তত দিনকার পুরাতন। কি আশ্চর্য্য! লোকেরা স্বাধীনতা লাভের দাবী করিতেছে আর স্বয়ং মনুষ্য কি না স্বাধীনতার অধিকারী নহে! এই স্বাধীনতা শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সুনির্দ্দিষ্ট। ইহার অর্থ এই,—মানুষের বিশ্বাস, মানুষ শুধু প্রাণবান সচেতন জীব নহে, পরন্তু মানুষের ইচ্ছা আছে—যে ইচ্ছা তাহার নিজের—সুতরাং সে ইচ্ছার উপর অপর কাহারও ইচ্ছা জুলুম করিতে পারে না—অপর কাহারও ইচ্ছা নিয়ন্তির ভাবে—এমন কি শুভ নিয়ন্তির ভাবেও মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। তুমি কি কখন কল্পনা করিতে পার,—আসল জিনিসটা না থাকিলে এই স্বাধীনতা শব্দ ও স্বাধীনতার ভাবটি উৎপন্ন হইতে পারিত? তুমি কি বলিতে চাহ, মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহা শুধু একটা মায়া-বিভ্রমমাত্র। তাহা হইলে বলিতে হয়, মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা-মাত্রই দুর্ব্বোধ্য অতিশয়োক্তি। স্বাধীনতা ও নিয়ন্তির মধ্যে যে মুখ্য প্রভেদ আছে সেই প্রভেদ অস্বীকার করিলে, সকল ভাষার ও সকল জাতিরই প্রতিবাদ করিতে হয়; অবশ্য স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিলে প্রজাপীড়ক রাজাকে নিরপরাধী করা যায়, কিন্তু তেমনি আবার বীরপুরুষকে অবনত ও হীন করিয়া ফেলা হয়। বীরেরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে, সে কি তবে একটা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক ব্যাপার?

(ক্রমশঃ)

বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অথর্ব্ব বেদের মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমে আছে যে মহাশাল শৌনক অঙ্গিরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

কাহাকে জানিলে, হে ভগবন্, সকল জানা যায়?

তস্মৈ স হোবাচ।

অঙ্গিরস তাহাকে বলিলেন

"দ্বে বিদ্যে বিদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।"

ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুই—পরা ও অপরা বিদ্যা।

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা—আর সেই পরা-বিদ্যা যদ্দ্বারা অক্ষর সত্যস্বরূপকে জানা যায়।

তুমি যে বিদ্যার প্রশ্ন করিতেছ তাহা সেই পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা; ঋক্ যজুঃ সামবেদ ইহারা সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পরাবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন সকলের মূল ব্রহ্ম, তেমনি সকল বিদ্যার মূলীভূত ব্রহ্মবিদ্যা। সেই মূল সত্যকে জানিলে আর সকল সত্যের অর্থবোধ হয়। তাহা না জানিতে পারিলে এই যাহা কিছু সকলি প্রহেলিকা তুল্য।

বেদকে আমরা ত শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি—অঙ্গিরস অপরা বিদ্যা বলিয়া কেন তাহার প্রতি কটাক্ষ-পাত করিলেন? তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধ দেখাইতে গেলে বৈদিক উপাসনা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

বেদ আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রের মূল বলিয়া বিদিত, কিন্তু দেখিতে গেলে বৈদিক উপাসনা এখনকার মত কিছুই নহে। বেদে মূর্ত্তিপূজার কোন নিদর্শন নাই। বৈদিক যুগে প্রাকৃতিক দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৈদিক সময়ের ঋষিরা কেবল বাহ্য প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতেন। যত দিন পর্য্যন্ত বাহিরেতেই তাঁহাদের মনের অভিনিবেশ ছিল, তত দিন তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে খণ্ডখণ্ড রূপে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেন। তাঁহারা নবীন নেত্রে অগ্নির আভা, সূর্য্যের প্রভা, উষার সৌন্দর্য্য, মেঘের কান্তি দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল ও আশ্চর্য্যে মোহিত হইতেন এবং ঈশ্বরের সেই সকল অদ্ভুত কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করিতেন। অনন্ত ঈশ্বরকে পরিমিত ভাবে সকলেতেই দেখিতেন। অগ্নির অধিদেবতা স্বতন্ত্র, বায়ুর অধিদেবতা স্বতন্ত্র, মেঘের অধিদেবতা স্বতন্ত্র। যেমন রাজপুরুষদিগের এক এক বিষয়ে অধিকার থাকে, তেমনি প্রত্যেক দেবতার এক এক বিষয়ে অধিকার। যিনি তৃষিত ধরাকে জলসিঞ্চন দ্বারা শীতল করেন তাঁহার বায়ু সঞ্চালনের উপর কোন অধিকার নাই, যিনি সমীরণের মধ্যে থাকিয়া সমীরণকে প্রেরণ করেন তাঁহার সমুদ্রের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যিনি সমুদ্রের কোলাহলের মধ্যে বিরাজ করেন, তিনি নদীর লহরীতে ক্রীড়া করেন না। যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি ধনধান্যের নহেন। এই প্রকারে পূর্ব্বকালে তাঁহারা সেই এক ঈশ্বরকে নানা ভাবে পূজা করিতেন; তাঁহারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা রূপে পরিমিত ভাবে অর্চ্চনা করিতেন। সূর্য্যে চন্দ্রে মেঘে বিদ্যুতে অনলে অনিলে সলিলে সর্ব্বত্রই তাঁহারা দৈবশক্তি, দৈবমহিমা, দৈবসৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেন। দেবতাগণকে তাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া জানিতেন; আর উৎসবের সময়ে, ক্রিয়াকর্ম্মের সময়ে, জয় পরাজয়ের সময়ে, সুখে দুঃখে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিতেন। তাঁহাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে আপন আপন মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন। আনন্দের সময় আনন্দ জানাইতেন, দুঃখের সময় দুঃখ জানাইতেন। তাঁহাদের চক্ষে জল স্থল নভোমণ্ডল অন্তরীক্ষ বিশ্বভুবন দেবতাত্মক ছিল। কখনও সেই দেবতারা যজ্ঞক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্তোতৃবর্গের সহিত একত্রে মধুর হব্য ভক্ষণ করিতেন, কখনও বা তাঁহারা প্রীতি-নিবেদিত দধি-মিশ্রিত সোমরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন রত্ন-

দানে পরিতুষ্ট করিতেন। পুত্রের নিমিত্তে, পশুর নিমিত্তে, শত্রুদিগের উপর জয়-লাভের নিমিত্তে দেবতাদের নিকট তাঁহা-দের প্রার্থনা ছিল। বেদমন্ত্রগুলি প্রাকৃ-তিক দেবতাদের এই প্রকার স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য এখনো তেমনি আছে, সেই শুভ্র বসনা উষা, সেই তরুণ বিভাকর, সেই রতনমণি-খচিত নীলাম্বর তেমনিই রহিয়াছে কিন্তু আমরা অভ্যাসবশতঃ জড়তাবশতঃ এই শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাতও করি না। প্রকৃতির মোহিনী শক্তি সকল আমাদের চতুর্দ্দিকে সমানভাবে কার্য্য করিতেছে—বসন্তের মলয়ানিল, বর্ষাকালের প্রবল ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ, প্রকৃতির মধুর হাসি, প্রকৃতির উগ্রমূর্ত্তি তেমনিই প্রকাশ পাই-তেছে, আমরা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু আর্য্য ঋষিদের ভাব স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—এই প্রভাবশালী শক্তি সমূহে পরিবৃত হইয়া সেই প্রকৃ-তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি আশ্চর্য্যোৎ-ফুল্ল নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং নানা ছন্দোবন্দে তাঁহার স্তুতি গান করিয়া আনন্দে উৎসাহে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের নবীন নেত্রে সূর্য্য চন্দ্র বায়ু মেঘ সকলি জীবন্ত ভাবে প্রকা-শিত হইত। এই সকল দেবতাদিগের তুষ্টির জন্য ঋগ্বেদ হইতে স্তোত্রপাঠ, যজুর্ব্বেদ প্রণীত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং সামবেদের সঙ্গীত দ্বারা ইঁহাদের পূজা করিতেন।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর এক-চিত্র দেখা যায়। আদিম বৈদিক ঋষিগণ ঋজুস্বভাব সরল-হৃদয় প্রতিভাসম্পন্ন মহা-পুরুষ—প্রকৃতির আদি কবি ছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপাসনা কার্য্য অকৃত্রিম স্তুতি ও তৎসহকারে প্রীতির সহিত দ্রব্য বিশেষ নিবেদন মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হইত। প্রাচীনতর দেবগণের মধ্যে উষা অগ্নি সূর্য্য ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতাগণই অগ্রগণ্য ও তাঁহাদের স্তুতি-মালায় ঋগ্বেদের অধিকাংশই পরিপূর্ণ। ক্রমে পুরাতন বৈদিক দেবতাদের মহিমা অস্তোন্মুখ হইল এবং বৈদিক ক্রিয়াগুলি জটিল কুটিল বহুব্যাপারশালী হইয়া উঠিল। বেদে দেবপ্রীত্যর্থ যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপের বিধি আছে সেই সকল যজ্ঞ কাম-প্রধান হইয়া উঠিল—পুত্রকাম, ধন কাম যশস্কাম স্বর্গকাম প্রভৃতি নানাবিধ ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক ক্রিয়ার পৃথক ফল; তাহার অনু-ষ্ঠান বিধানে কতপ্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়-মাবলী প্রবর্ত্তিত হইল। অনুষ্ঠানের কিছু-মাত্র ত্রুটি হইলে আশানুরূপ ফললাভের ব্যত্যয় হয়, তাহার প্রতিবিধান উদ্দেশে কতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত হইল। এই সকল বহু আড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়া কলাপের পরিচালক পুরোহিতের সাহায্য অনিবার্য্য, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ভিন্ন সে সমস্ত সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং ব্রাহ্মণের আধি-পত্য হিন্দু সমাজে ক্রমশঃ বিস্তার হইতে লাগিল। যাজন ধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদির পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষত রাখিবার জন্য, প্রভূত যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন—তদনুসারে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি প্রজার রক্তশোষণকারী ভারি ভারি যজ্ঞ রাজ্যের স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই রূপ যখন বেদের রূপান্তর ঘটিল—যখন সরল সহজ বৈদিক উপাসনা কতক-গুলি সারহীন অর্থহীন আড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়া-

কাণ্ডে পরিণত হইল—তখন উপনিষদের ঋষিরা বেদের বিরুদ্ধে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে"

বেদ বেদাঙ্গ সকলি অপরা বিদ্যা, পরা বিদ্যা সেই যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্যস্বরূপকে জানা যায়।

এক সময়ে বৈদিক মত পরমোৎকৃষ্ট ও বেদোক্ত যাগযজ্ঞ নিতান্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া সকলের বোধ ছিল, পরে উপনিষদের সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে তৎকালের জ্ঞানবাদী ঋষিরা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা ঋক্,যজুঃ,সাম,প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যাকে নিকৃষ্ট বিদ্যা, কেবল ব্রহ্ম বিদ্যাকেই পরাবিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বেদের মধ্যে সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শেষভাগ উপনিষদ। উপনিষদ যে সময়ে আবির্ভূত হইল সে সময়কার পরিবর্ত্তন অল্প পরিবর্ত্তন নহে। উপনিষদে বেদ যেমন অপরা বিদ্যা বলিয়া পদচ্যুত হইয়াছে, সেইরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিও জ্ঞানবাদী ঋষিদিগের অনাস্থা। 'জ্ঞানবাদী' এই নামের ভিতরে এক গূঢ় অর্থ আছে। আপনারা জানেন, সামান্যতঃ বেদের দুই ভাগ বলা যায়—জ্ঞানকাণ্ড আর কর্ম্ম কাণ্ড। সেই অনুসারে ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরা কাল হইতে দুই মত চলিয়া আসিতেছে—জ্ঞানবাদ আর কর্ম্মবাদ। কর্ম্মবাদীরা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক—কর্ম্মদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। জীবকে স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাতেই জ্ঞানকাণ্ডের সার্থকতা। অপর পক্ষে জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। সাংখ্যেরা জ্ঞানবাদী, মীমাংসকেরা কর্ম্মবাদী। উপনিষদের আচার্য্যেরাও জ্ঞানবাদী ছিলেন। যখন বেদোক্ত তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভব হইয়াছিল, তখন তাঁহারা যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, জ্ঞানদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। "বিদ্যয়া বিন্দতে ঽমৃতং"। যাগযজ্ঞে কোন ফল নাই। মুণ্ডক উপনিষদেই আছে—

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপতন্তি।

এই যজ্ঞরূপ কর্ম্ম সকল যাহা অষ্টাদশ ঋত্বিক্ দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে সমুদয় অস্থায়ী ও অদৃঢ়; যে মূঢ়েরা ইহাদিগকে শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দন করে তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির যে কয়েকটি উপদেশ আছে তাহার মধ্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা
জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ-
সহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

হে গার্গি, এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যাহারা সহস্র সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তাহাদের কর্ম্মফল অস্থায়ী। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করা নিতান্ত বিফল-প্রযত্ন।

উপনিষদকে সামান্যতঃ বেদান্ত বলা যায়। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ সমাপ্ত হইলে

পর উপনিষদের ঋষিরা অরণ্যবাসী হইয়া আত্মজ্ঞানানুশীলনে ও ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইলেন, পরে যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে আত্মজ্ঞান উদয় হইল তখন আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা জ্ঞানতৃপ্ত হইলেন। *

আমরা যখন বহির্জগতে মানোনিবেশ করি তখন প্রথমদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাই। সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ, জল, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই সকল পদার্থে দৈব শক্তি আরোপ করা মনুষ্য সমাজের আদিমকালের লোকদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। ক্রমে জ্ঞানোন্নতি সহকারে ইহাদের মধ্যে একতা নিরীক্ষণ করা যায়; ইহারা যে একই মূলশক্তির পরিণতি, তাহা বুঝিতে পারি। তখন দেখিতে পাই যে এই বিশ্বরাজ্যে আপাত-প্রতীয়মান বৈষম্যের মধ্যে সাম্য—বৈচিত্রের মধ্যে একতা বিরাজ করিতেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অত্যাশ্চর্য্য একতা সূত্রে গ্রথিত। মহাত্মা নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একতার প্রতি প্রথমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, তিনি এই একটা বিস্ময়জনক সমাচার পণ্ডিত মণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে,যে শক্তির বলে বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলে নিপতিত হয় সেই শক্তির বলেই গ্রহ চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্ব স্ব পরিধিপথে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিভ্রমন করিতেছে। অন্য দিকে সুবিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ডার্বিন তাহার বিবর্ত্তবাদে জীব জগতে ও এই একতা প্রতিপাদন করিলেন—তিনি অকাট্য প্রমাণ সহকারে দেখাইলেন যে প্রত্যেক জাতীয় জীবের আদি জীব সকল ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি, এই যে পূর্ব্বতন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, তাহা ভুল—প্রকৃতিমাতা এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর জীব সমুদ্ভাবন করিয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাঙ্কুরের ভিন্নধা বিকাশ মাত্র। এই নিয়মে জীব প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে ইহার নাম Evolution—বিবৃতিবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ। বহির্জগতে যেরূপ, আধ্যাত্মিক জগতে ও এই একতা আরো স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যায়। বাহিরের বিষয় যেমন খণ্ড খণ্ড, আত্মা তেমনি অখণ্ড। আত্মা এক। আমার নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা প্রবৃত্তির মধ্যে সেই একই আত্মা বিরাজ করিতেছে। বাল্যকালে যে আমি ছিলাম, যৌবনে সেই, বার্দ্ধক্যে সেই আমি—এই এক আমিত্ব সূত্রে আমার সমুদয় জীবন গ্রথিত রহিয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জীবের পৃথক্ ভাব হইতে ক্রমে একত্বের দিকে চলিয়াছেন—শুধু জীব বলিয়া নয় কিন্তু জড় উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যেও মৌলিক একত্বের নিদর্শন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছেন। এই গোড়ার ঐক্য সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে; উদ্ভিদ—এবং জীবের মধ্যে আছে; জীব-

---

* বৈদিক ঋষিরা ও যে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে সেই একের ঐশী শক্তি অনুভব করিতেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন বৈদিক সূক্তের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদের মধ্যে একস্থানে স্পষ্টাক্ষরে কথিত আছে—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ

যিনি এক সৎস্বরূপ বিপ্রগণ তাঁহাকে বহুধা বর্ণন করেন—তাঁহাকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলা হইয়া থাকে।

যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সম্প্রশ্নং ভুবনা যান্তি অন্যাঃ

যিনি দেবতাদের মধ্যে এক, তাঁহারই অন্বেষণে অন্য সকল ভুবন ফিরিতেছে। বেদে যে সত্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায় উপনিষদে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

জন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে; মনুষ্য পশু পক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর—সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কেননা সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্থষ্টি।” সকল শক্তির মূল যখন এক ভগবান্ তখন সকল শক্তিই যে মূলত এক, ইহা কে না বলিবে? এই সমস্ত জগৎ—বাহ্য প্রকৃতি—আধ্যাত্মিক জগৎ সমস্তই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভেদ মাত্র।

এই বিশ্বব্যাপী একাত্মভাব উপনিষদের ঋষিদিগের জ্ঞাননেত্রে প্রকাশিত হইল। যখন তাঁহারা বাহিরের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় আত্মাকে দেখিতে পাইলেন এবং আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ বুঝিতে পারিলেন, সেই অবধি বেদান্ত বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল। বেদেতে আত্মা শব্দ যেমন বিরল, উপনিষদ তেমনি আধ্যাত্মিক বিদ্যাতে পরিপূর্ণ। যখন ঋষিরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা একই দেখিলেন, বহু হইতে একে গিয়া পৌঁছিলেন। আবার যখন সেই আত্মার আশ্রয়স্থান পরমাত্মাকে দেখিলেন তখন সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় বলিয়া জানিলেন। তখন ঋষিদিগের অন্তর হইতে এই মহাবাক্য উদ্ঘাটিত হইল

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আদিত্যে সএকঃ।

সেই যিনি এই পুরুষে, সেই যিনি আদিত্যে, তিনি এক। জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হইল। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা তিনি আত্মার অন্তরাত্মা। যিনি এই অসীম আকাশে তিনিই আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো
হমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ো
হমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।

এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—‘সর্ব্বানুভূঃ’ সকল জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—‘সর্ব্বানুভূঃ’ সকল অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় মুক্তি লাভের অন্য পথ নাই।

এই যে আধ্যাত্মজ্ঞান, অভেদ জ্ঞান, ইহা গীতায় সাত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। পার্থক্য জ্ঞান রাজসিক।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।২৮

অখণ্ড অব্যয় যিনি এক অদ্বিতীয়,
অবিভক্ত, সর্ব্বভূতে বিভক্ত যদিও,
এই একীভাব যাতে হয় প্রকাশিত,
সেই সে সাত্ত্বিক জ্ঞান, কহেন পণ্ডিত।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥ ২১

যে জ্ঞান সর্ব্ব ভূতেতে পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব নিরীক্ষণ করে সেই রাজসিক জ্ঞান। এদিকে যেমন জ্ঞানবাদী ঋষিরা বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি আস্থাশূন্য, তেমনি ইন্দ্র মিত্র বায়ু বরুণ দেবতাদিগের উপাসনাতে ও বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা জানিলেন যে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বতন্ত্র দেবতা নহে, তাহাদের মূলে সেই এক ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত। ক্রমশঃ।

ত্যাগ-ধর্ম্ম।

ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব-মানশুঃ।

না ধনের দ্বারা, না পুত্রাদির দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই

মুক্তি লাভ হয়। শ্রুতির এই মহাবাক্য ঘোষণা করিতেছে যে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই ভবের বন্ধন-যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়। এই বন্ধন-রজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া কেহ বা মহাসাগরের ভীষণ তরঙ্গে ভাসমান, কেহ বা পর্ব্বত লঙ্ঘনে ব্যাপৃত, কেহ অরণ্যে অরণ্যে ভ্রাম্যমান, কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম অসি হস্তে দণ্ডায়মান, কেহ বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু এ সবই ঘুচিয়া যায় যদি ত্যাগধর্ম্ম মানুষের সহায় থাকেন, যদি মানুষ বন্ধুভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে পারে। শ্রুতির এই মহাবাক্য শ্রবণমাত্রেই মহাযোগী ব্যাস-তনয় শুকদেব, সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য, মহাপুরুষ চৈতন্য প্রভৃতি সংসারবিরক্ত অতীত পুরুষগণ স্মৃতিপথে আসিয়া উদিত হন। অহো! তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরপ্রেমেই বিহ্বল হইয়া বৈরাগ্য পথের পথিক হইয়াছিলেন—তাঁহারা সংসার ছাড়িয়া সেই নিরস্তকুহকং পরম সত্যেরই স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা যে জনসংঘে কথিত হয়, সে সংঘ পবিত্র হয়, যে ক্ষেত্রে তাঁহাদের পদাঙ্ক চিহ্নিত থাকে সে ক্ষেত্র তীর্থে পরিণত হয়, যে হৃদয়ে তাঁহাদের ভাব জাগ্রৎ হয় সে হৃদয়ে প্রেম বৈরাগ্যের পুণ্য-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। কারণ মুক্তিগত প্রাণ যে হিন্দুজাতির প্রাকৃতিক ভাব ত্যাগ, তাঁহারা তাহারই চরম আদর্শ ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করি। সন্ন্যাসীর ত্যাগের প্রকাশ অরণ্যে, জনপদের প্রান্তভূমিতে ও নগর-পথে, বৃক্ষতলে এবং কৌপীন কম্বলে দীপ্যমান। তাঁহারা গৃহ-বন্ধন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু "প্রজাকামোবৈ প্রজাপতি": ঈশ্বর চান প্রজাসৃষ্টি, গৃহবন্ধন—গৃহশৃঙ্খলা। ত্যাগের অমৃতোপম ধর্ম্ম ঈশ্বর চান সেই গৃহেই প্রতিষ্ঠিত করিতে। তবে গৃহীর ত্যাগ কোথায়? গৃহীর ত্যাগ দানে—গৃহীর ত্যাগ সেবায়, গৃহীর ত্যাগ প্রতিপালনে, গৃহীর ত্যাগ আত্মসংযমে। গৃহী যখন ক্ষুধিতের আর্ত্তরবে আকৃষ্ট হইয়া অন্নথাল তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন, তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; গৃহী যখন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কলত্র, বন্ধু-বান্ধব ও দাসদাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া যথাযোগ্য রূপে আপনার অন্ন বসনে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন ও তাহাদিগের সকল অভাব মোচনে নিজেকে ভৃত্যবৎ নিযুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; গৃহী যখন পীড়িতের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া ঔষধ পথ্যের দ্বারা তাহার শুশ্রূষা করেন, তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; গৃহী যখন অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান ও অসৎকে সৎপথে আনয়ন করেন তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই ক্রন্দন উঠিতেছে যে, "খণ্ড বিহণ্ড কালতন্ করি হ্যায়। শক্কট মহা এক দিন পড়ি হ্যায়" এই কালপ্রবাহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-জ্বালার মধ্যে যিনি আত্মসংযম করিয়া ধৈর্য্যের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতে পারেন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়।

যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া, ইহার সমস্ত বিভীষিকাতে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া কেবল ব্রহ্মপ্রীতিতে নিমগ্ন থাকেন তাঁহাদের সে ভাব পরম সুন্দর, কিন্তু তাহা ভীরুজনোচিত ত্যাগ ধর্ম্ম, কিন্তু যিনি সংসারের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ থাকিয়া, তাহার চতুর্দ্দিক-ব্যাপী জ্বালাময়ী অনলের মধ্যে দগ্ধ হইয়াও ধৈর্য্যের সহিত অকাতরে দান, সেবা, প্রতি-পালন ও আত্মসংযম কার্য্যে আপনাকে

নিযুক্ত রাখেন ও তাহারই মধ্যে আত্মকোষে নিরঞ্জন নিষ্কলঙ্ক পরব্রহ্মের প্রতি জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত রাখিয়া ভক্তিপুষ্পে তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন সেই বীরের ত্যাগকেই বীরজনোচিত ত্যাগ ধর্ম্ম বলে। তিনিই শূর শব্দের প্রকৃত বাচ্য।

কেহ হয় ত বলিবেন যে, দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য কি এই সুখ দুঃখময় সংসারে চিত্তচাঞ্চল্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু যাঁহার সাধু ইচ্ছা আছে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়—সাধু মহাজনেরা বলিয়াছেন যে, "সৎসঙ্গত মিলে সো তরেয়া" যিনি সাধুসঙ্গ করেন, সৎপ্রসঙ্গ করেন, শ্রেয় ও প্রেয় পদার্থের বিচার করিয়া শ্রেয় পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার চিত্ত সহজেই প্রশমিত হয়। "ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" যখন শরীরী আত্মার প্রিয় ও অপ্রিয় হইতে নিষ্কৃতি নাই তখন আত্মানাত্ম বিচারই অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্তচাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখ ভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখ ভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচ্চিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক—যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না। যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও সাধু কর্ম্ম জানিবে। তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সকলই আমার কিন্তু কিছুই আমার ভোগের জন্য নহে বরং উৎসর্গের জন্য—এই যে মহৎ ভাব, ইহাতে ভোগ ও বিসর্জ্জন যুগপৎ সাধিত হয়। সকলই দিলাম কিন্তু সকলই রহিয়া গেল, অথচ সেই রক্ষণেই জগৎ মুগ্ধ হয়। আত্মা পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উৎপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা সংসার-কার্য্য ও ভোগ কার্য্য সম্পন্ন করে—আপনাকে দান করিয়াই আত্মার আত্মত্ব, আত্মদান না করিলে মনুষ্য মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না, আত্মদানেই জগৎ বশীভূত হয়। প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া শরীরকে ধারণ করে। নাড়ী এবং শাখানাড়ী সমূহে ব্যান, অধোতে অপান, ঊর্দ্ধে উদান, মধ্যে সমান এবং চক্ষু শ্রোত্রে মুখ নাসিকায় মুখ্য প্রাণ অবস্থান করতঃ সকলকে নিষ্কাম ভাবে আপনার

শক্তি দান করিয়া সঞ্জীবিত রাখিতেছে—ইহাই ত্যাগ, ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই গৃহীর ধর্ম্ম, এই ত্যাগই গৃহীর ত্যাগ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞ-দান-তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥
এতান্যপি তু কর্ম্মানি সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্তা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস কহেন এবং বিচক্ষণেরা সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। হে ভরতসত্তম সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার বাক্য নিশ্চয় শ্রবণ কর। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, প্রত্যুত তাহা অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞ, দান ও তপ মনীষী দিগের চিত্তশুদ্ধি-কর। এই সমস্ত কার্য্য আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই আমার উৎকৃষ্ট নি-শ্চিত মত। কিন্তু নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ সঙ্গত নহে, মোহ প্রযুক্ত তাহার ত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে অনুষ্ঠাতা দুঃখ জনক বলিয়া কেবল কায় ক্লেশ ভয়ে নিত্য-কর্ম্ম ত্যাগ করে সে ত্যা-গকে রাজস বলা যায়। সেই কার্য্যে অনুষ্ঠাতা কদাচ ত্যাগ-ফল লাভ করিবে না। হে অর্জ্জুন, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে নিয়ত কর্ম্ম, আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া, কৃত হয় সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এই কথাতেই যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ গৃহীর ত্যাগ ধর্ম্মের বিশিষ্ট উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই পবিত্র মন্ত্র ইহার প্রাণ। যিনি এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া এই সত্য সাধন করেন, তিনিই প্রকৃষ্ট ব্রাহ্ম।

নানা কথা।

ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব তাঁহার বিশাল ব্যাপকতা মনে ধারণা করা বড় কঠিন। তাঁহার স্বরূপ উপনিষদের ঋষিরা ধ্যানযোগে হৃদয়ে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া সরল সহজ ভাষায় স্বল্প-বাণীতে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, মন তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না; ইহাও জানি না যে কি বলিয়া তাঁহার উপদেশ দিতে হয়; যাহা কিছু জানি বা না জানি তাহা হইতেও তিনি ভিন্ন ও অতিরিক্ত। কি অমায়িকতা! ঈশ্বরকে পাইয়া তাঁহাদের প্রগল্ভতা উপশান্ত, ভগবদ্দর্শনে তাঁহারা অবাক ও নিস্তব্ধ; ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যাহা লইয়া তাঁহারা উপদেশ দিবেন। এই ত ভারতের এক অতি-প্রাচীন-যুগের চিত্র। কিন্তু মধ্য-যুগে সে ভাব সে তপস্যা জ্ঞানের সে উন্নতি যেন বিলুপ্ত। ক্ষত্রিয়বীর লইয়া পূর্ণব্রহ্ম স্থাপন করিবার জন্য কি এক উদ্দাম চেষ্টা। ইন্দ্রিয়ের অতীত পুরুষের স্থানে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনুষ্যবিশেষের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠা! তুলনা করিয়া দেখিলে এ কি ভয়ানক দুর্গতি, মানসিক শক্তির কি ঘৃণিত হীনতা! ঈশ্বরকে তাঁহার পূর্ণমহিমায় অনন্তের আভাসে চিত্রিত করিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ দেবমূর্ত্তি দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টার অভাব। নিজে ক্ষুদ্র, ঈশ্বরকেও ক্ষুদ্র করিয়া নিজের অপূর্ণ অনুরূপে গঠন করিয়া তাঁহার সেই

অপূর্ণ মহিমা ঘোষণা করিতে সকলে লালায়িত। তাই বিলাতের একেশ্বরবাদী ঈশার দেবত্ববিরোধী চার্লস্ ভইসী বর্ত্তমানবর্ষে প্রদত্ত তাঁহার ৭ম বক্তৃতার উপসংহারে আমাদেরই মত ক্ষুব্ধ হইয়া সৎসাহসের সহিত বলিতেছেন "the deification of Jesus is the grand historical testimony to the meanness of men's thoughts about God." ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতার পরিচয় যে মনুষ্য বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দিয়া আসিতেছে, যিশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব স্থাপনের চেষ্টা তাহার বলবৎ প্রমাণ।

অবশ্য যাঁহারা অবতারত্ব স্বীকারের ভিতরে শাস্ত্রকারগণের গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত দেখিতে পান এবং সেই ভাবেই বুঝাইতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকে প্রচ্ছন্ন সত্য আর দেখিতে চাহে না। সকল কথা সকল উদ্দেশ্য পরিষ্কার ও পরিস্ফুট ভাবে শুনিতে ও বুঝিতে চায়। সত্য লাভের উৎকণ্ঠাকে সে আর কিছুতেই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান যুগ জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন প্রতীক্ষা করে। জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মার্থীর স্বাধীন চিন্তাকে আজকাল সুপথে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। এইখানেই গুরু ও আচার্য্যের প্রকৃত দায়িত্ব।

অতীতে শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সে দিন ত্রিবাঙ্কুরে গিয়া ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "you should have a rational admiration for the past and a desire for progress.' অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে এবং উন্নতি লাভের জন্য সচেষ্ট হইবে। অন্ধভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইতে তিনি বলেন নাই। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া অতীতকে শ্রদ্ধা কর। বাস্তবিকই ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার এমন অনেক সামগ্রী রহিয়াছে, ভারতের গৌরবান্বিত অতীতে যাহাদের জন্ম। ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান অন্যত্র অতুলন। সে ব্রহ্মজ্ঞান আহরণ প্রকাশ ও প্রচার করিবার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায়কে ভিখারীর ন্যায় অন্যত্র যাইতে হয় নাই। তিনি ডুব দিয়া রত্নোত্তোলন করিলেন। অতীত ভারতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতম যোগ। উপনিষদ-মন্ত্রে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। অতীতের সেই ঋষিভাব সেই ঋষিপ্রকৃতি তাঁহাতে অবতরণ করিল। তিনি শান্ত ভাবে সাধনা করিয়া যে পদাঙ্ক রাখিয়া গেলেন, তাহা অবলম্বন করিতে পারিলে সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে কখনই পরিভ্রষ্ট হইতে হইবেক না। আমরাও বলি সুদূর অতীতে বিরচিত উপনিষদের অনির্ব্বাণ আলোক ধরিয়া বীর-পদনিক্ষেপে অগ্রসর হও, ব্রহ্মধাম সুগম হইয়া পড়িবে।

আদর্শ পুরুষ।—অনেকের মতে ধর্ম্মের ভিতরে একজন আদর্শ পুরুষ স্বীকারের আবশ্যকতা আছে, যাঁহার উদাহরণ ও কার্য্য দেখিয়া আমরা জীবনকে ও কর্ত্তব্যকে নিয়মিত করিতে পারি। তিনি মৃত হইলেন তাহাতে কি, ইতিহাসগত তাঁহার জীবনে শিক্ষা ও সান্ত্বনা লাভ করিবার অনেক বিষয় আছে। তাঁহারা ইহাও বলেন উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অনেকাংশে বিশেষ ফলপ্রদ। এই জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় কেহ বা ঈশাকে, কেহ বা মহম্মদকে, কেহ বা শাক্যসিংহকে,কেহ বা গৌরাঙ্গকে তাঁহাদের ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত করিতে চান। ইহাঁদের জীবনের আলোক আমাদের মত অসার নিরাশ জীবনকে যে আলোকিত করে, ইহাঁদের কণ্ঠোদ্গীরিত সত্য যে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আমাদের মর্ম্মের ভিতরে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া যায়, ত্যাগ-স্বীকারের মহৎ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে যে সংসার বিমুখ করিয়া তুলিবার উপক্রম করে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতার পরিমাণ এত অধিক,যে তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্তে জীবনকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা না পাইয়া, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের স্থান অর্পণ ও তাঁহাদের মহিমা ঘোষণার জন্য লালায়িত হই। যাঁহারা শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সমগ্র জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের নামের ধ্বজা—সম্প্রদায়ের পতাকা—স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদয়ের সহিত কলহ-বিবাদ, সংগ্রাম ও রক্তপাতে প্রবৃত্ত হই। এই সকল ধর্ম্ম প্রবক্তার মধ্যে কে অগ্রণী, তাহা লইয়া তর্ক-যুদ্ধে পরস্পরকে অবমাননা ও তুচ্ছ করিতেও এই জ্ঞানোজ্জ্বল সময়ে কুণ্ঠিত হই না। ঈশ্বরকে যদি আমরা জীবনের আদর্শ করিয়া লইতে পারি, কত বিবাদ বিসম্বাদ অবসান হয়, কত শত যুক্তি তর্ক নিরর্থক হয়। কত (dogma) অন্ধ-সুদৃঢ়-ধারণা দূরে পলায়ন করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরে মিলনের পথকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারে, কত শত অনাদৃত সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা পায়। মহৎ দৃষ্টান্ত অবশ্যই গ্রাহ্য, কিন্তু তুমি আমি যাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিতে যাই,তিনি মনুষ্য—তিনি অপূর্ণ—তিনি দোষের অতীত নহেন—একথা ও স্মরণে রাখিতে হইবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, কার্ত্তিক মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৫।৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৮৬॥৴৯
সমষ্টি	...	৩২২২ ৫৩
ব্যয়	...	৩৬৭৭৴৩
স্থিত	...	২৮৫৪৮৴০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
২৫৪৮৴০
২৮৫৪৮৴০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪০০।৵০

মাসিক দান।

৬মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲
কোং কাগজ ক্রয় করা যায়
২০০৲
পুরাতন কেরোসিন টিন বিক্রয়
।৵০
৪০০।৵০

তত্ত্ববোধিনা পত্রিকা	...	৩৬।০
পুস্তকালয়	...	৪৵৬
যন্ত্রালয়	...	৯০৲
ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মুলধন		৪॥৵০
সমষ্টি	...	৫৩৫।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩১০।৴৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৩ ৬
পুস্তকালয়	...	।৴৯
যন্ত্রালয়	...	৩২।৵৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১ ৩
সমষ্টি	...	৩৬৭ ৴৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আন্দুল আর্য্য-ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১২ পৌষ শনিবার ২৫শ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭ ঘটিকা ও সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সময় বিশেষ উপাসনা হইবে; সাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মল্লিক।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শান্তিনিকেতনের সপ্তদশ সাম্বৎ-রিক উৎসব।

বালার্কের সুবর্ণ কিরণোদ্ভাসিত রমণীয় তপোবন সুমধুর ঘন ঘন ঘণ্টা নিনাদে ও সুগভীর দামামা ও শঙ্খ রবে জাগরিত হইলে এবং গগনতল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছটায় উদ্ভাসিত হইলে, সঙ্গীতবিশারদের কলকণ্ঠ বিনিঃসৃত সুললিত "দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান" সহকারে উপাসকবৃন্দ প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ করিলেন। আশ্রমের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেরই দৃশ্য চিত্তকে সহজেই ব্রহ্মচৈতন্যে উদ্বোধিত করিয়া দেয়। শান্তিনিকেতনের বাহিরের এই সমস্ত অনুকূল অবস্থার সহিত মহর্ষিদেবের অমর ধর্ম্মজীবন এমনি সংজড়িত যে এখানকার শিল্প-শোভাপূর্ণ দেবকীর্ত্তি নিচয়, নয়ন স্নিগ্ধকর সজীব হরিৎকান্তি তরুলতা, সুনির্ম্মল আকাশ, সুবিমল বায়ু, উজ্জ্বল তপন কিরণ, বন্দনার বেদমন্ত্র ও মৃদঙ্গ ধ্বনি সহ বিচিত্র রসের মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত মধ্যে তাঁহার ভাব চিন্তা ও মহান উদ্দেশ্য যেন জীবন্ত আকার ধরিয়া অমৃতধামের যাত্রীদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মোপাসনার প্রধান সহায় হইয়া এই পবিত্র তীর্থ সংস্থাপনানন্তর তাহাতে নিজের দীক্ষানুষ্ঠানের স্মরণার্থ ব্রহ্মোৎসব সংযোগ করত আধ্যাত্মিক প্রেম-যোগে নীরবে অদ্যাপি আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। যাহাদের দিব্য কর্ণ আছে তাহারা এখনও তদীয় অলৌকিক বাণী শুনিতে পায়, এবং যাহাদের দিব্য চক্ষু আছে তাহারা সেই যোগজীবনের অমর মূর্ত্তি সন্দর্শন করে। শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক মহোৎসব ভক্ত ব্রাহ্মগণের অতীব আনন্দজনক। স্থান কাল পাত্র তিনই যোগ বৈরাগ্য ও শান্তি রসের উদ্দীপক। পার্থিব জীবনের অসার কোলাহলে বিক্ষিপ্ত, সংসারের গুরুভারে শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয় এখানে সময়ে সময়ে যে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয় তাহা আত্মারাম ঋষি তপস্বীগণেরও পরম প্রার্থনীয়। বিবিক্তসেবী বনবাসী আর্য্য পিতামহগণ যে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া আর্য্যজাতিকে গৌরবের উচ্চশিখরে তুলিয়া

গিয়াছেন সেই পরম ধন লাভের যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে এই নির্জ্জন আশ্রম যে পরম পবিত্র তীর্থ তাহার আর সন্দেহ নাই।

নিমন্ত্রিত সমাগত যাত্রীগণ ৬ই পৌষ রজনীতে এখানে কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। তাঁহাদের সেবা পরিচর্য্যার ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুন্দর হইয়াছিল। উষাকালে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলে পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া মন্দির মধ্যে সমবেত উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আগন্তুক ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণে উপাসনা মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলে স্ব স্ব আসনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইলে শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকলেবর বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্ম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় শ্রীমন্মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রথমে সকলের সহিত শুভ্র শিলাতলে দণ্ডায়মান হইয়া "পিতা নোসি" এই শ্রুতি পাঠান্তে তিনি প্রণাম করিলেন। পরে যথাক্রমে স্তব, আরাধনা, গায়ত্রী মন্ত্র পঠিত হইল। পরিশেষে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

অনন্তর মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হইতে না হইতে প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হয়। এতৎ প্রদেশীয় সাধারণ নরনারী বালক ও যুবকগণকে শান্তিনিকেতনে আকর্ষণ করিবার জন্য মহর্ষিদেব এইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ গীত বাদ্য ও আতসবাজী ইত্যাদির স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। আতসবাজী দেখিবার ও যাত্রা শুনিবার জন্য প্রতি বর্ষে এখানকার প্রশস্ত প্রান্তরে বহু দূর হইতে বিস্তর লোক সমাগত হয়। অনুমান সাত আট সহস্র নরনারী এবার একত্রিত হইয়াছিল।

মহা কোলাহল এবং জনতার মধ্যে সায়ংকালীন উপাসনা হইয়াছিল। তৎকালে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অনেক ভদ্রসন্তান স্থির ভাবে উপদেশ ও সঙ্গীত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যাকালের উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। নৈতিক কর্ত্তব্য, ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন, ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল। প্রসিদ্ধ সুগায়ক শ্যামসুন্দরজী একাকী দুই বেলা গান করেন। তাঁহার সুশ্রাব্য মধুর গম্ভীর স্বরসংযুক্ত গীত গুলি শ্রোতৃগণের চিত্তকে আর্দ্র করিয়াছিল। নীলকণ্ঠ অধিকারী পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। এক্ষণে কয়েক বৎসর হইতে তিনি ভক্তির সহিত এখানকার উপাসনায় যোগ দেন এবং তাহাতে তিনি পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

উপাসনান্তে আতসবাজী পোড়াইবার ব্যবস্থা। বিচিত্র বর্ণের আলোকমালা, ঊর্দ্ধে প্রস্ফুটিত কুসুমাকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল দর্শনে "বলিহারী! বলিহারী! বাহোবা" রবে সহস্র কণ্ঠ অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সর্প, হস্তী, তোরণদ্বার, কদম্ববৃক্ষ, কতই সুন্দর সুন্দর সব আতসবাজী! উপরে অনন্ত নীলিমার ক্রোড়ে এই সকল পদ্মরাগ অয়স্কান্ত নীলকান্ত মণিহারের সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা, দেখিতে অতি সুন্দর, নয়নরঞ্জন। পরিশেষে অনিত্য আলোকগুলি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কেবল নিত্যবস্তু "ওঁ" মৃদু কিরণে দীপ্তি পাইতে

লাগিল। এই সাময়িক আমোদ ও উল্লাসকর ব্যাপারের মধ্যেও মহাজ্ঞানী গম্ভীর প্রকৃতি মহর্ষির কবিত্বের মাধুরী অবলোকন করিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? নিত্য শান্তিপূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ শান্তিনিকেতনের মধ্যে বৎসরান্তে একদিন এইরূপ আনন্দোৎসবে নিত্য নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পুরুষের প্রেমলীলার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ইহার দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বিষয়গুলি শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের বক্তৃতা।

পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্তের বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন ঋষিধর্ম্ম, ভারতের বিশেষ গৌরবের সামগ্রী ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস-পানকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য যে মহাত্মা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যকার দিনকে যিনি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই দেব জীবন ও সেই শুভ দিনের মহাত্মাকে আজ সকলে উপলব্ধি করিতেছি। মহর্ষির অন্তরস্থ ব্রহ্মানুরাগের মধুর গাম্ভীর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পক্ষে অদ্যকার উৎসবের দিন একটী বিশেষ পবিত্র দিন। তাঁহার আত্মার স্বর্গীয় জ্যোতি শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে এই উৎসবের আনন্দ মূর্ত্তি ধরিয়া অদ্য প্রকাশ পাইতেছে। এস আজ প্রাণ ভরিয়া সকলে সেই মূর্ত্তি দেখি এবং দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে সেই মহাপুরুষের যোগমগ্ন আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হই। তিনি যেমন উল্লাসের সহিত সনাতন ঋষি-বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতেন সেই ভাবের ভাবুক হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, ব্রহ্মপূজা কেমন সরস সুন্দর হৃদয়ানন্দকর দেববাঞ্ছনীয় পরম পদার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ আজ সকলে গ্রহণ করি।

আমরা এক্ষণে স্বদেশজাত পার্থিব বস্তুর উন্নতির জন্যর সকলেই অতিশয় উৎসাহিত এবং প্রমত্ত হইয়াছি। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য যে অবিমিশ্র স্বদেশী ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মারাধানার উদ্ধার এবং বিকাশ সাধন পূর্ব্বক তাহা আচণ্ডাল জাতি নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিয়া গেলেন তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াও ধারণা ও সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। যে বেদমন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রী শ্রবণে নিম্নাধিকারী স্ত্রী শূদ্র এত দিন বঞ্চিত ছিল এক্ষণে তাহা ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে, কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে, ইহা কি আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় নহে? হায় এমন পরমতত্ত্ব চরমধর্ম্ম যিনি অধিকার করিয়া জীবনে তাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া গেলেন তাঁহার চরিত্রের মূল্য আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছি না। তাঁহার বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া ও প্রাণপ্রদ উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া এবং স্নেহভাবে অনুপ্রাণিত মধুর গম্ভীর সংগীত সকলের সুধারসে হৃদয় মগ্ন হইতেছে, বার বার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-বিষয়ে দৃষ্টি পড়িতেছে, তথাপি নিত্যবস্তু সারাৎসার পরব্রহ্মে মন মজে না, তাঁহার ধ্যান চিন্তা জ্ঞানানুশীলনে অন্তরে অনুরাগ জন্মে না। অনন্ত অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় চিন্ময় তত্ত্ব সহজে আয়ত্ত হয় না সত্য, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রকাশ যে আধারে মূর্ত্তিমান আকারে প্রকটিত হইল,

যে অমর দেবচরিত্র নিগূঢ় অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি প্রভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া মানবসমাজের ইতিহাসপটে চির দিবসের জন্য অঙ্কিত রহিল, পরিদৃশ্যমান সেই জীবন্ত স্থবির মর্য্যাদা কি আমরা বুঝিতে পারিলাম ? না তদ্দর্শনে আমাদের পরিত্রাণের আশা বিশ্বাস বাড়িল ? মহাজনদিগের কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে ভাল, তাঁহাদের চরিত্রকাহিনী শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়, অথচ তাঁহাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া আমরা অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হইতে চাহি না, শিয়রে শমন দেখিয়াও চৈতন্যোদয় হয় না, হায় কি বিড়ম্বনা !

কোন কারণে বাধ্য হইয়া যদি আমরা একখানি বিলাতি বসন ক্রয় করি, স্বদেশানুরাগী যুবক বন্ধুরা তাহা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হন, এবং ভর্ৎসনার স্বরে বলেন, "মহাশয়, শ্বেতশ্মশ্রু পককেশ হইয়া এমন গর্হিত কাজটা করিলেন" । এদিকে চিরন্তন-পৈতৃক ধন, জীবনের অন্নপান স্বরূপ স্বদেশী ব্রহ্মবস্তুর কথা বলিলে কাহারও তাহাতে আস্থা জন্মে না। আজকালের দিনে ভবের বাজারে তাহার যেন কোন মূল্যই নাই। যাঁহার ইচ্ছায় জন্মিয়া জীবিত আছি, প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহাকে ভুলিয়া, উপেক্ষা করিয়া দেশের এ কি ভয়ানক দুর্গতি উপস্থিত হইল। দুই দিন পরে যাঁহার চরণে আত্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে, তিনি কি স্বদেশী বস্ত্র, দেশলাই, সাবান ইত্যাদির অপেক্ষা প্রয়োজনীয় নহেন ?

চিন্তাহীন অনাত্মদর্শী মানব মনে করে, যাঁহার রূপ রস গন্ধ নাই, যাঁহাকে ধরা ছোঁয়া দেখা শুনা যায় না, অর্থাৎ যদ্দ্বারা এই জরামরণশীল অনিত্য জীবনে কোন অনন্ত তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব ? মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে যাহা বলিয়াছিলেন ইহা ঠিক তাহার বিপরীত বৈরাগ্য ! ভোগবিলাস পথের পথিক নির্ব্বেদ সহকারে মনে মনে বলেন, হায় আমি প্রচুর বিলাস ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইলাম না ; সুরম্য হর্ম্ম্য, বিচিত্র উদ্যান, মনোহর যান বাহন, অর্থ বিত্ত আমার ভাগ্যে ঘটিল না ; এবং সুন্দর নয়নরঞ্জন হৃষ্টপুষ্ট দেহধারী স্বজন বান্ধব, বিদ্যোপাধি বিশিষ্ট পুত্র কন্যা প্রভৃতি সম্পদ সুখ সম্ভ্রম আমার কিছুই নাই, আমি কি মন্দ ভাগ্য ! আমার না জন্মানই ভাল ছিল।

একথার কি সন্তোষজনক উত্তর ও প্রতিবাদ নাই ? মহর্ষিজীবন ইহার প্রতিবাদ এবং সদুত্তর। যদি বল, তিনি ধনী জ্ঞানী বিধাতার বিশেষ কৃপা পাত্র, তাই তিনি সাধু মহাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের কি ? আমরা পোষ্যভারাক্রান্ত গৃহী, অর্থচিন্তা ব্যতীত পরমার্থ চিন্তার আমাদের সময় নাই সাধন তপস্যা ত দূরের কথা ; সংসারের ভার বহিতে বহিতে, দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, আমাদের জীবন শেষ হইয়া যাইবে। আরও কথা এই, অনন্ত নির্ব্বিশেষ নিরাকারকে ভাবিয়া ফল কি হইবে ? পার্থিব জীবনের কোন্ কাজে তাহা লাগিবে ? দৈহিক অভাব যাহাতে মোচন হয় কেবল তাহা করিয়াই আমরা চলিয়া যাইব, সূক্ষ্ম নিরাকার অতীন্দ্রিয় বিষয় ভাবিতে পারি না। ভাবিতে গেলে মাথার মধ্যে যেন কিরূপ গোলমাল বোধ হয় ; চিত্ত বিভ্রান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। মুখে এ প্রকার কেহ বলুন বা না বলুন, মনে মনে ইহাই অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত, শেষ সিদ্ধান্ত। ইহা অবশ্য সত্য কথা যে,

বিষয়ে জড়িত থাকিলে যোগ বৈরাগ্য সাধন করা যায় না, এবং নির্ব্বিশেষ অনন্ত পরমাত্মার সম্যক ধারণাও সম্ভব নহে; সুতরাং তাহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। সচরাচর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, উপদেশ এবং প্রার্থনায় একদিকে মহান্ সর্ব্বাতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং অপর দিকে তাঁহার পিতৃত্ব মাতৃত্ব বন্ধুত্ব প্রভৃতির নিকটতর সরস সম্বন্ধের কথা যাহা শুনি তাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি বিচার চিন্তা এবং ভাব ভক্তি আপাততঃ চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু সে সকল তত্ত্বের বাস্তবিকতা সহজে আত্মস্থ এবং জীবনগত হওয়া বড়ই কঠিন। এই কঠিন সমস্যা ব্রাহ্মগণ এখনো ভালরূপে পূরণ করিতে পারেন নাই।

ইতিহাসে মহাজন চরিতে এইরূপ ধর্ম্মসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত আছে, আমাদের ভক্তিভাজন মহর্ষিদেবও ইহার সাক্ষী। তিনি বিস্তীর্ণ বিষয়, বৃহৎ পরিবারের ভার মাথায় লইয়া তাহার সুব্যবস্থা সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেন, তৎসঙ্গে সজনে বিজনে, পরিবার মধ্যে তপোবনে একাকী গভীর ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। প্রত্যেক ছোট বড় জ্ঞানী অজ্ঞানী নরনারীর পক্ষে ইহা কি এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত এবং আশার সমাচার নহে? জ্ঞানেও ভ্রম থাকিতে পারে, ভাবে ভক্তিতেও অন্ধতা অসারতা প্রকাশ পায়, আবার কর্ম্মেও আসক্তি আছে, কিন্তু জীবনে চরিত্রে এই তিনের বিশুদ্ধ সমন্বয়, এবং আত্মাতে যে দেবাবির্ভাব দেবলীলা তাহা ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ সত্য। ঈদৃশ ভক্তজীবন দর্শনে আমাদেরও কি আশা হয় না যে সাধন করিলে আমরাও এক দিন সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব? সত্যের সামঞ্জস্য, জীবনের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইব? ভক্ত মহাজনগণ এ পথের প্রধান সহায় ও উত্তর সাধক। তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ ভিন্ন এ পথে অগ্রসর হইবার আর সহজ উপায় কিছুই নাই। একদিকে তাঁহাদের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, এবং আশীর্ব্বাদ, সহানুভূতি অপর দিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগ, ভগবৎ—সান্নিধ্যের নিঃসংশয় অনুভূতি। নির্গুণ সত্তার চিন্তা ও যাবতীয় জীবনক্রিয়া মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের উপলব্ধি এবং নিজের জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের ভিতরে তাঁহার সহিত একাত্মতা অনুভব, ইহাই চরম অবস্থা। বৃথা আমিত্বের অভিমান সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইবে, তাহার স্থানে স্বয়ং বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা সদ্‌গুরু অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবনযন্ত্রকে পরিচালিত করিবেন। অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মরূপ পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে জীব নিরন্তর মগ্ন থাকিবে। বিশেষ বিশেষ খণ্ড জ্ঞান ও স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞানের রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতিসূক্ষ্ম চিন্ময় অনন্ত ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগজীবন লাভের কোন আশা নাই। কর্ম্মযোগ সাধন তাহার এক মাত্র সোপান। কর্ম্মাধ্যক্ষ বিধাতা প্রতিমানবের বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি এবং হৃদয়ের ভাব ভক্তির ভিতর দিয়া শক্তিরূপে দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেছেন এইরূপ ধারণা আবশ্যক। সে রাজ্যে তিনিই আলোক, পথপ্রদর্শক এবং তিনিই স্বয়ং গুরু ও নেতা। দিব্যজ্ঞানালোকিত ইচ্ছা-যোগ-সমন্বিত এই নির্ব্বিশেষ অভেদ জ্ঞানে পৌঁছিতে হইলে স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা, অবস্থা, চিন্তা, কার্য্য, আশা, কামনার অভ্যন্তর দিয়া সূত্রভাবে পরমাত্মার সঞ্চরণ এবং অব্যবহিত ক্রিয়া-যোগ উপলব্ধি করিতে হইবে। এইরূপে যখন ব্রহ্মেতে নিত্য স্থিতি হয়, তাঁ-

হার জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের সহিত জীবন একীভূত হইয়া যায় তখন আর ভেদবুদ্ধি তিষ্ঠিতে পারে না, ইষ্ট দেবতার সহিত দেখা শুনার অভাব কিম্বা বিচ্ছেদ স্বতন্ত্রতা বোধও থাকে না। তখন এই যে মহাশূন্য অসীম আকাশ তাহা অনন্তের আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, এবং দেশকালে বদ্ধ এই বাহ্য পদার্থগুলি আমাদিগকে আর আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। মায়াবন্ধন বিমুক্ত আত্মার নিকট সকলই প্রমুক্ত অনাবৃত। তাহার দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ সেই জীবন্ত জাগ্রত পরমপুরুষে সংলগ্ন থাকে।

হে চিরজীবনাশ্রয় হৃদয়বাসী অন্তর্যামী পুরুষ, আমরা যেন তোমাকে অতিক্রম করিয়া কোন চিন্তা বা কার্য্য না করি। যেন প্রতিক্ষণে তোমার অনুগমনই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ও লক্ষ্য হয়। যখন যে কর্ত্তব্য উপস্থিত হইবে তোমার নিকট তদ্বিষয়ে পরামর্শ এবং সাহায্য ভিক্ষা করিব। এমন কি কার্য্য আছে যাহা তোমা দ্বারা উদ্ধার হইতে না পারে? সদাকালের সঙ্গী তুমি, সুদীর্ঘ জীবন পথে যখন যাহা কিছু অভাব হইবে তাহা তুমি পূর্ণ করিয়া দিবে। অন্য উপায়ে যদি তাহা পূর্ণ না হয়, অথবা আমাদের সময়ে সময়ে যদি গভীর ক্ষতিই বা উপস্থিত হয়, তুমি সে অবস্থাতে আপনাকে দান করিয়া আমাদের সকল ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দিবে। তুমি পূর্ণকাম, তুমিই পরম পুরুষার্থ; আশীর্ব্বাদ কর, নাথ, যেন তোমার অভয় বাণী শুনিয়া এবং প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা সকল অভাব দুঃখ ভুলিয়া যাই এবং তৃপ্তকাম হই।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উপদেশ।

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।

আমি জানি যে কর্ম্মলব্ধ ধন অনিত্য। এই অধ্রুব পদার্থের দ্বারা সেই ধ্রুব সত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, হে ভ্রাতৃগণ, কি লক্ষ্য করিয়া—কাহার উপাসনার জন্য বৎসরে বৎসরে এই পুণ্য দিনে শন্তিনিকেতনে আসিয়া আমরা সমবেত হই? ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি নহে? হৃদয়ের আকর্ষণ এবং গতি কি সেই ধ্রুব সত্যের দিকে পরিচালন করিবার জন্য নহে? যাঁহার ইচ্ছাতে প্রেরিত হইয়া আমাদের শরীরের মধ্যে মন মনন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছাতে প্রাণ প্রেরিত হইয়া আমাদের শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছাতে নিযুক্ত হইয়া আমাদের মুখ দিয়া বাক্য স্ফুরিত হইতেছে, যে দেবতা চক্ষু শ্রোত্র দিয়া আমাদের সম্মুখে জগৎ সৃষ্টির অনন্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনাই ধ্রুব সুখ শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। সংসারের পাপ তাপ ও বদ্ধ-ভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার উদার প্রীতিতে আপনার আত্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া মুক্ত হইবার জন্যই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁহাতে প্রীতি করা আবশ্যক। পরমেশ্বর পাপের মোচয়িতা ও মুক্তিদাতা, তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে পাপ তাপ হইতে, সংসারের মোহ-বন্ধন হইতে উদ্ধার নাই। বিষয়াসক্তিই মোহ-বন্ধন, প্রতাপ প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষাই মোহ-বন্ধন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যাভাষণ ও কাপট্যই

মোহ-বন্ধন। ইহার জন্য যাহার মন অহ-রহঃ চিন্তারত রহিয়াছে, সুখ শান্তি তাহাকে মরীচিকার ন্যায় ক্ষণিক আশ্বাসে মুগ্ধ করিয়া মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। ইহারই উপার্জ্জন মানসে আমরা কি আমাদের অমূল্য বিজ্ঞানাত্মাকে আজীবন নিযুক্ত রাখিব? মৃত্যু কে চায়? অমৃতই সকলের লক্ষ্য। যে দিন ধীশক্তিসম্পন্ন মহামনা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় পত্নীদ্বয়কে তদীয় ধন রত্ন বিভাগ করতঃ গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহার দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমরা পুরুষ হইয়াও কি সেই কথা বলিতে পারিব না? ঈশ্বরের চরণে কি বাস্তবপক্ষে—সত্যের জন্য আমাদের মুখ হইতে এই প্রার্থনা-বাণী বাহির হইবে না যে, "হে ঈশ্বর! অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও।" সংসার অন্তঃসার শূন্য অধ্রুব পদার্থ; সুতরাং মৃত্যুরই প্রতিকৃতি—ইহা অন্ধকারাচ্ছন্ন অসৎ। ঈশ্বর ধ্রুবজ্যোতি সত্য সনাতন পূর্ণ পুরুষ অন্তর্বাহ্যে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে জ্ঞানযোগে লাভ করা ও তাঁহাতে প্রবেশ করা আমাদের কামনার পরিসমাপ্তি। চর্ম্মচক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে তিনি প্রকাশিত হন। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ পরীক্ষিত সত্য, ইহা ঋষিদিগের সম্যক আচরণীয় ছিল। এই জ্ঞান ও প্রার্থনার বলেই তাঁহারা ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বেদ উপনিষদ হইতেই ইহা লাভ করিয়াছি—আত্ম-প্রত্যয় নিয়তকাল এই সত্যের সাক্ষী দিতেছে। ইহাকে কেহ সন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিও না, বধিরকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিও না। এখন সকলে একবার আত্ম-মহিমা চিন্তা কর। স্থূল জগৎ হইতে তাহা ভিন্ন, শরীরস্থ হইয়াও শরীর হইতে তাহা ভিন্ন। এই জীবাত্মার মধ্যেই ঈশ্বর পরমাত্মা রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনিই আমাদের পিতা মাতা সুহৃৎ—"স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" বিশ্বভুবনের সকল সংবাদ একমাত্র তিনিই জানিতেছেন—দণ্ড পুরস্কার দিবার জন্য তিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিয়া ও তাঁহাতেই অবস্থান করিয়া দেবতারা ও পবিত্র মনুষ্যেরা অমৃত পান করিয়া থাকেন। "ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামমধ্যেরয়ন্তঃ।" আমরা তাঁহার প্রসাদে পাপ মলিনতাকে আত্মা হইতে যত উন্মোচন করিতে পারি, ততই তাঁহার সত্ত্বা ইহাতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, ততই তাঁহার পিতৃ-সম্বন্ধ, সখা-সম্বন্ধ, প্রভু-সম্বন্ধ আমাদের সহিত গাঢ়তর হয়, ততই অধিক পরিমাণে তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামিত্ব আমরা লাভ করিতে পারি। ইহাতেই শাশ্বত আনন্দ, সুখ ও শান্তি।

এখনই তোমরা একবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখ যে এইরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ও ব্রহ্মের উপাসনারত হইয়া ঈশ্বরকে তোমরা কতটুকু ধারণ করিতে পারিতেছ, আত্মাকে কত উন্নত করিতে পারিয়াছ। এখনই আপনার আত্মাকে উন্নত করিয়া সেই পরমাত্মার সহিত যোগ কর, নিশ্চয় জানিবে যে, ঈশ্বর হইতে আমরা কেহই কখন বিযুক্ত নহি। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে

মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের শরীরের উপাদান জড় হইতে পারে কিন্তু আমাদের আত্মার উপাদান সত্য, আত্মার উপাদান ধর্ম্ম, আত্মার উপাদান জ্ঞান। ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ, জ্ঞানই আমাদের সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন। আমাদের মধ্যে হয় ত অনেকেই এমন অবিবেকী আছেন যে তাঁহাদের তত্ত্ববিচার নাই, জ্ঞানের সাধনা নাই, যাঁহারা অধ্যাত্ম যোগের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু আমাদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি আপ্ত বাক্যের—শ্রুতি বাক্যের উপরে নিঃসংশয় শ্রদ্ধা না রাখেন। সেই শ্রুতিই বলিতেছেন যে "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" এই যে আমাদের জীবাত্মা ইনি দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, আঘ্রাণ করেন, আস্বাদন করেন, মনন করেন, বিচার করেন, কর্ম্ম করেন; তিনিই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ স্থিতি করিতেছেন কোথায়? "স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে" সেই পরম অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছেন। অতএব ঈশ্বর হইতে আমাদের বিযুক্তি কোথায়? তাঁহা হইতে আমরা দুরে নহি, তিনি আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে সত্যস্বরূপের উপাসনার সহজ ও সত্য পন্থা আর কি হইতে পারে? হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে যে আচমনের মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাতে তো ঋষিরা এই কথাই বলিতেছেন যে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই আকাশে বিস্তৃত বস্তু সকল যেমন আমরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাই, সেইরূপ পরব্রহ্মকে ঈশ্বরপরায়ণ ধীরেরা একাগ্রচিত্ত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্র দ্বারা আপন আপন আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করেন। যেহেতু আত্মারূপ উজ্জ্বল কোষই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান, প্রতিজনের আত্মাই তাঁহার প্রকৃষ্ট আসন। আত্মজ্ঞানের এই বিমল জ্যোতিতে যাঁহারা পবিত্র তাঁহারা কি আনন্দের উচ্ছ্বাসেই উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে, দেব হইতে কি উৎকৃষ্টতর দেব সহবাসেই উত্থান করেন।

কিন্তু হায়, তাহাদের কি দুর্দ্দশা যাহারা কেবল প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই ধর্ম্মের বিপরীত পথে পদার্পণ করিয়াছে! সংশয়-তিমিরের মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া তাহারা কেবল পুনঃ পুনঃ সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রযাত্রী নাবিকের লক্ষ্য যেমন আকাশের ধ্রুবতারা, পরলোকযাত্রী মানবের লক্ষ্য সেইরূপ আপনার অন্তরস্থ জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর হওয়া চাই। যাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না, কেবল পাপকর্ম্মেই মুগ্ধ থাকিল তাহাদের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহারা পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই সর্ব্বদা যত্নশীল। হিংসা এবং প্রতিহিংসার ন্যায় দুর্জ্জয় ব্যাধি আর কিছুই নাই। ইহাতে দয়া, পরোপকার, প্রত্যুপকার প্রভৃতি মানবের সদ্‌গুণ সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। কিসে কুপ্রবৃত্তি সকল সতেজ হয়, কিসে পাপ বিষয় সকল হস্তগত হয়, তাহারই জন্য তাহারা ব্যস্ত। পাপ হইতে যে প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে তাহা একবারও মনে করে না—মনে করিবে কি, পাপকার্য্য ও পাপচিন্তা করিতে করিতে পাপে তাহারা এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে পাপবোধমাত্রই তাহাদের মনে জাগ্রৎ হইবার অবসর পায় না। পৃথিবীতে যত

ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে সকল সম্প্রদায়ের লোকই স্ব স্ব শাস্ত্রের অত্যন্ত গৌরব করিয়া থাকেন এবং নিজেকে সেই সেই সম্প্রদায়-গত বলিয়া অভিমানে এত স্ফীত হইয়া উঠেন যে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে থাকে। কিন্তু শাস্ত্রীয় সত্যের অনুষ্ঠানে নিজের নিষ্ঠার অভাব দেখিয়া ও স্বীয় কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও কেহ কম্পিত হন না, ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য। কায়িক পাপের মধ্যে জীবের প্রাণহরণ, চৌর্য্য ও পরদার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বাচিক পাপের মধ্যে প্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য ও অনৃত বাক্য জল্পনাও করিতে নাই, চিন্তাও করিতে নাই। পরদ্রব্য হরণের অভিলাষ ত্যাগ করিতে হইবে এবং কৃতাকৃতের ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা চিন্তা করিবে। গলদেশে যজ্ঞোপবীত বা কণ্ঠীধারণ করিলে কিম্বা কোরাণ বা বাইবেল হস্তে বিচরণ করিলে মানুষ ধার্ম্মিক হয় না। কিন্তু জাতি নির্ব্বিশেষে বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আছে তিনিই ধার্ম্মিক। অতএব হে সাধু সজ্জন সকল! তোমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হও। পাপ করিয়া কুতর্ক দ্বারা আপনাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিও না, মৃত্যুর পরে তোমাদের যে অবস্থা হইবে তাহার প্রতি অন্ধ থাকিও না; কিন্তু সরল হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হও। তোমাদের পাপ তাপ সকল দূরীভূত হইবে, তোমরা পুণ্য পদবীতে ক্রমে উন্নত হইবে এবং পরলোকে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরের গুণগান করিতে ও তাঁহার মহিমা গরীয়ান করিতে পারিবে। এখন অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং আপনার চরিত্রকে শোধন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে থাক, পৃথিবীকে শেষ গতি মনে করিয়া যথেচ্ছাচার করিও না। ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী পাপীরা এখান হইতে যে পরিমাণে পরলোক পাপভার লইয়া অবস্থিত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে পাপ প্রতিকারের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়। যেমন হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা যমুনা এখানে আমাদের জন্য সুশীতল বারি আনয়ন করিতেছে, যেমন সুদূর দক্ষিণ আকাশ হইতে স্নিগ্ধ শীতলতা বহন করিয়া মলয় মারুৎ আমাদের মন প্রাণ শীতল করিতেছে, যেমন সমুচ্চ গগন প্রান্ত হইতে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া আমাদিগের চক্ষুতে জ্যোতি দিয়া বর্ণবিধান করিতেছে, সেইরূপ আমাদের যজনীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রাচীন—অতি প্রাচীন বেদ উপনিষৎ হইতে মহাসত্য সকল বহন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মপ্রাণকে পবিত্র করিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আরণ্যক ধর্ম্মকে গৃহে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গুপ্ত তত্ত্বকে সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিয়া জ্ঞানী মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেরই কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি অমৃতবাণীই প্রচার করিয়াছেন!

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন। জগতের এই অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা,

পরব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, সেইরূপ ওঁ শব্দেরও বাচ্য। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমাদেরও কর্ত্তব্য যে দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গলস্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।

ওঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ॥

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ওঙ্কার সাধনের দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

হে পরমাত্মন্! যেমন স্বর্গের দেবতারা এক সঙ্গে মিলিয়া অহরহ তোমার স্তুতিগান ও তোমাতে অমৃত পান করিয়া থাকেন, বৈদিক কালে আর্য্য ঋষিরা যেমন অরণ্যে বেদীপীঠে বসিয়া সামগানে তোমার আরাধনা করিতেন, এই বর্ত্তমান যুগের এই ব্রাহ্মসমাজের বেদীপীঠে বসিয়া আমরাও সেইরূপ তোমার স্তুতিগান করিতেছি। হে প্রকাশবান্ পরমেশ্বর! তুমি একবার আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও এবং আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

মা আমার অনন্ত রত্নের অধিকারিণী। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ কত তাঁর ঐশ্বর্য্য, কত তাঁর বিভূতি। ভূলোক দ্যুলোক চারিদিকেই তাঁহারই ঐশ্বর্য্য দেদীপ্যমান। এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার সমক্ষে দেখিতেছ সকলেরই তিনি অধীশ্বরী, কেবল যে তিনি অধীশ্বরী তাহা নহেন, এই সকলই তিনি প্রসব করিয়াছেন। প্রসব করিয়াছেন কেন? তাঁহার সন্তান সন্ততিদিগের ভোগের জন্য, তোমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া কর্ম্মফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ করিবে এই জন্য। তুমি যতই ভোগ কর না কেন, মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না, কখনও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, তিনি এতই মুক্ত হস্তে আমাদিগের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। বল দেখি কখন কোন অভাব তুমি মায়ের নিকট জানাইয়াছ, আর তাহা তিনি পূরণ করেন নাই!

মা আমাদের এত ঐশ্বর্য্যশালিনী, আবার তিনি এরূপ দানশীলা, আবার আমরাই এই রাজ-রাজেশ্বরীর প্রজা ও সন্তান। বল দেখি আমাদের মত সৌভাগ্য আর কাহার আছে?

জননী সমান করেন পালন
সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর,
দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

কিন্তু আবার দেখিতে পাই কত তপস্যা করিয়া ও কত জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক তাপ সহ্য করিয়া সাধক শান্তি না পাইয়া

তাঁহাকে কঠোর নিষ্ঠুর বলিয়া, কত আদরের সহিত তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। মা, অবোধ সন্তান আমরা, তোমার এ লীলার যে কিছুই মর্ম্ম পাই না। চাতক একবিন্দু বারির জন্য দে জল, দে জল, বলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কত চীৎকার করিয়া গেল্ল তোমার দয়া হইল না, আবার কোথাও বা অযাচিত হইয়া অজস্র ধারে বারি বর্ষণ করিতেছ।

আবার দেখি Book of Job নামক গ্রন্থে ভক্ত শিরোমণি "জোব" কেবল বিপদের উপর বিপদ, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা শোকের উপর শোক ভোগ করিয়াও তোমাকে ছাড়েন নাই। চর্ম্ম চক্ষে দেখিলাম বেচারার উপর তোমার দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই। আমাদের ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা কে না জানে। এই সকল যখন ভাবি, তখন এইরূপ হয় কেন সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। তখনই আবার মায়ের অপার অনন্ত করুণা আমাদের স্মরণপথে পতিত হয়। তখন কবির সঙ্গে ভাবি এ সংসার আমাদের আরামের স্থান নহে ইহা কেবল পরীক্ষার ক্ষেত্রমাত্র।

এই সমস্ত বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থার মূল কারণ কি? তিনি আমাদের স্নেহময়ী জননী,আমরা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান। অকারণে আপন সন্তানসন্ততিদিগকে ক্লেশ, যন্ত্রণা দেওয়া কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা সময়ে সময়ে বুঝিতে পারি না কেন আমরা মধ্যে মধ্যে ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করি; কেন বিষাদে জর্জ্জরীভূত ও শোকে মুহ্যমান হই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয়, এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ দণ্ডভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন। দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়, অনুতপ্ত হইলেই দণ্ড-দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করেন।"

আবার দেখ কেহ কখন চিরকাল দুঃখ বা চিরকাল সুখ ভোগ করে না। এই সংসারে সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।" আবার প্রকৃতির গতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ,দিনের আলোকের পর রাত্রির অন্ধকার, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতকালের শীত, সুস্নিগ্ধ মলয় সমীরণ ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু এরূপ পরিবর্ত্তন সংসারে সততই ঘটিতেছে। সুখ দুঃখও তদ্রূপ।

আবার দুঃখ ভোগ না করিলে সুখের আস্বাদ কখনই পাওয়া যায় না। যদি কেহ চিরকাল সুখভোগ করিতেই রহিল তবে সুখের মূল্য কি? তাহার আস্বাদনই বা সে কিরূপে জানিতে পারিবে? তুলনা না করিলে মূল্য কিরূপে নিরূপিত হইবে।

এ ত গেল যুক্তি তর্ক, জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা। একবার ভক্তির চক্ষে দুঃখ কি ভাবিয়া দেখ দেখি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বর আমাদের স্নেহময়ী মাতা, আমরা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান। অকারণে আপন

সন্তান সন্ততিকে ক্লেশ দেওয়া কখনই মায়ের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সন্তান কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে পিতামাতা তাহার মঙ্গলের জন্য যেমন তাহাকে তাড়না করেন তদ্রূপ তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে তাড়না করিয়া থাকেন, আমরা যে দুঃখ শোক ভোগ করি সে কেবল আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম করুণার লক্ষণ।

"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ, মাগো,
সে কেবলই দয়া তব তুমি গো মা দুঃখহরা।
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই শিরে বহি মাগো দুখ সুখেরি পশরা।

ভক্তি ভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই। কেবল শুষ্ক জ্ঞান মানবের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ভক্তি চিত্তকে বিগলিত করে। ভক্তিযোগই মনুষ্যকে পরব্রহ্মের সন্নিহিত করে। এই ভক্তিযোগ বলেই সাধক চৈতন্যদেব ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং একদা জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে গীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে উপসংহারে তাহার দুই একটি কথার উল্লেখ করিলাম।

যিনি ভূতসকলের প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি সকলেতে কৃপাবান অথচ মমতাহীন এবং অহঙ্কারশূন্য, যিনি ক্ষমাবান, তিনিই যথার্থ ভক্ত।

যিনি লাভালাভ উভয়েই সতত প্রসন্ন চিত্ত এবং অপ্রমত্ত আর যিনি তাঁহার স্বভাবকে বশীভূত করিয়াছেন, ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে যিনি ঈশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত।

যাঁহা হইতে প্রাণিগণ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং যিনি স্বাভাবিক হর্ষাদি হইতে মুক্ত এবং যিনি অমর্ষ ত্রাশ ও উদ্বেগ মূন্য, যাঁহার চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় না তিনিই যথার্থ ভক্ত।

যিনি প্রার্থনা ভিন্ন স্বয়মাগত অর্থেও নিস্পৃহ এবং বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, যিনি আলস্যরহিত ও পক্ষপাত বর্জ্জিত এবং যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী তিনিই যথার্থ ভক্ত।

প্রিয় বস্তু পাইয়া যিনি তুষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও যিনি দ্বেষ করেন না এবং ইষ্টার্থ নাশ হইলেও যিনি শোক করেন না, অপ্রাপ্য অর্থে যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই এবং যাঁহার শুভাশুভ পুণ্য পাপ ত্যাগ করিবার অধিকার হইয়াছে তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

শত্রু মিত্রে যাঁহার সমান ভাব, মানাপমান উভয়েতেই যাঁহার সমান জ্ঞান এবং শীতোষ্ণ এবং সুখ দুঃখ হইতে যিনি বিশেষ রূপে সঙ্গবর্জ্জিত তিনিই যথার্থ ভক্ত।

নিন্দা এবং স্তুতি যে ব্যক্তির তুল্য, যিনি যথালাভে সন্তুষ্ট, যাঁহার মতি স্থির এবং চিত্ত বশীভূত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি যথার্থ ভক্ত।

উক্ত প্রকার ধর্ম্মই মোক্ষ সাধন হেতু এরূপ ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রিয়।

হে পরমাত্মন্, হে পতিতপাবন গুরুদেব, ভক্তিযোগ শিক্ষা দেও, যে ভক্তিযোগ দ্বারা তোমার সহিত নিত্য সহবাস লাভ করতঃ অহরহঃ তোমার সেবা ও তোমার চরণে প্রীতি-পুষ্প অর্পণ করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সুরাটে ব্রাহ্মসমাগম।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এ বৎসর সুরাটে (Theistic conference) একেশ্বরবাদিগণের সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় যে গবেষণা পূর্ণ ইংরাজি বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকাশ ও বিশেষত্ব এবং ভারতীয়

প্রাচীনত্বের সহিত উহার যোগ ও ঘনিষ্টতা অতি সুনিপুণভাবে ও সংক্ষেপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

আপনারা যে আমাকে এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম। যখন এই আসন পরিগ্রহ করিবার প্রস্তাব আমার নিকট প্রেরিত হয়, অনিচ্ছা বশতঃ নহে, কিন্তু নিজের ত্রুটিও যোগ্যতার অভাব অনুভব করিয়া প্রথমে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল আমার শক্তি যতই সামান্য হউক না, আমার উপরে গুজরাট প্রদেশের যথেষ্ঠ অধিকার আছে। এই গুজরাট প্রদেশেই আমি আমার কর্ম্ম-জীবনের প্রথম অংশ ক্ষেপণ করিয়াছি, আহমদাবাদের প্রার্থনা-সমাজ সাদরে আমাকে বেদী প্রদান করিয়াছিলেন। আমি আজ বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মসমাজের বার্ত্তা লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, যে জাতীয় ভাবের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা—জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়া উহার বিকাশ।

জাতীয়ভাব এবং সার্ব্বভৌমিকভাব ধর্ম্মের এই দুইটি দিক। প্রতি জাতির ভিতরে যেমন তাহার শিল্প-সাহিত্য ব্যবহার-শাস্ত্র আছে, ধর্ম্মেরও বিকাশ সেইরূপ। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম দেশের মধ্যে প্রচারিত হইলেও, জাতীয় ভাবের সহিত তাহার সকল সংস্রব পরিহার হয় না। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও প্রতি মনুষ্য তাহাকে বিশেষভাবে গঠন করিয়া লয়, অতীতের সহিত তাহাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে, জাতীয়ভাবে প্রচার করিতে সে বদ্ধপরিকর হয়। ফলতঃ প্রতি জাতির এমন কি প্রতি মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সংস্কার আছে, উহা সে ভূরি দর্শনে ও নিজ জীবনে উপলব্ধি করে; অপরের সহিত যাহার আদান প্রদান আদৌ চলিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম বিদেশ হইতে এদেশে আনীত হয় নাই। কিন্তু অতীতের সহিত ইহা অনুস্যূত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদিক সময়ের প্রকৃতিপূজার উপরে দৃষ্টি পড়ে। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আর্য্যেরা তাঁহাদের রচিত সুন্দর গাথায় শত্রু হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্য দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন, বল ভিক্ষা করিতেন। বেদের ভিতরে তিনটি ভাগ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; শ্রুতি বেদেরই নামান্তর মাত্র। শ্রুতির ভিতরে যাহা আছে, বেদরচয়িতাগণ যেন তাহা প্রত্যাদেশ বলে লাভ করিয়াছিলেন। স্মৃতি উহার অপর দিক্ অর্থাৎ যাহা ঋষিরা স্মরণে রাখিয়াছিলেন। যাগযজ্ঞ, বেদের ব্যাখ্যা ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি লইয়া সূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস স্মৃতির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

বেদের ভিতরে প্রতিমাপূজা নাই, সেখানে নরকের ভীষণ চিত্র নাই, জাতিভেদের কঠোরতা নাই, ভূতপ্রেতের বিভীষিকা নাই। জগতের বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় ঋষিরা বিস্ময়বিমুগ্ধ। তাঁহাদের ধর্ম্মের আর একটি দিক ছিল, তাঁহারা যাগযজ্ঞে নিরত ছিলেন, বেদে ইহারই পরিচয় মিলে। তাঁহারা এই বিশ্বাসে বলি প্রদান করিতেন, যে দেবতারা বলির বিনিময়ে তাঁহাদিগকে ধন দিবেন। সোমযাগের জন্য তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি মানিয়া চলিতেন। ক্রমে তাঁহাদের অর্চ্চিত মেঘ বিদ্যুতের প্রাচীন দেবতাগণ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিল, তাঁহারা কালসাধ্য যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনসাপেক্ষ যাগযজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। বেদের ভিতরে কোন এক বিশেষ দেবতার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন নাই, সকল দেবতাই প্রধান। ক্রমে এক ঈশ্বরের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভিতরে বিভিন্ন দেবতার বিদ্যমানতা ছিল বটে, কিন্তু দেবতারা স্ব স্ব প্রধান, তাঁহারা এক দেবতার অর্চ্চনা করিতে গিয়া অপর দেবতাগণকে অস্বীকার করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা এক ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া বলিয়া উঠিলেন

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ইন্দ্রং, যমং, মাতরিশ্বানমাহুঃ।

এক ঈশ্বরকেই পণ্ডিতেরা বহু করিয়া বলেন, কেহ বা ইন্দ্র, কেহ বা যম, কেহ বা মাতরিশ্বা (বায়ু) কহেন।

মিত্র ও বরুণ ইহাদের প্রভুত্ব সকলেরই উপরে। তাহারা ঋতের দেবতা, উহার সারথি ও পথপ্রদর্শক। বরুণ দেবতা সকলই দেখেন, সকলই জানেন, সকলকেই শাসন করেন; তাঁহার নিকট কেহই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। যে কেহ পাপ করে, বরুণ তাঁহার শাস্তি বিধান করেন। দয়াময় ও ক্ষমাশীল দেবতা তিনি।

বেদের ভিতরে বরুণের প্রতি একটি সুন্দর প্রার্থনা আছে। অনুবাদ এই—

১। বায়ু-চালিত মেঘের ন্যায় যদি আমি চঞ্চল ভাবে ধাবিত হই, তবে হে সর্ব্বশক্তিমন্! আমাকে কৃপা কর, আমাকে কৃপা কর।

২। দীনতাবশতঃ আমি প্রতিকূলে উপনীত হইয়াছি, হে ঐশ্বর্য্যবন্, নির্ম্মল পুরুষ, আমাকে কৃপা কর, হে ঈশ্বর! আমাকে কৃপা কর।

৩। জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা আক্রমণ করিয়াছে। কৃপা কর, হে ঈশ্বর, আমাকে কৃপা কর।

৪। হে বরুণ, যখন আমরা দেবতাদিগের সমক্ষে বিদ্রোহাচরণ করি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার ধর্ম্মলঙ্ঘন করি, তখন হে দেব! সেই পাপ হেতু আমাকে বিনাশ করিও না; আমাকে ক্ষমা করিও।

৫। হে বরুণ, আমার ভয় দূর কর। হে সত্যবন্ সম্রাট্, আমার প্রতি কৃপা কর। গোবৎসের বন্ধনের ন্যায় আমার পাপ সকল বিমোচন কর। তোমাকে ছাড়িয়া কেহ এক নিমেষ কালেরও প্রভু নহে।

৬। যাহারা তোমার প্রিয়কার্য্য-অনমুষ্ঠানজনিত পাপে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তোমার যে সকল অস্ত্র তোমার ইচ্ছামাত্র হনন করে, হে বরুণ সে অস্ত্র সকল আমার প্রতি নিক্ষেপ করিও না। আমাকে জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসিত করিও না। হিংসুকদিগকে দূর করিয়া দাও, যাহাতে আমি জীবন ধারণ করিতে পারি।

৭। পুরাকালে তোমার স্তবগান করিয়াছি, অদ্যাপি তোমার স্তবগান করিতেছি, আগামী কালেও হে সর্ব্বপ্রকাশ! তোমার স্তবগান করিব। হে দুর্দ্ধর্ষ!

তোমাকে আশ্রয় করিয়া অটল ধর্ম্মনিয়ম সকল যেন পর্ব্বতে খোদিত হইয়া রহিয়াছে।

৮। আমার কৃত পাপ সকল দূর করিয়া দাও, রাজন্, অন্যকৃত পাপের ফলও যেন আমাকে ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা এখনো অনুদিত রহিয়াছে। হে বরুণ! সেই সকল উষায় জীবিত রাখিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও।

মৃত্যুর পরে মনুষ্যের দশা কি হইবে, ইহা সকল যুগেরই জটিল সমস্যা। বৈদিক সময়ে যম পরলোকের পথ প্রথম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। উল্লেখ আছে, যাহারা সৎকর্ম্মশীল, যাগযজ্ঞরত, দানশীল, যোদ্ধা, ঋষি, তাঁহারাই সুখদ স্বর্গে যাইতে সক্ষম। সেখানে যম দেবতা ও পিতৃগণসহ বাস করেন। আর্য্যেরা সকলেই স্বর্গকামী ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরে চির বিশ্রাম লইবার জন্য লালায়িত হইলেন। সোমের উদ্দেশে ঋগবেদের ভিতরে "যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতং" যে মন্ত্র আছে তাহার অনুবাদ এই—

চির আলোক ও অনির্ব্বাণ সূর্য্যের বিকাশ যেখানে, সেই অমৃতলোকে, হে সোম! আমাকে লইয়া চল। বিবস্বতের পুত্র যেখানে রাজত্ব করে, প্রচ্ছন্ন স্বর্গ যেখানে, সমুদ্র যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর। তৃতীয় স্বর্গ, জীবন প্রমুক্ত যেখানে, অনন্ত গ্রহাদি যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর। সকল ইচ্ছা সকল কামনা যেখানে, সোমের পাত্র যেখানে, খাদ্য ও আনন্দ যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর। শান্তি ও আনন্দ যেখানে, হর্ষ ও উল্লাস যেখানে, ইচ্ছার পরিসমাপ্তি যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি জীবন্ত ভাবে ঋষিদিগের নেত্রে নিপতিত হইত। ঋষিরা মেঘ ও বায়ুর ভিতরে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিতেন। ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ, তাঁহারা বৃষ্টি অগ্নি বায়ু ঝটিকা ও সূর্য্যেতে দেখিতে পাইতেন। এই সকল বিভিন্ন প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধনায় এবং আপনাদের ঐহিক কল্যাণ মানসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তাঁহাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল এবং তাঁহারা হোম যাগাদির বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইরূপে যাগযজ্ঞাত্মক কর্ম্মকাণ্ড ঋষিদিগের অর্চ্চনা ও স্তুতিগীতের স্থান অধিকার করিয়াছিল। বেদের মন্ত্রভাগের পরে ব্রাহ্মণভাগের এইরূপে উৎপত্তি। ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে যে অংশ অরণ্যের সন্ন্যাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, আরণ্যক বলিয়া তাহা অভিহিত। উহাকেই উপনিষদের নামান্তর বলা যাইতে পারে। উহাই জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড হইতে উহা বিভিন্ন। বাহিরের দিকে দৃষ্টি যতই ক্ষীণ হইতে থাকে, অন্তর্জগতের ভাব ততই জাগিয়া উঠিতে থাকে। যাগযজ্ঞাদির পরিবর্ত্তে সাধনা প্রভাবে ঈশ্বরের নিকটে যাইবার ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা বলবতী হয়। আমরা এই সময়ে ধর্ম্মের দুইটি ভাব দেখিতে পাই। সংসারীর পক্ষে কর্ম্মমার্গ, সংসারত্যাগীর পক্ষে জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানমার্গীর নিকটে আত্মতত্ত্ব বিকশিত। পরন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিন্তনে দ্বৈতভাব ক্রমে ঘুচিয়া গিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাব আসিয়া পড়ে। উপনিষদের অধিকাংশে এই একীভাব উপদিষ্ট।

উপনিষদের কথা এই যে আপনাকে জান। আপনার ভিত্তিকে অনুসন্ধান কর। তিনি এক, যিনি সমগ্র জগতের অন্তঃস্তলে রহিয়াছেন। বেদের সর্ব্বপ্রাথমিক বাদনগীতি হইতে উপনিষদের যে গুরুগম্ভীর পরিণতি, তাহাই বেদান্ত বলিয়া খ্যাত।

উপনিষদের ঋষিরা কবি ছিলেন। তাঁহাদিগকে ঠিক দার্শনিক বলা যাইতে পারে না। এই কারণে উপনিষদের ভিতরে ধারাবাহিক ভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদের আকর নহে। ঈশ্বরবাদের প্রতিপোষক অনেক শ্লোক উহা হইতে বাহির করা যাইতে পারে। বেদের ভিতরে তেত্রিশটি দেবতা পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উপনিষদে একই দেবের প্রতিষ্ঠা—

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আদিত্যে স একঃ।

যিনি সূর্য্যে, যিনি মনুষ্যের আত্মাতে, তিনি এক। প্রকৃতির সকল দেবতা যে সেই ব্রহ্ম হইতে শক্তি লাভ করে, উহা কেনোপনিষদে বিবৃত আছে। ব্রহ্মের অধিষ্ঠানেই অগ্নি তৃণখণ্ডকে ভস্মসাৎ করে, বায়ু তাহাকে পরিচালিত করে। তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইলে সকলেই শক্তিহীন। কঠোপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়াতপ বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি"। শ্বেতাশ্বতরে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" এই শ্লোকে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মই স্রষ্টা; তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলই প্রসূত হইল। তিনিই বিশ্বের পালক ও রক্ষক, এই হেতু তিনি ঈশ্বর—ধাতা। "যো দেবোঽগ্নৌ" ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাই এত আনন্দ। তাঁহার আনন্দের কণামাত্র অন্যান্য জীব সকল সম্ভোগ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদি শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গীর কথোপকথনে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার পূর্ণ পরিচয় মিলে। সকল লোক ও গ্রহ নক্ষত্রাদি বিচূর্ণ হইয়া না যায়, তাই তিনি সেতু বলিয়া উপনিষদে চিত্রিত। তিনি 'কবির্মনীষী পরিভূঃ' সর্ব্বজ্ঞ মনিষী, তিনি সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি সকলের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিতেছেন। উপনিষদ পাঠে মোহিত বিখ্যাত দার্শনিক সোপেনহর Scopenhauer) বলেন "সমুদয় পৃথিবীতে উপনিষদের মত কল্যাণদ ও মনের উৎকর্ষবিধায়ক গ্রন্থ নাই; জীবনে ইহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুতেও সান্ত্বনা দিবে।"

আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক অন্ন যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের বিলক্ষণ পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ উপনিষদেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই উপনিষৎ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিরা অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মের সাধন ও তপস্যা করিতেন। কিন্তু আমরা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে চাই। যে ধর্ম্ম জীবনকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিতে পারে, যে ধর্ম্ম সৎ পিতা, স্নেহশীলা মাতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, বিশ্বস্ত স্বামী ও অনুকূলা স্ত্রী হইতে

শিক্ষা দেয়, আমরা সেই ধর্ম্মেরই ভিখারী, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহার লক্ষণ কি ?

১ম। এক জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা, প্রতিমা বিসর্জ্জন এবং বহু ঈশ্বরের স্থানে এক ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা।

২য়। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, মধ্যবর্ত্তিত্বের সম্পূর্ণ অভাব। ঈশ্বরকে আত্মার গভীরতম প্রদেশে মধ্যে অনুভব করা।

ঈশ্বরের বাণী নিজ কর্ণে শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতে হইবে। গুরু বা কোন মধ্যবর্ত্তী লোক তোমার জন্য মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে না। সকল ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণকে আমরা সম্মান করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিব না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ধর্ম্মের জন্য পিপাসা আছে। সে আপনার ধারণানুরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা করে। যাঁহারা জগতের পরিত্রাতা বলিয়া গণ্য,তাঁহারা আর যাহা করুণ কিন্তু তাঁহারা নিজে আমাদিগের জন্য মুক্তি আনিয়া দিতে পারে না। একজন অন্যকে মোক্ষ আনিয়া দিতে পারে না। আমার নিজের মুক্তি নিজেরই চেষ্টাই সাপেক্ষ। যখন বুদ্ধদেব সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ বুদ্ধদেবকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যথার্থই বলিয়াছিলেন,তোমরা নিজেই তোমাদের আলোক, তোমরা নিজেই তোমাদের গতি; বাহিরের আশ্রয়ের প্রয়াসী হইও না। ঈশ্বরের সমীপে নিজে নিজে বল যে হে পরমাত্মন্ ! অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, আমার নিকট প্রকাশিত হও। ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং আমরা তাঁহার পুত্র। ঈশ্বরের আদেশ—তাঁহার বাণী কোন বিশেষ দেশ বান কোন বিশেষ কালে নিনাদিত হয় না। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে আমরা বিমুখ নহি। সার্ব্বভৌমিক সত্যধর্ম্ম আমাদের। ভবিষ্যতে এ ধর্ম্ম সমস্ত জগতের ধর্ম্ম হইবার অধিকারী। অভ্রান্ত বলিয়া কোন ধর্ম্মকে বা ধর্ম্মপ্রচারককে বা ধর্ম্ম-সমাজকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া ধারণা করিতে গেলে সত্য হইতে মন সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, চিন্তার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। হিতাহিত জ্ঞান ও সদসৎ বিবেচনার নিকট সত্য পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিব। ঈশ্বরকে পাইবার পন্থা নিজেকেই অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে। মানব প্রকৃতি মূলক অভ্রান্ত ও অবিচলিত সত্যের উপরে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

সর্ব্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে যে একেশ্বরবাদী যাঁহারা, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া একত্রে কার্য্য করুন। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য-সমাজ সকলে মিলিয়া মিথ্যা-দেবতা ভ্রান্ত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। ইহাদের মধ্যে অনেকাংশে বিশ্বাসের একতা আছে। সকলেই ঈশ্বরকে রাজা ও পিতা বলিয়া স্বীকার করেন, মনুষ্যের ভ্রাতৃসম্বন্ধে বিশ্বাস করেন, নিরবলে, মুক্তিলাভের জন্য সকলেই লালায়িত, কর্ত্তব্য সাধনে সকলেই গৌরব অনুভব করেন, পবিত্রতালাভের জন্য সকলেরই চেষ্টা।

পণ্ডিত মোক্ষমূলার তাঁহার Sacred-Books of the East গ্রন্থে একস্থানে বলিয়াছেন, আজকালকার দিনে ইহাই বিশেষ শিক্ষনীয়, যে বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে আসল কোনটুকু, কোন্‌টুকুই বা বাহিরের আবরণ, কোন্‌টুকুই বা স্বর্গীয়ভাব, কোন্‌টুকুই বা মানবের মনঃকল্পিত, তাহা নির্ব্বাচন করা।

সকল শাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান সেই একই ঈশ্বর। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের ভাবুক ও উপাসক, তাঁহার মুখ দিয়া সেই পরিমাণে সত্য বিনির্গত হয়। বিভিন্ন জাতির ভিতরে যে কোন সাধু আপনাকে পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা কোন দেশে বা কালে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মমাত্রেরই মূল উপাদান এক, জ্ঞানের তারতম্যবশতঃ প্রকরণ ভেদমাত্র। ভ্রাতৃগণ আমাদিগকে উদার হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণমনা হইয়া অপরের ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" ঈশ্বর অভয়-বাণীতে সকলকে বলিতেছেন, যে যে ভাবে আমাকে পূজা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি ; কিন্তু সর্ব্বশেষে সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

আসন পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে জানাইতে চাই, যে কলিকাতায় ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলে উহার উন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত হউন। আপনারা স্থিরভাবে যে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, ইহার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদের সমক্ষে বর্ত্তুল গড়াইয়া দিলাম, আপনারা ইহাকে আরও অগ্রসর করিয়া দিন, যে পর্য্যন্ত না ইহা আমাদিগকে সম্মিলনের ভূমিতে লইয়া যায়।

নানা কথা।

সুরাট।—নানা কারণে সুরাটে কনগ্রেস বিভ্রাট ঘটিলেও সুরাটে Theistic conference একেশ্বরবাদী সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর, জজ চন্দাভার্কার, দামোদর দাস, গোবর্দ্ধন দাস, রাওবাহাদুর উমিয়াশঙ্কর, রমনভাই মহিপতরাম,প্রকাশ রাও, সায়েদ আবদুল কাদের,খ্যাতনামা দেশবিদেশস্থ একেশ্বরবাদী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজের স্বামী সত্যানন্দ ৯ই পৌষ সন্ধ্যায় প্রারম্ভিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরদিন প্রাতে বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এই যে "অনেকে নানা উদ্দেশে সভা সংস্থাপন কারেন, কিন্তু আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ নূতন। আমরা ঈশ্বরের দ্বারেই দেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রকৃতভাবে ব্যক্তিগত জাতিগত সর্ব্ববিধ উন্নতির উৎস ভগবান। তিনিই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন, যদি আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস রাখিয়া, পরস্পরকে প্রীতি করিয়া আত্মত্যাগের ভাবকে জাগাইয়া তুলিতে পারি।" ঐ দিন সন্ধ্যায় সুরাট টাউনহলে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজের সভা-

পণ্ডিত প্রবরের উমিয়াশঙ্কর সমাগত সভ্যগণকে সাদরে গ্রহণ করিলে দামোদর দাসের প্রস্তাবে ও প্রফেসর রুচিরামের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ আমরা অন্যত্র সন্নিবেশিত করিলাম। উহা সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

উদারতা।—মহারাজা গাইকবাড়, বরোদার একটি প্রাচীন মসজেদের সংস্কারের জন্য ২৩০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা তাঁহার বিরাট ও উদার হৃদয়ের পরিচয় বলিতে হইবে। প্রবুদ্ধ ভারত,ডিসেম্বর, ১৯০৭।

দীক্ষা।—এটোয়া জেলার অন্তর্গত বুণ্টায়া নামক স্থানে বিগত ৬ই নবেম্বর রাজপুত শুদ্ধি-সভার এক অধিবেশন হয়। ৩৭৫ জন রাজপুতকে, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে মুসলমান ধর্ম্মে জোর করিয়া দীক্ষিত হইয়াছিল প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হয়। সমবেত প্রায় ৮০০ শত ব্যক্তি নবদীক্ষিতগণের সহিত আহারাদি করেন। বুণ্টায়া সহরের রাজপুতেরা তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। বিলাতপ্রত্যাগত কৃতবিদ্য শত শত যুবাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজ দিন দিন কি দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছেন না। হায়! জ্ঞানোন্নত বঙ্গে যাহা না ঘটিল অন্যান্য প্রদেশে সে সংস্কার সহজেই ঘটিতেছে। আমাদের লজ্জার কথা বলিতে হইবে। প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর ১৯০৭।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, অগ্রহায়ণ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৩৪৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮৫৪৷৶০
সমষ্টি	...	৩১৮৯৲
ব্যয়	...	৩৬৪।৩
স্থিত	...	২৮২৪৷৷৶৩

আয়।

সম্পাদক ...য়রবাটীতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
২২৪৷৷৶৩

২৮২৪৷৷৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	...	২০৭৷৷০

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম পুত্রের অন্ন-প্রাশন উপলক্ষে
১ খণ্ড হাফ্‌ গিনি
৭৷৷০

২০৭৷৷০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩।০
পুস্তকালয়	...	৭৷৷০
যন্ত্রালয়	...	৮৫৸৶০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১০৲
সমষ্টি	...	৩৩৪৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৫৷৷৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২০৸৶৩
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	১৬৭৷৷৶০
সমষ্টি	...	৩৬৪।৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প

প্রথমভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

৭৭৫ সংখ্যা ১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মার্কস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। প্রতিদিন প্রভাতে স্মরণ করিও, রাত্রি আসিবার পূর্ব্বেই, কোন-না-কোন অনধিকার চর্চ্চাকারী ব্যক্তি, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, কটুভাষী ব্যক্তি,—কোন না কোন শঠ্ ঈর্ষা-পরায়ণ অসামাজিক বর্ব্বর ইতর ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে। ভাল মন্দের অজ্ঞতা হইতেই তাহাদের এই সমস্ত কুটিলতা ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় উৎপন্ন হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমি ভাল কাজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মন্দ কার্য্যের কদর্য্যতা বুঝিতে পারি; আমার ধ্রুব বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আমাকে বিরক্ত করিতেছে সে আমার আত্মীয়; এক রক্তমাংসের না হইলেও আমাদের উভয়ের মন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; কেন না, উভয়ই এক ঈশ্বর হইতে প্রসূত। ইহাও আমার ধ্রুব বিশ্বাস, কেহই আমার বাস্তবিক ক্ষতি করিতে পারে না, কেন না কেহই আমাকে বলপূর্ব্বক অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। আমার ন্যায় যাহার একই প্রকৃতি, যে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, কোন্ প্রাণে আমি তাহাকে ঘৃণা করিব—তাহার কথায় রাগ করিব? দুই হাত, দুই পা, দুই চোখের পাতা, উপরের ও নীচেকার দন্তপাঁতি যেরূপ পরস্পরকে সাহায্য করে, আমরাও সেইরূপ পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব পরস্পরের সহিত বিরোধ করা নিতান্তই অস্বাভাবিক। ক্রোধ ও বিদ্বেষের মধ্যে এইরূপ একটা অমিত্রোচিত ভাব প্রকাশ পায়।

২। এই কয়েকটি জিনিসে আমার জীবন গঠিত;—রক্তমাংস, নিঃশ্বাস ও একটি নিয়ামক অংশ। মনকে বিক্ষুব্ধ হইতে দিও না। ইহা নিষিদ্ধ। আর শরীরের কথা যদি বল,—শরীরকে এমনি ভাবে দেখিবে যেন এখনি তোমার মৃত্যু হইতেছে। কেন না, শরীর জিনিসটা কি?—একটু রক্ত, আর কতকগুলা অস্থি বই ত আর কিছুই নয়; স্নায়ু, শিরা, নাড়ী প্রভৃতির দ্বারা একখানি জাল বোনা হইয়াছে। তাহার পর, নিঃশ্বাস জিনিসটা কি?—একটু বাতাস, তাও আবার স্থায়ী নহে—ফুস্ফুস্ যন্ত্র ঐ বাতাসকে একবার বাহির করিয়া দিতেছে, আবার ভিতরে শোষণ করিয়া লইতেছে।

তোমার জীবনের তৃতীয় অংশটি—নিয়ামক অংশ। বিবেচনা করিয়া দেখ: তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ: এই উৎকৃষ্ট অংশটিকে আর দাসত্ব করিতে দিও না। যেন উহা স্বার্থপর বৃত্তিসমূহের দ্বারা চালিত না হয়; উহা যেন ভবিতব্যতার সহিত বিরোধ না করে, বর্ত্তমানে বিচলিত ও ভবিষ্যতের জন্য ভীত না হয়।

৩। দেবতাদের কাজের মধ্যে বিধাতার হাত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এমন কি, আকস্মিক ঘটনাও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; কেন না, যে কারণ শৃঙ্খলা বিধাতৃবিধানের অধীন, উহা সেই কারণশৃঙ্খলাপ্রসূত একটি কার্য্যমাত্র। বস্তুতঃ পদার্থ মাত্রই ঐ একই উৎস হইতে বিনিঃসৃত। তাছাড়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটা প্রয়োজন—একটা স্বার্থ আছে; তুমি সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি অংশমাত্র। অতএব বিশ্বপ্রকৃতিকে যাহা ধারণ করিয়া আছে, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক অংশেরও পক্ষে প্রয়োজনীয় ও হিতজনক; কিন্তু জগৎ, পরিবর্ত্তনের উপর স্থিতি করিতেছে, মৌলিক ও মিশ্রভূতের বিকার ও পরিণামের দ্বারাই জগৎ সংরক্ষিত হইতেছে। এক দিকে ক্ষতি হইলে, আর এক দিকে তাহা পূরণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হও, এবং ইহাকেই তোমার জীবনের বীজমন্ত্র করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আর আক্ষেপ করিতে হইবে না;—যাহা পাইয়াছ তজ্জন্য দেবতাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়া, হাসিতে হাসিতে এখান হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে।

৪। স্মরণ করিও, তোমার যাহা ইষ্টজনক তাহার প্রতি মনোযোগী না হইয়া, কতবার "আজকাল" করিয়া তাহা স্থগিত রাখিয়াছ, এবং দেবতারা তোমাকে যে সব অবসর দিয়াছেন তুমি তাহা হেলায় হারাইয়াছ। আর কালহরণ করিও না; এখন ভাবিয়া দেখ, কি প্রকার জগতের তুমি একটি অংশ, এবং কি প্রকার নিয়ন্তা-পুরুষ হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছে; একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমার কাজ করিতে হইবে; যদি তুমি এই সময়ের মধ্যে নিজের উন্নতিসাধন না কর, আত্মাকে উজ্জ্বল না কর, মনকে শান্ত না কর, তাহা হইলে, কাল তোমাকে শীঘ্র হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, আর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না।

৫। এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, তুমি মনুষ্য ও তুমি একজন রোমক; সম্পূর্ণ ও অকৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতাসহকারে প্রত্যেক কার্য্য সাধন করিবে। এবং এমন কোন কল্পনা ও খেয়াল মনে স্থান দিবে না যাহা ঐ সকল গুণকে বাধা দিতে পারে। প্রত্যেক কার্য্য তোমার জীবনের যেন শেষ কার্য্য,—এইরূপ মনে করিয়া যদি কাজ কর, যদি তোমার প্রবৃত্তি ও তৃষ্ণাদি তোমার প্রজ্ঞার বিরোধী না হয়, হঠকারিতা হইতে যদি দূরে থাক, কপটতা ও স্বার্থপরতা তোমাকে যদি স্পর্শ না করে, নিজ অদৃষ্টের জন্য তুমি যদি আক্ষেপ না কর, তবেই তাহা করা সম্ভব হইবে। দেখ, কত অল্প বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই, মানুষ দেবতার মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; কেন না, এই অল্প কতকগুলি কাজ করিলেই, দেবতারা মানুষের নিকট হইতে যাহা চাহেন তৎসমস্তই তাহার করা হয়।

৬। অন্তরাত্মা! এখনও কি তুই

আপনাকে অবমাননা করিবি। দেখ্, আপনাকে সম্মান করিবারও আর বড় সময় থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন এর-মধ্যেই প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; তথাপি আপনার প্রতি নির্ভর করিয়া তুই অন্যের হৃদয়ের উপর, তোর সুখকে স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস!

৭। আকস্মিক ঘটনা কিংবা বহির্বিষয়ে যেন তোমার মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া না থাকে। যাহাতে ভাল বিষয় শিক্ষা করিবার অবসর পাও এইজন্য মনকে শান্ত রাখিবে, বিনির্ম্মুক্ত রাখিবে,—বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনকে ভ্রমণ করিতে দিবে না। ইহা ছাড়া, আর একপ্রকার চাঞ্চল্য বর্জ্জন করিতে হইবে; কেন না, কেহ-কেহ ভারী ব্যস্ত, অথচ কিছুই করে না; তাহারা আপনাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলে, অথচ তাহাদের কোন গন্তব্য স্থান নাই, তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই—কার্য্যের কোন উদ্দেশ্য নাই।

৮। অপরের মনের কথা না জানিতে পারায় কোন লোক প্রায় অসুখী হয় না, কিন্তু যে আপনার মনের ভাবগতি না জানে সে নিশ্চয়ই অসুখী হয়।

৯। এই কথাগুলি সর্ব্বদাই হাতের কাছে থাকা আবশ্যক:—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি, আমার নিজের প্রকৃতি,—এই উভয়েরর মধ্যে কি সম্বন্ধ, কি প্রকার সমষ্টির ইহা কি প্রকার অংশ, আমি যে মহাসত্তার অংশ সেই সত্তার অনুসারী কাজ করিতে,—কথা কহিতে কোন মর্ত্ত্য মানব আমাকে বাধা দিতে পারে না;—এই সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

১০। থিওফ্রেটস্ মানব-কৃত অপরাধের তারতম্য তুলনা করিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর মত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন:—ক্রোধ-প্রসূত অপকর্ম্ম অপেক্ষা বাসনা-প্রসূত অপকর্ম্ম আরও গুরুতর। কারণ, যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কষ্টের সহিত বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করে, এবং তাহার চৈতন্য হইবার পূর্ব্বেই সে সংযমের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখের লালসায় অভিভূত হইয়া, যথেচ্ছাচার করে, সে আত্ম-কর্ত্তৃত্ব হইতে ও মনুষ্যোচিত সংযম হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব তিনি তত্ত্বজ্ঞানীর মতোই এই কথা বলিয়াছেন যে,—যে ব্যক্তি দুঃখের সহিত পাপাচরণ করে, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি সুখের সহিত পাপাচরণ করে সেই অধিক অপরাধী। কারণ, প্রথম ব্যক্তি কতকটা অপরের আঘাতে ব্যথিত, এবং সেই ব্যথাই তাহার ক্রোধকে উত্তেজিত করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তি হইতে কার্য্য আরম্ভ করে এবং কেবল বাসনার বশেই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

১১। তোমার সমস্ত কর্ম্ম, বাক্য ও চিন্তাকে এই অনুসারে নিয়মিত করিবে; কেন না, এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে। আর এই মৃত্যুটা এতই-কি গুরুতর ব্যাপার? যদি দেবতারা সত্যই থাকেন, তবে তোমার কোন কষ্ট নাই, কারণ, তাঁহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিবেন না। যদি তাঁহারা না থাকেন, অথবা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন—তবে আর কিসের চিন্তা? দেবতাহীন কিংবা বিধাতৃহীন জগতে থাকিয়া কি লাভ?—ওরূপ জগতে না থাকাই ভাল। কিন্তু বাস্তবপক্ষে, দেবতারা আছেন এবং মানুষের ব্যাপারে তাঁহাদের সংস্রব ও

মমতা আছে, ইহাতে সংশয় নাই। যাহা প্রকৃত দুঃখ তাহাতে মানুষ যাহাতে পতিত না হয়, তাঁহারা তাহাকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন। যদি অন্য দুঃখ কষ্ট বাস্তবিকই অমঙ্গল হইত, তাহা হইলে উহা বর্জ্জন করিবার শক্তিও তাহাকে দিতেন। কিন্তু যাহা মানুষকে হীন না করে, তাহা তাহার জীবনকে হীন করিবে কি করিয়া? আমি এ কথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বিশ্বপ্রকৃতি কেবল জ্ঞানের অভাবে, এই সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথবা জানিয়া-বুঝিয়াও শুধু শক্তির অভাবে এই ত্রুটি নিবারণ কিংবা সংশোধন করিতে পারেন নাই; অথবা শক্তি কিংবা দক্ষতার অভাবে, সৎ ও অসৎ ব্যক্তির জীবনে ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষভাবে ঘটিতে দিয়াছেন। ফলতঃ, জীবন মৃত্যু, মান অপমান, সুখ দুঃখ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য—এই সকল জিনিস—কি পুণ্যবান কি পাপী,—সকলেরই ভাগ্যে সমানরূপে নির্দ্দিষ্ট। কেন না এই সকল জিনিসে কোন প্রকৃত হীনতা বা মহত্ব নাই; এবং সেই জন্যই আসলে উহা ভালও নহে, মন্দও নহে।

১২। বিবেচনা করিয়া দেখ, পদার্থ সকল কত শীঘ্র বিশ্লিষ্ট ও বিলীন হইয়া যায়;—পদার্থ সকল জগৎ-বস্তুর মধ্যে এবং তাহাদের স্মৃতিগুলি কাল ও মহাকালের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলা কিরূপ,—বিশেষতঃ সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলা যাহা আমাদিগকে সুখ দিয়া মুগ্ধ করে, কষ্ট দিয়া ভয় দেখায়, কিংবা ফাঁকা সুখ্যাতির জন্য আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করে। একটু চিন্তা করিলেই জানিতে পারিবে, এই সমস্ত জিনিস কি অপদার্থ, কি জঘন্য, কি ক্ষুদ্র, কত শীঘ্র উহা শুষ্ক হইয়া যায়—মরিয়া যায়। জানিতে পারিবে, সেই সকল লোকগুলাই বা কিরূপ যাহাদের খেয়ালের উপর—যাহাদের প্রশংসার উপর, এই সুখ্যাতি নির্ভর করে। মৃত্যুর প্রকৃতি কি তাহাও জানিতে পারিবে। মৃত্যু হইতে যদি মৃত্যুর আড়ম্বর ও বিভীষিকাকে অপনীত কর তাহা হইলে দেখিবে, উহা একটা প্রাকৃতিক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতির কার্য্যকে যে ভয় করে, সে নিতান্তই শিশু; মৃত্যু শুধু প্রকৃতির কার্য্য নহে, উহা প্রকৃতির হিতজনক কার্য্য। সর্ব্বশেষে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ,—আমাদের সত্তার কোন্ অংশের সহিত এবং সেই অংশের কোন্ বিশেষ অবস্থার সহিত ঈশ্বরের যোগ।

১৩। যে ব্যক্তির কৌতূহল কেবল বহির্বিষয়েই বিচরণ করে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। অনেকে অন্যের মনের ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য খুবই ব্যস্ত, কিন্তু তাহারা বিবেচনা করেনা—আপনার অন্তরে যে দেবতা রহিয়াছেন সেই অন্তর্দেবতার পূজা অর্চ্চনা ও সেবা করিলেই যথেষ্ট হয়। সমস্ত উগ্র প্রবৃত্তি, সকল প্রকার মন্দভাব, হঠকারিতা ও মিথ্যাভিমান, দেবতা ও মনুষ্যের প্রতি অসন্তোষ—এই সমস্ত হইতে চিত্তকে বিমুক্ত ও পরিশুদ্ধ রাখা—ইহাই অন্তর্দেবতার পূজা-অনুষ্ঠান। দেবতারা জগতের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন—এই জন্য দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করা কর্ত্তব্য, এবং মনুষ্যগণের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মানুষের কাজকেও আমাদের ভালভাবে দেখা উচিত। তাছাড়া ভাল মন্দর জ্ঞান না থাকা প্রযুক্ত

অনেক সময়ে মানুষের প্রতি কৃপাদৃষ্টিও করিতে হয়। অন্ধব্যক্তি যেরূপ সাদা কালোর প্রভেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ নৈতিক গুণ সমূহের প্রভেদ বিচার করিতে না পারাও একটা স্বভাবের ন্যূনতা।

১৪। যদি তুমি তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার বৎসরও বাঁচিয়া থাক, তবু স্মরণ রাখিও, যে জীবন এখন তুমি যাপন করিতেছ সেই জীবন ছাড়া আর কোন জীবন তুমি হারাইবেনা; অথবা যে জীবন তুমি হারাইবে সে জীবন ছাড়া তোমার আর কোন জীবন নাই। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প-স্থায়ী জীবন গণনায় একই। সর্ব্বস্থলেই, বর্ত্তমানের স্থায়িত্ব সমান। অতএব প্রত্যে-কেরই নাশের পরিমান একই রূপ—ইহা কালের একটি বিন্দুমাত্র; কেহই অতীত ও ভবিষ্যৎকে হারাইতে পারে না। কেননা যাহার যে জিনিস নাই সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কি করিয়া? এই সমস্ত কারণে দুইটি তত্ত্ব শুধু আমাদের মনে রাখিতে হইবে। একটি এই—প্রকৃতি চক্র-গতিতে ভ্রমণ করে—সমস্ত অনন্ত কাল, তাহার একই মুখ প্রকাশ পায়। সুতরাং কোন মানুষ একশত বৎসর, দুই-শত বৎসর, কিংবা আরও অনেক বৎ-সর বাঁচিল—তাহাতে, কি যায় আসে? ইহাতে তাহার এইমাত্র লাভ হয়, সে একই দৃশ্য অনেকবার দেখে। আর একটি কথা এই, যখন দীর্ঘজীবী ও অল্পজীবী ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহাদের ক্ষতি একই রূপ। যে বর্ত্তমান তাহাদের আছে সেই বর্ত্তমানকেই তাহারা হারায়, কেন না, যাহার যে জিনিস নাই তাহাকে হারান বলা যায় না।

১৫। "সিনিক্" সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞানী মনিমস্ (Monimus) বলিতেন, পদার্থ মাত্রই মনের ভাব। এই উক্তিটিতে যে টুকু সত্য আছে, শুধু যদি সেই টুকুই গ্রহণ করা যায়, তবেই উহার দ্বারা কিছু উপকার দর্শিতে পারে।

১৬। কোন মনুষ্যের আত্মা নানা প্রকারে আপনাকে পীড়া দিতে পারে। প্রথমতঃ যখন কাহারও আত্মা স্ফোটকের ভাব ধারণ করে—জগতের পৃষ্ঠে একটা অধিমাংস হইয়া অবস্থিতি করে—সেই এক প্রকার পীড়া। কোন প্রাকৃতিক ঘটনায় উত্যক্ত হইলে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইতে আপনাকে বিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য কাহাকে বিদ্বেষ করে, কিংবা কাহারও অনিষ্ট কামনা করে, তাহা হইলেও তাহার আত্মার ঐ একই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ, সুখ কিংবা দুঃখে অভিভূত হইলে, চতুর্থতঃ, কর্ম্মে ও বাক্যে ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ করিলে, পঞ্চমতঃ, কি কাজ করিতেছ না জানিয়া উদ্দেশ্যহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেও আত্মার অনিষ্ট করা হয়। অতি ক্ষুদ্র কাজ হইলেও তা-হার একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। বুদ্ধি বিবেচনা ও বিধিব্যবস্থা-অনুসারে চলাই জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য।

১৭। মনুষ্যজীবনের পরিমাণ একটি বিন্দুমাত্র; এই জীবনের বস্তু ক্রমাগত ভা-সিয়া চলিয়াছে, ইহার জ্ঞানদৃষ্টি অতীব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট এবং ইহার সমস্ত উপাদান গলিত হইবার দিকে উন্মুখ। মন একটা আবর্ত্ত বিশেষ। ভাগ্যের কথা কিছুই অনু-মান করা যায় না। এবং যশের কোন ভাল মন্দ বিচার নাই। এক কথায়, আমাদের শরীর,—নদীর প্রবাহবৎ; আমাদের মন—স্বপ্ন ও জলবিম্ববৎ। মানব-জীবন শুধু এক-

প্রকার সংগ্রাম ও দেশভ্রমণ,এবং যশের শেষ পরিণাম—বিস্মৃতি। মনুষ্যের মধ্যে টিকিয়া থাকে তবে কোন্ জিনিস্?—তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই না। এখন তত্ত্বজ্ঞানের কাজটা কি? তত্ত্বজ্ঞানের কাজ,—আমাদের অন্তর্দেবতাকে অনিষ্ট ও অপমান হইতে রক্ষা করা—সুখ দুঃখ হইতে উচ্চতর ভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করা, অব্যবস্থিতরূপে, ছদ্মভাবে ও ছলনাপূর্ব্বক কোন কাজ না করা এবং অন্যের মনোভাবের নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থিতি করা। তাছাড়া, তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়,বস্তু সকল যে ভাবে আসিবে মন যেন তাহাই গ্রহণ করে; যাহার ভাগ্যে যে জিনিস পড়িবে তাহাই যেন সে মানিয়া লয় —কোন আপত্তি না করে; কেন না, মন যে কারণ হইতে উৎপন্ন—এই জিনিস্গুলিও সেই একই কারণ হইতে উৎপন্ন। সর্ব্বোপরি, মৃত্যুকে সহজ ভাবে দেখিবে; ইহা আর কিছুই নহে—প্রত্যেক বস্তু যে পঞ্চভূতে গঠিত, উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই পঞ্চভূতেই আবার মিশিয়া যায় এই মাত্র। দেখ, স্বয়ং পঞ্চভূত যদি পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে যদি তাহাদের গঠিত সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তিত ও বিলীন হইয়া যায় তাহাতে কি হানি? কেন তবে মানুষ উহাদের পরিণামে এত চিন্তিত হয়? ইহা প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ত আর কিছুই নহে; আর প্রকৃতি কখনই কাহার অনিষ্ট করে না।

বেদ উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপনিষদ বেদের বহু দেবতা হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মে গিয়া উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, বৃহ্ ধাতু যাহা হইতে বৃহৎশব্দ হইয়াছে। বৃহচ্চ তদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপং;—সেই বৃহৎ দিব্য অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মের এই বিশেষণ।

ব্রহ্ম কিনা যিনি সকল হইতে বৃহৎ, সকল হইতে মহৎ, যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যিনি আদি কারণ, সর্ব্ব মূলধার; যিনি সর্ব্বদেশ ব্যাপী, যিনি সকলকালে বিদ্যমান। উপনিষদ ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলেন যে ঋক্ যজুঃ সাম বেদের ইন্দ্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতি যে সকল উপাস্য দেবতা তাহারা কখনো ব্রহ্ম নহে। 'নেদং যদিদমুপাসতে।' বৈদিকেরা যে সকল পরিমিত দেবতার উপাসনা করে তাহারা কখনো ব্রহ্ম নহে কিন্তু যে অনন্ত পুরুষের শাসনে জগতের কল্যাণ সাধনে ইহারা সকলে নিযুক্ত রহিয়াছে তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষদের ঋষিরা জ্ঞানমঞ্চে আরোহণ করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে ইন্দ্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা সকলেই পরিমিত,—সকলেই অল্প,সকলেই ক্ষুদ্র, ইহারা স্বয়ম্ভূ নহে, ইহারা আপনাকে আপনি প্রকাশ করে নাই; ইহারা স্বতন্ত্র নহে, ইহারা আপনারা ও আপনার নিয়ন্তা নহে; ইহারা যাঁহা কর্ত্তৃক এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছে, যাঁহা হইতে স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় আর কেহই নাই। এই ভাব তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকাতে বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই আখ্যায়িকা এইঃ—

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত

ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয় বিধান করিলেন; ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতারা ব্রহ্মের অনুগ্রহে অসুরদিগের উপর জয়লাভ করি-

লেন। ব্রহ্ম তাহাদিগকে এই জয় প্রদান করিলেন, দেবতারা স্বীয় স্বীয় অভিমান দোষে তাহা জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন আমরাই আমাদের ক্ষমতাতে বিজয়ী হইলাম, আমাদের এই জয়, আমাদেরই এই মহিমা। অস্মাকমেবায়ং বিজয়ো অস্মাকমেবায়ং মহিমা। ব্রহ্ম তাঁহাদের এই অভিমান দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না এই যে দীপ্যমান পূজনীয় পুরুষ, ইনি কে? তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন হে অগ্নি, হে জাতবেদঃ তুমি আমাদের মধ্যে অতীব তেজস্বী, যাও তুমি ইঁহার নিকটে গিয়া জানিয়া আইস, ইনি কে? অগ্নি তাঁহার নিকট গেলেন। ব্রহ্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোঽসি—তুমি কে? অগ্নি দর্প করিয়া কহিলেন-অগ্নির্বাহমস্মীতি জাতবেদোবাহমস্মীতি। আমি অগ্নি আমি জাতবেদা। ব্রহ্ম তাহাকে বলিলেন—

তস্মিন্ ত্বয়ি কিংবীর্য্যং

তুমি যে অগ্নি তোমাতে কি শক্তি আছে?

তিনি উত্তর করিলেন—

অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।

এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে তাহা সকলই আমি দগ্ধ করিতে পারি। ব্রহ্ম তাহাকে একটি তৃণ দিলেন ও বলিলেন ইহারে দগ্ধ কর। তিনি মহাবেগে আপনার সকল তেজ তাহাতে নিয়োগ করিলেন তথাপি সেই তৃণটিকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। আপনাকে শক্তিহীন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দেবতাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আমি চিনিতে পারিলাম না, এই অচিন্ত্যশক্তি পূজনীয় পুরুষ কে? তখন তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন—হে বায়ু যাও তুমি ইঁহাকে অবগত হইয়া আইস। বায়ু তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? বায়ু দর্প করিয়া বলিলেন—

বায়ুর্বাহমস্মীতি মাতরিশ্বাবাহমস্মীতি

আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন তুমি যে মাতরিশ্বা বায়ু তোমার কি শক্তি? তিনি উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি সকলই হরণ করিতে পারি। ব্রহ্ম সেখানে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, এখান হইতে ইহা গ্রহণ কর দেখি। তিনি তাহাতে আপনার সমুদয় তেজ নিয়োগ করিলেন তথাপি তাহা কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। আপনাকে শক্তিহীন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দেবতাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন আমি চিনিতে পারিলাম না এই অচিন্ত্যশক্তি পূজনীয় পুরুষ কে? পরে তাঁহারা ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্ তুমি আমাদের সকলের রাজা; যাও, তুমি ইহার নিকটে গিয়া ইঁহাকে অবগত হইয়া আইস। ইন্দ্র তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন। ইন্দ্রের রাজ পদের অতীব গর্ব্ব ও অহঙ্কার জানিয়া ব্রহ্ম তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। বরং তিনি অন্যান্য দেবতাকে দেখা দিয়াছিলেন, ইন্দ্রকে একবার দেখাও দিলেন না।

সেই স্থানে বহুশোভমানা স্ত্রীরূপিনী হৈমবতী উমা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ইনি মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্র সেই অলঙ্কারবতী রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই দীপ্যমান্ পূজনীয় পুরুষ যিনি এইমাত্র এইখানে ছিলেন, তিনি কে? ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেন ইঁহাকে তোমরা জান না, ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা আপনার আপনার মহিমা বড় মনে করিতেছিলে, তাহা ঠিক নহে। তিনিই তো-

মাদের জয়দাতা। তোমরা যে অভিমান বশে আত্মসামর্থ্যে গর্ব্বিত হইয়াছিলে তোমাদের সে গর্ব্ব বৃথা। তোমাদের স্বস্ব সামর্থ্য ব্রহ্মশক্তি হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্মবলেই তোমরা বলীয়ান্—এই বলিয়া সেই মহনীয় মহিলামূর্ত্তি আকাশে লীন হইয়া গেল।

ব্রহ্মবিদ্যার এই উপদেশে ইন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি জানিতে পারিলেন যে ব্রহ্মশক্তি হইতে পৃথক্ ভাবে—স্বাধীন রূপে প্রকৃতির কোন শক্তিই কার্য্যকারিণী হইতে পারে না। ব্রহ্মই এই বিশ্ব প্রকৃতির তাবৎ শক্তির মূলশক্তি। এই মহা একত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য। আধিভৌতিক শক্তির ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি ও ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই ব্রহ্মশক্তির বলেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন পুষ্টিলাভ করে। সেই শক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা সাহস পাই, বল পাই, এমন কি পর্ব্বতকেও বিচলিত করিতে পারি—তাহা হইতে বিযুক্ত হইলে নিরুদ্যম নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ি—এমন কি একটি তৃণকেও নড়াইতে পারি না। ব্রহ্মবলই বল; যখন আমরা আপনার আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি তখনই দুর্ব্বল। উপনিষদের ঋষিরা বহু হইতে এই মহা একত্বে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা পরব্রহ্মকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু তখনকার অজ্ঞান-তমসাবৃত লোকসমাজের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সাধারণের মধ্যে সে জ্ঞান প্রচার করিতে উৎসাহী হইলেন না। তাঁহারা এই সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। যাহারা গৃহী থাকিবেক তাহারা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে পরিমিত দেবতার উপাসনা দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

ইহলোকে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠান করত শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক। আর যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানার্জ্জনে ব্রতী হইবেন তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভৈক্ষ্যাচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনাতে রত থাকিবেন।

তেহ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভৈক্ষ্যাচর্য্যং চরন্তি—

তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্ত কামনা, ও লোককামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলে রত থাকিবেন।

যে কালে উপনিষদের শিক্ষা আরম্ভ হইল সেকালে অল্প লোকেই তাহা লাভ করিবার উপযুক্ত ছিলেন। জনসমাজের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানসূর্য্য প্রবেশ করিতে পারিল না। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই উপনিষদের অধিকারী হইলেন। সাধারণের মধ্যে যেমন যাগ যজ্ঞ উপাসনাদি প্রচলিত ছিল তাহাই থাকিল। সুতরাং উপনিষদের দ্বারা সাধারণের যে উপকার হওয়া, তাহা হইল না। তাঁহারা সত্য লাভ করিয়া আপনারাই তৃপ্ত হইলেন, আপনারাই বিজনে গিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত রহিলেন। এই জন্য উপনিষদের প্রথম কল্পের নাম আরণ্যক। ইহা অরণ্যের ফল, গৃহী ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই। উপনিষৎ কেবল অরণ্যে বসিয়াই পড়িতে হইবে, গৃহস্থের ঘরে তাহা পড়িতে নাই। 'অরণ্যে অধীয়ীত।' অরণ্যে তাহা অধ্যয়ন করিবে। জনশূন্য হিমালয়ের চূড়াতে রত্নরাজি নিহিত থাকিলে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হয়, সন্ন্যাসীদিগের হস্তে উপনিষৎ সেই প্রকার হইল। উপনিষদের ঋষিরা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন,

তাহা তাঁহাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিল, সাধারণ জনসমাজে প্রচারিত হইল না। আমরা এখন বহুকালব্যাপী সুগভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞান সমগ্র লোকসমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছি।

সেই আদিমকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমে উন্নত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা আচম্বিতে আকাশ হইতে পতিত হয় নাই। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত নূতন সৃষ্টি নহে। অতীতের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহা পিতৃপুরুষদিগের সঞ্চিত ধন। আমরা এই পৈতৃক ধনের অধিকারী এই আমাদের সৌভাগ্য। এখানকার প্রথম গ্রন্থ বেদ, তাহা অরুণ কিরণের ন্যায় সেই আদিমকালে উদিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই উপনিষদে জ্ঞানসূর্য্যের প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। বেদে প্রাকৃতিক দেবতাদের উপাসনা ছিল; উপনিষদে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা অরণ্যে অরণ্যে হইত; এখন সেই উপাসনা ঈশ্বরের প্রসাদে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই আমাদের সঙ্কল্প। সিদ্ধিদাতা বিধাতা আমাদের এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করুন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, পিতামাতার সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্রকে পালন করিতে হইবে, স্বজন বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে, এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি প্রতি গৃহে পত্তন করিতে চাও, তবে হে ব্রাহ্মগণ! অগ্রে তোমাদের আপন আপন হৃদয়ে তাহাকে পত্তন কর। তোমাদের শরীর মন আত্মাকে সামঞ্জস্যরূপে রক্ষা কর, যুক্তাহার বিহার দ্বারা শরীরকে বলিষ্ঠ কর। জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা মনকে উন্নত কর এবং কর্ত্তব্য-সাধন ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র কর, তবে সহজেই তোমাদের শুভ-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে —সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্য পরায়ণ হও; যে সত্য বরণ করিয়াছ তাহা প্রাণপনে পালন কর। ক্ষমাশীল হও; তোমার অনিষ্টকারীর প্রতিও বিদ্রোহাচরণ করিও না—যে তোমার অহিতচিন্তা করে তাহারও তুমি কুশল কামনা করিবে। ধর্ম্মং চর—চরিত্রবান্ হও, সংযত হও, ধর্ম্মের আদেশে আপাতরম্য বিষয় সুখ বিসর্জন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। তোমাদের মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার সঙ্কীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা উপধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক, সদ্ভাব সরলতা দয়া দাক্ষিণ্যগুণে তোমাদের জীবন শোভমান হউক, কলহ বিবাদ বিদ্বেষ দূরে গিয়া তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ়তর হউক, ঈশ্বরপ্রেম হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউক, এই আমার আশীর্ব্বাদ, পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই আমার প্রার্থনা।*

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে উপাসনা-সভায় শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই বক্তৃতা পাঠ করেন।

মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই। তাঁহারা যখন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন আমারদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা যে জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে

---

* বেহালা ব্রাহ্মসমাজে পঠিত।

কার্য্য শেষ হয় না; যাহা কিছু অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, মৃত্যুর পরে তাহা সম্পূর্ণ হয়। শুভক্ষণে তাঁহাদের জন্ম, তাঁহাদের জীবন মনুষ্যের হিতসাধনে অতিবাহিত হয়, মরণও জীবের কল্যাণজনন। মরণে তাঁহাদের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় না। তাঁহাদের জীবনের অমূল্য দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের অকথিত বাণী, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি পরবর্ত্তী যাত্রীদিগের পথের সম্বল হয়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

মহাপুরুষচরিতে গীতার এই মহাবাক্য সপ্রমাণ হয়। ভগবান জগতের মঙ্গল উদ্দেশে যথাযোগ্য সময়ে তাঁহার এক এক প্রিয় পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সত্যের প্রভা ম্লান হয়, যখন ধর্ম্ম কতকগুলি ক্রিয়াজালে জড়িত হইয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে, যখন মনুষ্যসমাজে আসুরিক ভাব দেবভাবের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন কোন এক মহাপুরুষ ভগবানের দূতরূপে আবির্ভূত হইয়া সত্যের জয় ঘোষণা করেন, বিপথগামীদিগকে সৎপথে আনয়ন করেন, মানবসমাজকে অশেষ দুর্গতি হইতে উদ্ধার করেন। তিনি যেখানে পদার্পণ করেন, সেখানে ফুল ফুটিয়া উঠে, সত্যের আলোক বিকীর্ণ হয়, অমঙ্গল তিরোহিত হয়।

অমৃতনিকেতনের যাত্রী যে আমরা, আমাদের লক্ষ্য যে সুদূর, পথে বিঘ্নবিপত্তি রাশি রাশি, আমরা এই জীবন সংগ্রামে পিপাসায় প্রাণান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ি। আমরা বিবাদ বিচ্ছেদ দলাদলিতে ছিন্ন ভিন্ন বিশৃঙ্খল হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত, এমন সময় ভগবানের দূত আসিয়া আমারদিগকে আশ্বস্ত করেন, মৃত প্রাণকে সজীব করেন, নিরুৎসাহকে উৎসাহ দান করেন, বিপন্নকে উদ্ধার করেন। তাঁহার পরশে যে দুর্ব্বল সে সবল হয়, যে ভীরু সে সাহস পায়, হতাশ বিমর্ষ চিত্তেও আশার সঞ্চার হয়। এই সকল মহাত্মা মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর পরেও অলক্ষিত ভাবে তাঁহারা কার্য্য করিতে থাকেন।

হে পিতৃদেব! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছ। আমরা এতদিন মহাতরুর আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিত ছিলাম, এখন তাহার অভাবে আশ্রিত লতার ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের উপর দিয়া কত বাত্যা ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টি বহিয়া যাইতেছে, আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে একে একে সকলেই তিরোহিত হইতেছে, আমরা কোন প্রকারে আপনাদিগকে এই সকল উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। কিন্তু সত্যসত্যই কি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ? এই তিন বৎসর কাল তুমি আমাদের নিকট অদৃশ্য রহিয়াছ সত্য বটে; আমরা তোমাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না, তোমার মধুর বাণী শুনিতে পাই না, কিন্তু সত্যই কি তুমি আমাদের সঙ্গে নাই? তুমি আছ; তোমার শরীর নাই, কিন্তু তোমার আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছ। তুমি আছ—আমরা যখন বিপদগ্রস্ত হই, তখন তুমি তোমার হস্ত উত্তোলন করিয়া অভয়দান কর, যখন নিরুৎসাহ হই, তখন উৎসাহ দান করিয়া ধর্ম্মের প্রভা উদ্দীপ্ত কর। তুমি নিজে ধর্ম্মের জন্য যে কত সংগ্রাম করিয়াছ, তোমার প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে কত দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছ, তাহা আমরা তোমার আত্মজীবনীতে পড়িয়াছি কিন্তু তোমার অন্তরের

আকুলতা প্রত্যক্ষ করি নাই। তোমাকে যখনি দেখিয়াছি, তোমার সেই উৎসাহজনন প্রফুল্ল বদন দর্শন করিয়াছি, তোমার হৃদয়-গ্রাহী উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তা-হাই আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। আমরা যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি তখন কি দেখি? এই যে ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াতে পরিণত—আর দেখি যে অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের মূর্ত্তি গড়িয়া লোকেরা পরিমিতভাবে তাহার পূজা করি-তেছে। তুমি তোমার জীবদ্দশায় ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ। আমরা তোমার প্রসাদাৎ জানিয়াছি যে ধর্ম্ম কেবল বাহ্যিক আচার নহে। ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু, এমন খাঁটি জিনিস যে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা যায়, আত্মবিসর্জ্জন করা যায়। এক সময় যখন আমাদের সাংসারিক অবস্থা ঘোর শঙ্কটাকীর্ণ হইয়াছিল, পাওনাদারেরা আসিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত, তখন তুমি সকল ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলে। বলিলে যে গায়ে একখণ্ড পরিধান-বস্ত্র থাকিতে, হাতে একটি কাণাকড়ি থাকিতে কোর্টে গিয়া 'আমার কিছুই নাই' এ কথা বলিতে পারিব না। তখন সর্ব্বত্যাগী হইয়া তুমি পরমধন লাভ করিলে।

তুমি যখন জানিলে যে তোমার উপাস্য দেবতা যিনি, তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার ভূমা অনন্তস্বরূপ, তখন উপদেবতাদিগের পূজা পরিহার করিয়া তাঁহাকেই ধরিয়া রহিলে, তোমার অন্তরের বিশ্বাসকে অনু-ষ্ঠানে পরিণত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না, তাহাতে গৃহবিচ্ছেদ বৈষয়িক ক্ষতি কিছুই গ্রাহ্য করিলে না। তোমার প্রিয়তমের জন্য সংসারের আর আর প্রিয়-জনকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে না। তুমি বলিলে "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন, ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।" ধর্ম্ম যে কি সার বস্তু, নিরাকার ঈশ্বর যে আমাদের আত্মার আধার, তুমি তাহা আত্মজীবনে প্রকাশ করিলে।

তুমি ব্রহ্মলাভের জন্য কত সাধনা, কি কঠোর তপস্যায় জীবন যাপন করিয়া-ছিলে, কিন্তু তোমার ঈপ্সিত বস্তু আপনি পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলে না। তুমি যে আনন্দ ভোগ করিতেছিলে, তার অংশ আমাদের সকলকে বাঁটিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইলে। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভের পর জগতের কল্যাণ উদ্দেশে তাঁর স্বোপার্জিত সত্য যেমন লোক-সমাজে প্রচার করিতে উদ্যুক্ত হইলেন, তুমিও সেইরূপ তোমার অসীম সাধনার ফল লোক সকলকে বিতরণ করিতে ব্রতী হইলে।

তুমি যখন সিমলার পাহাড়ে একাকী মহাযোগীর ন্যায় 'ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপানে' মগ্ন ছিলে তখন সহসা তোমার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল যে কিসে সেই ব্রহ্মরস লোকের মধ্যে বিতরণ করিতে পারি। এই উদ্দেশে তুমি সেই নন্দনকানন পরিত্যাগ করিয়া এই নিম্নভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক তোমার হৃদয়নিহিত সত্যধর্ম্ম প্রচারে যত্নশীল হইলে। সিপাইবিদ্রোহ, পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা হস্তে ধরিয়া বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতে বাহির হইলে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ তোমার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই মাঘোৎসব তোমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তোমার আধ্যাত্মিক ভাবের পরিণতি।

এই প্রচার কার্য্যে তুমি অধিক দিন

একাকী ছিলে না, কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ উৎসাহের সহিত তোমার সহিত মিলিত হইলেন। সেই তোমার প্রিয় শিষ্য তোমার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তাঁহাকে পাইয়া তোমার যে উৎসাহ ও আনন্দ তাহা আমারা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সে যে কি উৎসাহ, কি আনন্দ তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সেই উচ্ছ্বাসে প্রসূত হইল।

মিলনের পর বিচ্ছেদ ইহা সংসারে অনিবার্য্য ঘটনা। এই বিচ্ছেদে তোমার অন্তরে বড়ই আঘাত লাগিল, কিন্তু আমরা জানি তোমার মনে বিদ্বেষের লেশমাত্রও স্থান পায় নাই। ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার উপর তোমার স্নেহদৃষ্টি সমান ছিল ও তাহার মধ্যে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ সুরক্ষিত হয়, তাহার জন্য তোমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ দলে বলে পুষ্ট হইয়া, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া, জগতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হউক, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান করিয়া কৃতী হউক, ইহাই তোমার আন্তরিক কামনা। সিদ্ধিদাতা বিধাতা তোমার সেই শুভ কামনা সিদ্ধ করুন।

হে পিতঃ! এ আমাদের পরম লাভ যে তুমি তোমার আত্মসাধনার ফল লোক সকলকে বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তোমার প্রদত্ত অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া আমরা নবজীবন লাভ করিয়াছি। তোমারই উপদেশে আমরা জানিলাম যে পার্থিব অন্নপানেই আমাদের পোষণ হয় না, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য আধ্যাত্মিক অন্নপানের প্রয়োজন। তুমিই দেখাইয়া দিলে, যে ভূমাতেই আমাদের সুখ, সেই অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মই আমাদের উপাস্য দেবতা। অনন্তের সঙ্গে যে যোগ তাহা এখানেই আরম্ভ হয়, সে যোগের আর অন্ত নাই। সেই অধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ করিতে পারিলে এই মৃত্যুময় সংসারে আমরা অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। পরকালে বিশ্বাস যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে না।

> ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং

বিত্ত-মোহে মুগ্ধ প্রমাদী অবিবেকীর নিকট পরকাল তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। সেই সাধক তাহা প্রত্যক্ষবৎ গ্রহণ করিতে পারে, যে পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সকল সাধন করিতে থাকে। তাহার সে বিশ্বাস কিছুতেই ম্লান হয় না। অনন্তের যোগে অনন্তজীবনে বিশ্বাস জাগ্রত ও দৃঢ়ীভূত হয়। "সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মলোক সকৃৎবিভাসিত।

তুমি শেষ জীবনে অনেক সময় হাফেজের মধুর কবিতা হইতে বলিতে "আমি তল্পিতল্পা বেঁধে প্রস্তুত—এখন কেবল ঘণ্টার ধ্বনি প্রতীক্ষা করে রয়েছি।" বিদেশ হইতে স্বদেশ যাত্রার যে আনন্দ, হে পিতঃ! তুমি তখন সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলে। সংসারের সহিত তোমার সম্বন্ধ যেমন শিথিল হইয়া আসিল, তোমার বন্ধন অন্যদিকে সেই রূপ দৃঢ়তর হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আর তুমি অকাতরে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে।

জাহাজে সমুদ্রযাত্রীরা যখন দেশত্যাগ করিয়া চলে, তখন তাহাদের নিকট দেশের কূল যেমন অস্পষ্ট অদৃশ্য হইয়া যায়, শেষে তাহারা অনন্ত সমুদ্রের বক্ষে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য আনন্দরসে নিমগ্ন হয়, তোমারও সেইরূপ হইল। এখানকার বিষয় সম্পর্ক

ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিল আর যথাকালে তুমি সেই অখিলমাতার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে তখন তোমার সে কি আনন্দ! এইক্ষণে হে পিতঃ তুমি সেই ব্রহ্মানন্দরস প্রচুর রূপে পান করিতেছ। যাঁহাকে পাইবার জন্য এক সময় তৃষিত চাতকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছিলে, বিদ্যুতের ন্যায় যাঁহার ক্ষণিক আভা দর্শন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে, এখন তাঁহার সেই বিমল স্থির জ্যোতি সন্দর্শন করিতেছ।

এখন আমাদের জীবনসন্ধ্যা সমাগত, আমরা এক্ষণে ভবসিন্ধু কিনারে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি কখন্ তোমার আহ্বান শুনিতে পাই। এক একবার মনে হয়

"ঐ দেখা যায় আনন্দ ধাম"

আবার তাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। হে পিতৃদেব তোমার কাছে আর কি নিবেদন করিব?

আমার চিত্ত যখন দুর্ব্বল ও ম্লান হয় তখন তাহাকে তোমার বলে বলীয়ান কর, যখন নানা কারণে নিরুৎসাহ নিরুদ্যম হইয়া পড়ি তখন আবার যেন তোমার প্রসাদে নবজীবন লাভ করি। এখানে আর যে কয়েক দিন যাপন করি তাহা যেন জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে অতিবাহিত হয় এবং এখানকার কার্য্য সমাপন করিয়া অবশেষে তোমার চরণে গিয়া মিলিতে পারি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা সমাপন হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী নিম্নলিখিত রূপ তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করেন

অদ্য মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে তাঁহার দু'চা'র কথা বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম। কিন্তু বলিতে গিয়া আমার বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। একটি শ্রুতি আছে—"তস্মিন্ সহস্রশাখে নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা" হে সহস্রশাখে ব্রহ্মণ্! আমি তোমাতে নিমজ্জিত হই। এই মন্ত্র বলিয়া আর্য্য ঋষিরা সেই অনন্ত ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া যাইতেন। সেই অতলস্পর্শে ডুবিয়া তাঁহারা একেবারে নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেন। মহর্ষি-জীবনরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। যে দিকে চাই মহর্ষি—ঊর্দ্ধে মহর্ষি, নিম্নে মহর্ষি, পূর্ব্বে মহর্ষি, পশ্চিমে মহর্ষি, উত্তরে মহর্ষি, দক্ষিণে মহর্ষি। আমি এই মহর্ষি সাগরে ডুবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে চাই, সেখানে তাঁহার গভীর কর্ম্মকৌশল বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রীতির দিকে চাই তাঁহার গভীর জ্ঞান-তত্ত্ব, উপাসনা তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কঠোর সাধন ও তত্ত্বব্যাখ্যা, তাহার কুল কিনারা পাই না। অতএব কি বলিব, বলিবার কি আছে। একটি ছোট্ট কথা বলি—আপনারা ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে সকলেই জানেন। এক দিন পথ দিয়া যাইতেছি, তাঁহার পুত্র শরৎবাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়, বাবার বড় পীড়া, তিনি আর উঠিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা যে মহর্ষিকে একবার দেখেন। কিন্তু তাঁহার যাইবার শক্তি নাই। তবে তাঁহার এই ইচ্ছাটাও যদি একবার মহর্ষির কাণে যায় তাহাতেই বাবা আপ্যায়িত ও তৃপ্ত হইবেন"। আমি বলিলাম যে মহর্ষিরও তো এখন আর কোথাও যাইবার শক্তি নাই, তবে লাহিড়ী মহাশয়ের এই ইচ্ছা তাঁহাকে জানাইব। আমি পথের এই কথা মহর্ষিকে জানাইলাম। মহর্ষি আমার মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা,

আমিই গিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া আসিব। কিন্তু তিনি যেখানে থাকেন সেখানে উঠিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা আছে বা হইতে পারে তুমি তাহা গোপনে দেখিয়া ও ব্যবস্থা করিয়া আমাকে লইয়া যাইও"। আমি তাহাই করিলাম ও মহর্ষিদেবকে লইয়া গেলাম হঠাৎ লাহিড়ী মহাশয়ের ঘরের মধ্যে মহর্ষি উপস্থিত। লাহিড়ী মহাশয় এক খানি কৌচে শুইয়া ছিলেন। তিনি মহর্ষিকে দেখিয়া অবাক। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় বাক্য সরে না। কাছে দুইটি পৌত্রী ছিল, তাহাদিগকে বলিলেন "ইনি মহর্ষি, ইহাঁকে আমরা বড় মানি। মানি কেন জান? ইনি ব্রহ্মকে মানেন। আমি আর কি বলিব, আমাকে উপদেশ দিন—আশীর্ব্বাদ করুন। আর কি বলিব, মহর্ষি, মহর্ষি, মহর্ষি"। আমিও কেবল ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি—মহর্ষি, মহর্ষি, মহর্ষি। তবে আপনাদিগকে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, আপনারা আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ উপনিষদের সার সংগ্রহ নহে। আপনারা জানেন, ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু ইহা ঋষিদিগেরই হৃদয় দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়াছে। এই অর্থে বেদ যেমন অপৌরুষেয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থও ঐ অর্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়দ্বার দিয়া নির্গত ব্রহ্মবাণী—অপৌরুষেয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ। ইহা শ্লোক সংগ্রহ নহে। মহর্ষি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজিয়া আকুল হইয়াছিলেন এবং পরিপূর্ণ রূপে বেদ উপনিষদে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি না পাইয়া ঈশ্বরের নিকট সমাহিত চিত্তে হৃদয় পাতিয়া দিয়াছিলেন তখন সেই হৃদয়ে ঈশ্বর যে যে সত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাই তিনি বেদ-মুখে সাধকের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য।

পরে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করিয়া বলিলেন, মহর্ষিদেব আমাদের সকলেরই ধর্ম্মপিতা ছিলেন। কোন সময় জনৈক ব্রাহ্ম পরলোকগত আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে পিতৃ সম্ভাষণ করিয়া প্রণাম করিতে চাহিলে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন, মহর্ষিদেবই আমাদের সকলের ধর্ম্ম পিতা এবং আমরা পরস্পরে ধর্ম্ম ভ্রাতা মাত্র। সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষিদেবের জীবনের কয়েকটি কথা অবলম্বনে সেই পরলোকগত মহাপুরুষের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠা সর্ব্বসাধারণে অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই—

উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র সকল অনেকে পাঠ করিয়া পণ্ডিত হন। কিন্তু কয় জন ঐ সকল শাস্ত্রের তত্ত্ব জীবনে পরিণত করেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহাতে যেরূপ সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, ঐ সকল শাস্ত্রে যে গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা সেইরূপ সাধন ভজন দ্বারা আপনার জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ঋষিমার্গ অবলম্বন করিয়া ঋষিদিগের সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যথার্থই মহর্ষি উপাধির যোগ্য ব্যক্তি।

তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর লোক আছেন, সত্য; কিন্তু তিনি একজন প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। তিনি গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে যেমন জনক রাজা, বর্ত্তমান সময়ে

সেইরূপ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এই দুটি প্রধান কথা বলা যাইতে পারে।

তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ হইয়া কিরূপভাবে ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহার উচ্চতম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সকলের উপর, ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই হইবে, সংসারের স্বার্থ থাক্ আর যাক্। পিতৃঋণের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পথে দাঁড়াইতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহার শরীরে এক খণ্ড বস্ত্র থাকিবে, একটী কানা কড়ি থাকিবে, ততক্ষণ ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি উহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

প্রথম বয়সে পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার কি অসাধারণ ব্যাকুলতা। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি বলিয়াছেন যে, এক এক দিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বরবিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে তিনি মনকে এমনি হারাইতেন যে, কৌচ হইতে উঠিয়া ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িতেন, তাহা কিছুই স্মরণ থাকিত না। তাঁহার বোধ হইত, যেন তিনি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছেন।

পরমেশ্বরের বিচ্ছেদে তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুতেই শান্তি পাইতেন না। "দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণরেখাসকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। আমি শুনিয়াছি যে, যে সকল ব্যক্তি শোকে অতিশয় কাতর হন, তাঁহারা রৌদ্রে কাল' কাল' রেখা দেখেন। মহর্ষি ঈশ্বরবিচ্ছেদে এতদূর কাতর হইয়াছিলেন যে তিনি সেইরূপ, রৌদ্রে কাল' কাল' রেখা দেখিতেন। তিনি এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মনে করিতেন আমি আর বাঁচিবনা।"

যে সময়ে মহর্ষির 'আত্মজীবনী' প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তখন সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলাম। কিছুই দেখিতে পাইতাম না। উক্ত পুস্তকে কি আছে জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু কে উহা আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইবে? একটি বালক দয়া করিয়া একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিয়া উহা শুনাইতেন। যখন ঐ স্থানটি পাঠ করা হইল যে, মহর্ষি ঈশ্বরবিচ্ছেদে এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি মনে করিতেন যে, তিনি আর বাঁচিবেন না, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "হায় রে! এত কাতরতা না হইলে যদি ঈশ্বরলাভ না হয়, তবে বুঝি আমার আর কিছু হবে না।"

ঈশ্বরের জন্য তাঁহার যে অসাধারণ ব্যাকুলতা, যে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বর কি তাহা পূর্ণ করেন নাই? প্রাচীন মহর্ষিরা উপনিষদে বলিয়াছেন যে, যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। কোন বিদেশীয় সাধুও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বারে আঘাত করে, তাহারই নিকট দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন চৌরঙ্গির বাটিতে ছিলেন, তাঁহার নিকট কখন কখন গমন করিতাম। তাঁহার উপদেশ শুনিতাম। তাঁহার মুখে গভীর অধ্যাত্মকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইতাম। তিনি এক দিবস ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন, "আমি তাঁহাকে লইয়া অহোরাত্র থাকি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন কি তিনি ছাড়িয়া যান না? মহর্ষি বলিলেন "যান বই কি?" আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন আপনি কি করেন? তিনি বলিলেন, "কি আর করিব? বালকের ন্যায় ক্রন্দন করি। গত রাত্রে একটু সরিয়া গিয়া-

ছিলেন, সেই জন্য একটু নিদ্রা হইয়াছিল।”

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে,তিনি এক দিবস সন্ধ্যার সময় নিজের বাটীর ছাদের উপর উঠিয়া পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, যে, সমস্ত রাত্রি আর নীচে নামিলেন না। সেই ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে নীচে আসিলেন।

কোন সময়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বজরা করিয়া পদ্মায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সহিত গল্প করিয়া বজরার ছাদের উপর গিয়া উঠিলেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। মস্তকের উপর প্রখর সূর্য্যকিরণ। গ্রাহ্য নাই। অচল মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কেশব তখন তাঁহার মাথায় ছাতি ধরিয়া থাকিবার জন্য এক জন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। তিনি অটল, স্থির ভাবে প্রখর সূর্য্যকিরণে কয়েক ঘণ্টা দণ্ডায়মান থাকিলেন।

চুঁচুড়ায় অবস্থিতি কালে তাঁহার পীড়ার সময়, যে অবস্থায় ছিলেন, তাহা তাঁহার মুখে এক এক বার শুনিয়াছি। মহর্ষি বলিলেন, তিন দিবস আমার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। আমার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু গলাধঃকরণ হইল না। তাহাতে ডাক্তার বলিলেন যে, যখন ঔষধ গলাধঃকরণ হইল না, তখন, কেমন করিয়া বাঁচিবেন? সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, আমি আর বাঁচিব না। কিন্তু বাস্তবিক আমার কি হইয়াছিল? মহর্ষি এই স্থলে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ আবৃত্তি করিলেন। তাহা এই ;—

“যদা তমস্তন্নদিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।”

মহর্ষি বলিলেন, এই অবস্থায় আমি পরমেশ্বরের নিকট হইতে সুস্পষ্ট বাণী শুনিয়াছিলাম ;—“আরও পবিত্র হও, তবে আমার নিত্য সহবাসের যোগ্য হইবে।”

মহর্ষি বলিলেন যে, পরমেশ্বরের নিত্য সহবাসের যোগ্য হইবার জন্য আমাকে সময় দেওয়া হইয়াছে।

এক দিন এই বাটীতে তাঁহাকে সপরিবারে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি ধ্যানস্থ হইয়া করযোড়ে রহিয়াছেন। আমরা আসিয়াছি জ্ঞাত হইয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কাশি হইয়াছে। ডাক্তার তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন ; এখন আমি চক্ষে দেখিতে পাই না, কর্ণে শুনিতে পাই না, বহির্জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ চলিয়া গিয়াছে। তথাচ অন্তরে এমন কিছু লাভ করিতেছি, যাহাতে আমার কোন অভাব নাই।”

যদিও তিনি অধিক কথা বলিলেন না, তথাচ যাহা বলিলেন তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। অনেক বক্তৃতা অপেক্ষা ঐ একটি কথাতেও আমি যারপর নাই উপকৃত হইলাম।

জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি কোন অভাবের কথা বলিতেন না।

রেল গাড়ীতে উঠিবার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন ;—“আমি ব্যাগ লইয়া টিকিট লইয়া, প্রস্তুত হইয়া আছি, গাড়ী আসিলেই চলিয়া যাইব।”

এক সময়ে সাধু লোকের পরলোকযাত্রার বিষয়ে বেলুনের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন “চারিদিকে খুঁটি পুঁতিয়া দড়ি দিয়া বেলুনকে বাঁধা হয়। তার পর ক্রমাগত

উহা গ্যাস পূর্ণ করা হইতে থাকে। যখন উহা সম্পূর্ণরূপে গ্যাসে পূর্ণ হয়, তখন কট্ কট্ করিয়া দড়ি কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন বেলুন সতেজে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। সাধুর জীবন ও মৃত্যু ঐ প্রকার। তিনি জীবনে ক্রমাগত ধর্ম্মসাধন, পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাকেন। উপযুক্ত সময় আসিলে, পরমেশ্বর তাঁহাকে যোগ্যধামে লইয়া যান। মহর্ষির নিজের জীবনে তাহাই হইয়াছে।

আমি সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিন দার্জিলিঙে তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, কি দেখিলে তুমি মনে কর যে, এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী হইল? আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু বিলম্ব করিলাম। তিনি অনেক সময় আমাকে কোন না কোন প্রশ্ন করিতেন। আমি তাহার উত্তর করিলে তিনি আর কিছু বলিতেন না। আমি সেই জন্য তাঁহার মুখে কিছু শুনিব বলিয়া শীঘ্র উত্তর দিতাম না। আমি শীঘ্র উত্তর না দিলে তিনি সে বিষয়ে কিছু বলিতেন।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, দৃঢ়বিশ্বাসী, ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, যে রূপ বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত তাঁহার পূজিত দেবমূর্ত্তি দর্শন করেন, যখন দেখিবে যে, নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসকগণ সেইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেছেন, তখনই জানিবে যে, এ ধর্ম্ম এঁ দেশে স্থায়ী হইল।"

এক দিবস এক পরমহংসের নিকট বসিয়া আছি। সৎপ্রসঙ্গ হইতেছে। আমার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিরূপ? পরমহংস তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সমাধি।'

মহর্ষি সমাধিস্থ যোগী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। আমাদের শাস্ত্রে যে অষ্টাঙ্গ সাধনের কথা আছে, তাহার মধ্যে অষ্টম সাধন সমাধি। তাঁহার সমাধির অবস্থা ছিল।

সে দিনের উৎসব বাস্তবিকই সকলের মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। মহর্ষিদেবের পবিত্র স্মৃতি কস্মিনকালে বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় যোগ দিয়া ব্রাহ্মমাত্রেই ধন্য হইয়াছিলেন এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। সেদিনকার উপস্থিত জনসংখ্যা প্রায় ৩০০ হইয়াছিল।

—

অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রভাতে সমাজ-গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর বন্দনাগীত সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদী গ্রহণ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

ভৈরব—কাওয়ালী।

বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে,
বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনক রবি রক্তিম রাগে,
বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি, মানব, নব অনুরাগে পবিত্র
নাম তাঁর কর রে গান॥

অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন:—

রজনীর দেহাবরণ ভেদ করিয়া অদ্যকার প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়াছে। লক্ষ্য কর, সে রবিকিরণের মধ্যে কাহার প্রেম, কাহার মঙ্গল ভাব আজ আমাদিগকে এত স্নেহভরে আহ্বান করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে। কাহার মাভৈঃ বাণী সুর সঙ্গীতের মধ্য হইতে আসিয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

হইতেছে এবং ইহলোক হইতে লোকলোকান্তরে নব নব জীবন লাভের আশ্বাস দিয়া নির্ভয় করিতেছে। তিনি সেই পরম মাতা, পরম পিতা, যিনি আমাদের অন্তরে আত্মাতে দীপ্যমান—তিনি সেই পরম মাতা, পরম পিতা, যিনি সেতুস্বরূপ হইয়া জগতের তাবৎ পদার্থ ধারণ করিতেছেন এবং বর্ণবিধান দ্বারা স্বীয় সৌন্দর্য্যে সকলই সুন্দর করিতেছেন। অন্তরে তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং এবং বাহিরে এই সকলই তাঁহার সেই সত্যশিব ভাবে পরিপূর্ণ।

অদ্য মাঘোৎসবের পুণ্য দিন। অদ্য তিনি জাগ্রত জীবন্ত রূপে আমাদিগের সম্মুখে বর্ত্তমান। কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া যেমন সূর্য্য উদিত হয়, অন্ধকার ভেদ করিয়া যেমন দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, সকল আলস্য, সকল জড়তা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের হৃদয়প্রীতি সেইরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই হৃদয়নাথকে বরণ করিয়া লইতে উদ্যত। অতএব অদ্যকার প্রভাতের গুরুত্ব অনুভব কর। আপনার কঠোর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব কর। বৎসরে একদিন মাত্র এই সুযোগ উপস্থিত হয়, বৎসরে একদিন মাত্র তিনি আমাদিগকে উৎসবানন্দ দান করিবার জন্য প্রকাশিত হন। অতএব অদ্য সকল হৃদয়ের সহিত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। এখন সেই সময় উপস্থিত যে, যে পরাৎপর পরব্রহ্ম জগতের নিয়ন্তা, জগতের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ করিতে হইবে—জগতের প্রত্যেক কার্য্যে ওতপ্রোত ভাবে তাঁহার স্বরূপের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে আর আনন্দাশ্রুজলে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। "সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" সেই অজ আত্মা যেমন বাহিরে আছেন তেমনি তিনি অন্তরেও বর্ত্তমান। সেখানে তাঁহাকে যে দেখা তাহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট দর্শন; সেখানে তাঁহার যে উপাসনা তাহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট উপাসনা। অতএব বাহিরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া একবার অন্তর্মুখে প্রবিষ্ট হও এবং সমস্ত জগতের অস্তিত্ব, সমস্ত জগৎ-কার্য্যের অস্তিত্ব অন্তঃকরণ হইতে বিধৌত করিয়া তাঁহার শ্যামগম্ভীর অগাধ অনন্তস্বরূপের বিদ্যমানতা অন্তরে প্রত্যক্ষ কর। সেখানে তাঁহাকে লাভ করিয়া শাশ্বত আনন্দের অধিকারী, অমর জীবনের অধিকারী হইতে হইবে। এই অধিকার লাভের জন্য হে ভ্রাতৃগণ, এই অষ্টসপ্ততিতম মাঘোৎসবের পুণ্য প্রভাতে আইস, আমরা সকলে মিলিয়া একবার সেই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত এই মন্ত্রের সাধন করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্বইব রোমানি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকং অভিসম্ভবামি।

ঈশ্বরের কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ হইতে এই জগৎ-কার্য্যে তাঁহার ব্যক্ত মঙ্গল মহিমার মধ্যে প্রবেশ করি। এবং তাঁহর সেই ব্যক্ত মঙ্গল মহিমা হইতে তাঁহার সেই শাশ্বত কূটস্থ চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করি। অশ্ব যেমন গাত্রমার্জ্জনা করিয়া মলিনতা দূর করে এবং চন্দ্র যেমন রাহু-মুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়া দীপ্ত হয় আমাদের এই অকৃত আত্মাকে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এই পুণ্য মুহূর্ত্তে ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উদ্বোধনের পর নিম্নলিখিত সঙ্গীত হইল—

ভৈরবী - তেওরা।

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।
আকাশেতে সোনার আলোর ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
ওরে মন, খুলে দে মন, যা' আছে তোর খুলে দে,
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে,

আনন্দে সব বাধা টুটে সবার সাথে ওঠ্‌রে ফুটে,
চোখের পরে আলস ভরে রাখিস্‌ নে আর বাঁধন টানি॥

অনন্তর স্বাধ্যায়ান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি নূতন সঙ্গীত হইল।

ভৈরবী—চৌতাল।

নিরঞ্জন নিরাকার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর,
তোমারি অনন্ত শক্তি ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর।
অলখজ্যোতি অবিনাশী, জগত-গুরু, জগ-তারণ,
জগন্নাথ, জগত-পতি, জগজ্জীবন, বিশ্বম্ভর।
তোমাতে সব জীব জন্তু, গিরি, নদী, বন, মহাসিন্ধু,
তারকা, তপন, ইন্দু, স্থিতি করে যুগযুগান্তর।
দেহি মে তব আনন্দ, হবে লীন সব দ্বন্দ্ব,
টুটিবে মোহ-বন্ধ, পূর্ণ হবে অন্তর॥

আশোয়ারী—একতালা।

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—আমার জুড়াল হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরাণ কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে—সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—দেখেছি আমার হৃদয় রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা' সনে সে নীরব সভা মাঝারে, দেখেছি চির-জনমের রাজারে॥
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে,আলোক আমার তনুতে—কেমন মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে দেহ মন মোর ফুরালো, যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো॥

ভৈরবী—একতালা।

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর উজ্জ্বল কর, সুন্দর করহে॥
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় করহে,
মঙ্গল কর নিরলস নিঃসংশয় করহে॥
যুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত করহে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত্ত নিঃস্পন্দিত করহে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত করহে॥

প্রাতঃকালে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

পরে সায়ংকালের উপাসনা মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গনে হইয়াছিল। প্রাঙ্গনটী পুষ্প পত্রে সুশোভিত, আলোক মালায় প্রদীপ্ত ও লোকাকীর্ণ হইলে পর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীগ্রহণ করিলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি সঙ্গীত হইল—

পূরবী—ধামার।

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে,
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে॥

ইমন কল্যাণ—আড়া-চৌতাল।

সংসারে কোন ভয় নাহি নাহি,
ওরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
রয়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশি দিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে॥

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

তুমি আদি অনাদি অনন্ত অবিনাশী,
তোমারি ধ্যান ধরে মুনি ঋষি দেব-বৃন্দ।
চতুর বেদ প্রচারে—তুমি পরম ব্রহ্ম,
সৃজন পালন তুমি, তুমি পরমানন্দ॥

বাহার—ধামার।

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে।
খুলে দাও দুয়ার সব,
সবারে ডাক ডাক,
নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা,
অহো আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে॥

এই চারিটী সঙ্গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্বোধিত করিলেন।

বর্ষচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব-দ্বার আজ সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে। যিনি নিখিল জগতের জনক জননী, অথচ প্রতি-জনের পিতামাতা, তাঁহার পিতৃভাব—তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য পিপাসু হইয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে সকলে সমাগত হইয়াছি। অযুত অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিত্য নিয়মে যাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, দেবগন্ধর্ব্বের অবিরাম স্তুতিবন্দনা যাঁহার সভাতল নিয়তকাল প্রতিধ্বনিত করিতেছে, মলিন মানব ক্ষুদ্র কণ্ঠ—ক্ষুদ্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস লইয়া তাঁহার চরণতলে দণ্ডায়মান, তিনি ভুমা তিনি মহান্! সত্য সত্যই কি তিনি আমাদের ক্ষীণ প্রার্থনা বাণী শ্রবণ করিবেন? নিঃসংশয় হও, তাঁহার সহিত আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের নিগূঢ় সম্বন্ধ! আমরা যদি ক্ষুদ্র না হইতাম, উর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া কে তাঁহাকে মহান বলিয়া সম্বোধন করিত, আমরা যদি দুর্ব্বল না হইতাম, কে তাঁহাকে অভয়দাতা বলিয়া চীৎকার করিত, যদি পাপী না হইতাম কে তাঁহাকে পতিত পাবন বলিয়া অন্বেষণ করিত। জীর্ণ শীর্ণ পুত্র বলিয়া আমাদের উপর তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার পূজার্চ্চনা করিবার—তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিবার আমাদের বিশেষ অধিকার।

আমরা কিসের জন্য এখানে আসিয়াছি, না সকলের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন করিবার জন্য, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য। মৈত্রীই সকল ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু। দয়া ভক্তি—পাত্র বিশেষে স্নেহ প্রেম, মৈত্রীরই নামান্তর মাত্র। মৈত্রী—এই যে উদার বিশ্ব-প্রীতি, তাহা নিজ পরিবারের ভিতরে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে—স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে নিরবচ্ছিন্ন আবদ্ধ থাকিবার নয়। উহা প্রবাহিত হইবার জন্য নিম্নতর ভূমি—বিশালতর ক্ষেত্র অন্বেষণ করে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদি জিজ্ঞাসা কর, বলিব মৈত্রী। দীনদরিদ্র জঠর জ্বালায় অস্থির—প্রাণ তাহার কণ্ঠাগত, শৃগাল কুক্কুর অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার দেহের শেষ স্পন্দন অপেক্ষা করিতেছে; কাহার আদেশে তুমি আত্ম-বঞ্চনা করিয়া তোমার নিজের অন্নথাল, সেই মমূর্ষুর সমক্ষে ধারণ কর—না মৈত্রীর আদেশে। দেশের অকল্যাণ অত্যাচার দূর করিবার জন্য দেশ সংস্কারক কেন আত্ম বলিদান দেয়,—না মৈত্রীর আদেশে। আজ এই মহামহোৎসবের অন্তরালে—ইহার বহ্য চাক্‌চিক্যের ভিতরে কোন্ শক্তি কার্য্য করিতেছে, না মৈত্রী। কেন আজ এই গৃহস্বামী তাঁহার উদার বাহুবেষ্টনের ভিতরে ধনী দরিদ্র সকলকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন,—না মৈত্রীর আদেশে। ব্রহ্ম পূজার মঙ্গল বারতা শুনাইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত বঙ্গের মঙ্গল চান, অখণ্ড ভারতের কল্যাণ চান—বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিতে চান, ব্রহ্মানন্দের স্বর্গীয় ভাব ঘোষণা করিতে চান, তাই মৈত্রী আজ সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, যে যদি অচৈতন্য ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কোন মন্ত্র থাকে, তবে তাহা ব্রহ্মপূজা; ভারতের অসংখ্য জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে আনিবার কোন তন্ত্র থাকে, তবে তাহা একেশ্বরবাদ; প্রতি মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-লাভের কোন দীক্ষা থাকে, তবে তাহা অশরীরী ব্রহ্মের আরাধনা।

অতএব মৈত্রীর আহ্বানে সমাগত, হে

ভ্রাতৃবৃন্দ! প্রকৃত ঐক্য স্থাপনের জন্য—সর্ব্বোপরি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য—এই উৎসব ক্ষেত্রে সেই নিখিল জননী বিশ্বমাতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, তাঁহার সঙ্গে অনন্ত কালের জন্য মৈত্রী স্থাপন কর, অভিমান অহঙ্কার বিচূর্ণ কর, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ কর, সরল সহজ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, ব্রহ্মপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের অক্ষয় ফল লাভ কর, ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে আত্মার চিরসঙ্গী কর; পরিশেষে মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমুন্নত আত্মার সহিত, দেবেন্দ্রনাথের ঋষি প্রকৃতির সহিত মৈত্রী স্থাপন কর—যে ব্রহ্মলোকের পূর্ব্বাভাস দূর হইতে দেখিতে পাইয়া চিরকৃতার্থ হইবে এবং স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উদ্বোধনের পর এই কয়েকটী সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল।

নট্‌নারায়ণী—কাওয়ালী।

ভব-ভয়-হর প্রভু তুমি তারণ-গুরু,
ভক্তজন-বাঞ্ছা-কল্প-তরু।
পরম মহিমা, অনন্ত অসীমা,
তোমার করুণা ছায় কানন-মরু॥

ইমন কল্যাণ—তাল ঝম্পক।

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়,
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে
দুখের রাতে নিখিল-ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল।

চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ জীবন-তীরে,
কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমীরে।
গগনে গ্রহ-তারাচয়, অনিমেষে চাহি রয়
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে।
চাহিয়া রহে আঁখি মম, তৃষ্ণাতুর পাখীসম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত গভীরে
কোন্ শুভ প্রাতে, দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ-নীরে॥

ভীমপলশ্রী—তেওরা।

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে,
সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি' অতীত অনাগত,
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল
এ কি আনন্দ-তরঙ্গ।
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনা-ধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার,
কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ॥

স্বাধ্যায়ের পর এই চারিটী সঙ্গীত হইল।

আড়ানা—ঢিমাতেতালা।

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগ আজি জাগ জাগরে তাঁরে লয়ে
প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে॥

মিশ্র বারোয়াঁ—ঢিমাতেতালা।

তোমা বিনা কে করে উদ্ধার আমায় ওহে দয়াময়!
মোরা সবে পাপী তাপী, তাই ডাকি কাতরে তোমায়।
এই ভব-পারাবার, মোহ-মেঘে অন্ধকার,
তুমি হয়ে কর্ণধার, কৃপা করি' দাও অভয়॥

দেশ—কাওয়ালী।

জীবন বৃথায় চলে গেলরে,
জীবন-নাথে না দেখিনু হায়!
কোথা হতে এই দেহ, কেবা দিল মাতৃ-স্নেহ,
কাহার আদেশে করে রবি শশি, তারা,
সেবা আমায়॥

নটমল্লার—কাওয়ালি।

কতদিন, গতিহীন, অতি দীন ভাবে রহিব হে নাথ,
দেখাও তব আলো মম জীবন-পথে,
আর কিছু চাহি না, চাহি শুধু তুমি থাক সাথে।
বার বার মনে করি, চলি তব পথ ধরি'
তবু কি জানি কি মোহ আসি ফিরায় তা হতে।
হে নাথ! ব্যথা দিলে যদি প্রাণ জাগে,
বজ্রও তব, স্নেহ-আশীর্ব্বাদ বলি' লইব মাথে॥

অনন্তর আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিম্নের বক্তৃতাটী পাঠ করিলেন।

বন্ধুগণ! আবার আমাদের মাঘোৎসব উপস্থিত। এই আলোকমালা, জনতা, সাজসজ্জা, এই সভামণ্ডপে পূজার বাহ্য উপচার দেখিয়াই যাঁহারা পরিতুষ্ট, যাঁহারা এই গীতবাদ্যে আকৃষ্ট হইয়াই এখানে আসিয়াছেন,

তাঁহারা এ উৎসবের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত নহেন। আজ আমরা 'মায়ের ডাকে' এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। সেই প্রেমময়ী বিশ্বজননী আমাদের জন্য অঞ্চল ভরিয়া ক্রোড় পাতিয়া এই উৎসবক্ষেত্রে বিরাজিত। তাঁর প্রেমমুখ দর্শন কর, তাঁর হস্ত হইতে প্রেমামৃতরস প্রচুর রূপে পান কর, আর তিনি যে প্রসাদ মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন তাহা যত পার সংগ্রহ করিয়া লও, যে বহুকাল তাহা তোমাদের জীবনের উপজীব্য হইবে। আজ সেই বিশ্বব্যাপী প্রেমের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া মানুষের মধ্যে ছোট বড় গুরু লঘু ভেদাভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছে। কেবল এই দেখিতেছি আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা আমাদের সম্মুখে, আর আমরা ভাই ভগিনী মিলিয়া তাঁহার পূজার জন্য লালায়িত।

একবার ভাবিয়া দেখ সেই প্রেমময়ের প্রেম ও করুণার কি অন্ত আছে? আমাদের এই জীবন তাঁহার করুণায় পরিপূর্ণ। আমরা শিশুকাল হইতে সেই স্নেহ-প্রেমে লালিত পালিত হইতেছি, প্রতি নিমেষে, প্রতি নিঃশ্বাসে তাঁহার করুণার পরিচয় পাইতেছি। সুখের দিনে, আনন্দের দিনে যখন আমাদের প্রাণের সাধ পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ করিতেছি তখন তাঁহার অজস্র করুণার ত কথাই নাই, তাহা দেখিয়া প্রাণ আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতা-ভরে নৃত্য করিয়া উঠে; কিন্তু দুঃখ দুর্দ্দিনেও সেই প্রেম, সেই করুণার বিরাম হয় না, কেবল তাহা আমরা অন্ধতা-বশতঃ দেখিতে পাই না। আমরা চাই বা না চাই, তাঁর প্রেমের ধারা আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে. আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। প্রতিজন আপন আপন জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহার প্রতি ঘটনাতেই তাঁহার করুণা-হস্ত দেখিতে পাইবে। আমরা অনেক দুঃখ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছি, অনেক শোকের দংশনে নিষ্পীড়িত হইয়াছি কিন্তু সেই দুঃখ শোকের মধ্য দিয়াও তাঁহার করুণার পরিচয় বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিপদের দিনে তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করিয়াছি—"এস বৎস, আমার কাছে এসো, ভীত হইও না, বিপন্ন হইও না—ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে।" সত্য সত্যই বিপদ কাটিয়া গেল, আকাশ নিরভ্র পরিষ্কার হইল। বিপদে অনেক সময় আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়, চোখ ফুটিয়া যায় যা সম্পদে কখন হয় না। তখন আমরা ঘনঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বলিতে থাকি—

"বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে, মৃত্যু সে অমৃত সোপান।"

হে শ্রান্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত পথিক! তুমি শোকে কাতর, বিষাদে জর্জ্জর হইয়া কেন বৃথা অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ? যাঁর প্রীতিসুধার্ণবে বিশ্বচরাচর নিমগ্ন তাঁর শরণাপন্ন হও, তিনি তোমাকে বিশ্রামস্থান দিয়া তোমার শ্রান্তি দূর করিবেন, তুমি শান্তি ও আরাম পাইবে। হে পতিবিয়োগবিধুরা অনাথা বিধবা! হে পুত্ররত্নহারা দুঃখিনী জননী! তোমাদের কি সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই? সেই দয়াময়ের দ্বারে গিয়া দাঁড়াও, তিনি তোমারদিগকে ক্রোড়ে লইয়া তোমাদের শোকাশ্রু মার্জ্জনা করিবেন। তোমরা এমন সান্ত্বনা পাইবে সংসার বাহা দিতেও পারে না, হরণ করিতেও পারে না।

আমাদের এখানে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য অশেষ প্রকার বিপদ আছে, এই সমস্ত দেখিয়া বুদ্ধদেব সংসারকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখেরই আগার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিপদ আছে সত্য কিন্তু বিপদের প্রতিকারও আছে। শরীরে যে ব্যাধি তাহার ঔষধ আছে, আর্থিক ক্ষতিপূরণের নানা উপায় আছে; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ সেই যাহাতে আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্গতি হয়, যাহাতে আমরা পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হই। সে কি মহা বিপদ যখন আমরা মোহে পড়িয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হই, যখন প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া গিয়া আত্মহারা হই, আপনার উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া আপনিই আপনার ভয়ঙ্কর শনি হইয়া দাঁড়াই, যখন অন্তরাত্মার বাণী বন্ধ হইয়া যায়, যখন ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে এমন ব্যবধান আসিয়া পড়ে যে তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না; আত্মার সেই মৃত্যু, সেই সর্ব্বনাশ।

হে মোহমদিরাসক্ত প্রমত্ত যুবক! তুমি আর কত কাল মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিবে! যত দিন যায় ততই তুমি দুর্ব্বল ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, অবশেষে উঠিবার আর শক্তি থাকিবে না। ওঠ! জাগো! এখনও সময় আছে। যদি এমন কোন সর্ব্বগ্রাসী পাপ অন্তরে পোষণ করিয়া থাক যাহার বিষে তোমার সমুদয় জীবন জর্জ্জরীভূত তবে এখনি প্রতিজ্ঞা কর যে সে সাপকে আর পোষণ করিবে না। আলস্য করিও না, এমন সুযোগ অবহেলা করিও না, সেই অভয়দাতা পিতা মৃতসঞ্জীবন ঔষধ লইয়া আজ তোমার সম্মুখে। তিনি চান তোমার মোহান্ধকার ছুটিয়া যাক্, তুমি সৎপথে ফিরিয়া এসো। তোমারও যদি ঐ ইচ্ছা, ঐ চেষ্টা হয় তবে তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না। তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহ। তিনি তোমার মরুময় আত্মাতে অমৃত-বারি সিঞ্চন করিয়া তোমাকে নবজীবন দান করিবেন। ভয় নাই 'পাপী তাপী সাধু অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া'। তাঁহার সেই অমৃত ছায়া আশ্রয় করিয়া অন্তরের জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমিত কর।

সকল বিপদের মধ্যে আমরা মৃত্যুকেই অধিক ভয় করি। আর আর বিপদের প্রতিকার আছে—কিন্তু কালের প্রতাপ কে অতিক্রম করিতে পারে? মৃত্যু অপরিহার্য্য, তাহার উপর আমাদের কোন অধিকার নাই। মনে করিয়াছিলাম এই আনন্দের দিনে মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিব কিন্তু তাহা পারি কৈ? মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। দেখুন এই অল্প দিনের মধ্যে আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে কত লোক আমারদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন! আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তরঙ্গ দুইটি নাম স্মরণ হইতেছে। আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন যে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের পূজনীয়া ধর্ম্মপ্রাণা মাতাঠাকুরাণী সে দিন পরলোকগতা হইয়াছেন; তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই কেশবচন্দ্রের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের প্রিয় মিত্র, করুণাচন্দ্র সেন দেহত্যাগ করেন। করুণাচন্দ্রের বৃদ্ধ

মাতামহ সংসার-দুর্দিনের অনেক ঝঞ্ঝা উৎপাত শোক তাপ বহন করিয়া ঈশ্বরের কৃপায় এতকাল অটল অচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, অবশেষে পরিপক্ব বয়সে তাঁহার সন্তান সন্ততি হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। করুণাচন্দ্র কিন্তু তাঁহার পিতার ন্যায় অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আমাদের এই সাধুচরিত্র লোকপ্রিয় ভ্রাতার অকালমৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছি, আমাদের সমাজও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর একটি শোকসংবাদ উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুর বংশের প্রদীপ দেশের একটি উজ্জ্বলরত্ন মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যু। কে জানিত যে সেই স্নেহপূর্ণ সহাস্য বদন ইহার মধ্যে মৃত্যুরেখায় অঙ্কিত হইয়া বিবর্ণ, সেই বিনয়নম্র বাণী চিরকালের মত নীরব হইবে! কিন্তু শোকের কাহিনী বলিয়া শেষ করা যায় না। ভগবান প্রেতাত্মাদিগের শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন, তাঁহার নিকট এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

ভ্রাতৃগণ! এখন সমস্যা এই—এই মৃত্যুপীড়া অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় আছে? মৃত্যুভয় পরিহার করিয়া মৃত্যুঞ্জয় কিসে হওয়া যায়? পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মাবো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

সেই অমৃত পুরুষের সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

যে মানব ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রহিয়াছে সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—সেই মৃতসঞ্জীবনী শক্তিকে দেখিতে পায় না। তাহার নিকট এই জগৎ শ্মশানতুল্য। পরলোক তাহার নিকট অন্ধকার।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।

বিত্তমোহমুগ্ধ প্রমাদী অবিবেকী বালকের নিকটে পর-কালতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। অনন্ত জীবনে বিশ্বাস তাঁহারই হৃদয়ে যিনি অনন্তস্বরূপের সহিত যোগবন্ধন করেন। এখানেই এই যে যোগের সূত্রপাত ইহার শেষ এখানেই নহে। ইহা নিত্যকালের যোগ—ইহার ভঙ্গ নাই, অবসান নাই। যখন সাধক ঈশ্বরের সহিত এই প্রেমবন্ধন স্থাপন করেন তখন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।

হৃদয়ের গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। সেই প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়। সেই প্রেমবলে বুঝিতে পারি যে সেই প্রেমময়ের সহিত আমার যে বন্ধন তাহা দুদিনের তরে নয়,তাহা অনন্ত কালের বন্ধন। অনন্ত উন্নতিশীল যে আত্মা সে অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের আকর পাইয়া নিঃসংসয়ে বলিতে পারে—

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

ভগবান ভক্তের হৃদয়ে যে আশ্বাস দিতেছেন তাহা কখন ব্যর্থ হইবে না; সে আশ্বাস বাক্য এই—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥

আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক যাঁহারা এক-চিত্তে আমাকে ভজনা করেন তাঁহাদিগকে, হে পার্থ, আমি এই মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে অচিরাৎ উদ্ধার করি।

এই যে আশ্বাস বচন ভক্তের হৃদয়ে প্রেরিত হই-তেছে তাহা কদাপি অন্যথা হইবার নহে।

হে মুমুক্ষু ভক্তগণ! ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাও, তোমাদের কোন ভয় নাই। যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই ত মৃত্যু বিধান করিতেছেন; তবে কি ভয়? যিনি তোমার মঙ্গল উদ্দেশে তোমাকে এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন তোমার কার্য্য শেষ হইলেই তিনি তোমাকে আপনার দিকে লইয়া যাইবেন—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের করুণাময় হস্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, ঈশ্বরের আলোক যাঁহার হৃদয়ে আঁধারের দীপ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, মৃত্যুকে তাঁহার কি ভয়? সেই আ-লোকে তিনি মৃত্যুর পরপারে জ্যোতিন্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পান যেখানে দিনও নাই, রাত্রিও নাই, সুকৃত নাই দুষ্কৃত নাই, যাহা শুভ্র পুণ্যালোকে চিরদীপ্তিমান্।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতর্ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং—সর্ব্বে পাপ্মানো ইতো নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।

না দিন না রাত্রি না জরা না মৃত্যু না শোক না সুকৃত না দুষ্কৃত এই সেতু অতিক্রম করিতে পারে। সেখান হইতে পাপসকল প্রতিনিবৃত্ত হয়, ইহাই নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক।

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

এই সেতুপার হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে উপতাপী সে তাপশূন্য হয়। সেখানে রাত্রি দিনের ন্যায় প্রকাশমান। ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না, ইহার প্রকাশও নির্ব্বাণ হয় না। ইহাই সকৃৎ বিভাসিত ব্রহ্মলোক।

হে বন্ধুগণ! ভক্তেরা যাহার জন্য ব্যাকুল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন এই সেই ব্রহ্মলোক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বক্তৃতা ও উপাসনাদি সমাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

ভূপালী—সুরফাঁক্তাল।

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল একি দুর্দ্দিন,
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি-তর্জ্জন।
ঘন ঘন দামিনী, ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ।
ছাড়রে শঙ্কা, জাগ ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি,

অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হের প্রশান্ত বিরাজিত
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ ॥

মিশ্র ইমন্ কল্যাণ—তালঝম্পক।

দুঃখের বেশে এসেছ বলে' তোমারে নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যাথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।
যেমন করে দাওনা দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে ॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে
বাজিছে বুকে, বাজুক্, তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে' বেদনা তাহা জানাক্ মোরে
চাবনা কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে ॥

মিশ্র কামোদ—একতালা।

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে,
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে'।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহা দানেরি যোগ্য করে,
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে ॥
আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে'।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরি যোগ্য করে',
আধা ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে ॥

মিশ্র সাহানা—একতালা।

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্,
তারা ত পাবে না জানিতে,
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে।
যারা কথা বলে তাহারা বলুক
আমি করিব না কারেও বিমুখ
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয় খানিতে ॥
তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে তোমা পানে রবে টানিতে
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার হৃদয়খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে,
সবার মিলন তোমার মিলন জাগিবে হৃদয় খানিতে ॥

বেহাগ—লঘু একতালা।

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু,আলয় কোথায় বলে'ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত,
তোমার মাঝারে রব নিমগ্ন চিত,
পূজা শতদল আপনি সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া ॥

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে,
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু,
যখন ফিরিব যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ গেহে,
তোমার অমৃত প্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে, বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

নানা কথা।

অর্দ্ধোদয় যোগ।—বিগত ১৯ এ মাঘ রবিবার অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতায় দেশবিদেশস্থ অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উপনগরের কতকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবা যাত্রিগণের সুবিধা ও সাহায্য বিধান জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দল সংগঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহে, অধিকন্তু তাঁহাদের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ফলে ও সচ্চরিত্রতা গুণে যাত্রীবর্গ বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। চারিদিক হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণের উপরে অজস্র প্রশংসাবাদ বর্ষিত হইতেছে। ফলতঃ তাঁহাদের এইরূপ পরার্থ প্রেমে ও স্বার্থ বিসর্জ্জনে জাতীয় বন্ধন যে আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছে, ভ্রাতৃভাব ও স্বাবলম্বনের ভাব বিশেষ ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমরা ইহার ভিতরে ঈশ্বরের করুণ হস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

গঙ্গাস্নান।—গঙ্গাস্নানের উপর আপামর সাধারণ হিন্দুগণের বিশেষ শ্রদ্ধার মূলে কোন গুপ্ত অভিপ্রায় কার্য্য করিতেছে, তাহা স্থির ভাবে অনুসন্ধান করিলে আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারি, যে আর্য্যগণের প্রাচীন নিকেতন আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তের ধৌতপাদা গঙ্গা উত্তর ভারতের বক্ষ বিদারণ করিয়া সমগ্র বঙ্গকে ভাসাইয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। আর্য্যেরা নানা কারণে তাঁহাদের আদিম বসতি পরিত্যাগ করিলেও গঙ্গার সহিত সকল সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উত্তরকালে গঙ্গা ও তাহার শাখা প্রশাখার উভয়কূল ধরিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহারা বসতিস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইলেন। একভাবে বলিতে গেলে গঙ্গানদী বিক্ষিপ্ত আর্য্যগণের ধমনী। গঙ্গানদী বহিয়া সমগ্র জাতির ভিতর সখ্য বন্ধন চলিতেছে। গঙ্গানদী আর্য্যজাতির অতীত গরিমা এখনও কলকলরবে ঘোষণা করিতেছে। অতীত ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের কত সহস্র বৎসরের ব্যবধান, কিন্তু চির-নবীন গঙ্গাস্রোত অতীত ও বর্ত্তমানের যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। বঙ্গের গঙ্গার মৃত্তিকায় যে সেই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তের পদরেণুকণা এখনও বিরাজমান। স্বাস্থ্য কল্যাণবাহিনী গঙ্গা তাই হিন্দুজাতির এত প্রিয়; এবং দেবতাত্মা বলিয়া ঘুষিত, এই জন্য সকলে তাহার পূত বারিতে অবগাহন করিতে এত লালায়িত। কিন্তু হায়! পৌরাণিক কবিত্ব ও উপাখ্যান অনেক সময় মূল অভিপ্রায়ের দিকে আমাদিগের দৃষ্টিকে প্রসারিত হইতে দেয় না।
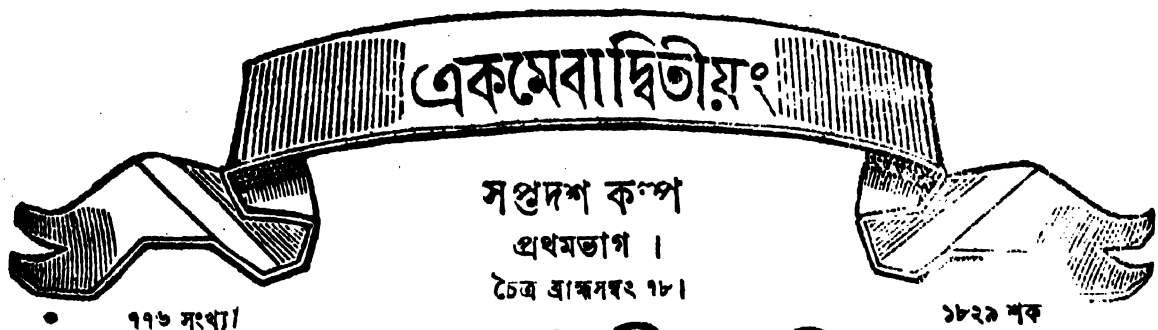
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি-ব্রাহ্মসমাজের অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতঃকালে এই বক্তৃতা পাঠ করেন।

দুঃখ।

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনি আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই, তখনি এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহবা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি—কেহবা তাহাকে জন্মান্তরের কর্ম্মফল বলিয়া জানি—কিন্তু তাহাতে দুঃখ ত দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই ত দুঃখ, এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একেবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর একটী প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে ত প্রকাশ পাইতেই পারেন না;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলি ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই,

সেই কর্ম্মক্লেশের মধ্যে অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কি করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন পরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা যেগুলি আহত প্রতিহত হইতেছে, সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রস-স্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই ত তিনি রস। তাঁহাকে ধরিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেই জন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃত রূপ।

সেই জন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্ব্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেই জন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জ্জনতার মধ্যদিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কি বলিব, এ কি হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই ত সব বলা হইল না—এমন কি কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের কি বলা হইল? সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সঙ্গীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গম্ভীর ভাবে ব্যক্ত করিতেছে? এত কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কি? তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্ তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও

এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—কষাহত কালো ঘোড়ার মসৃণ চর্ম্মের মত নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—পরপারের স্তব্ধ তরু-শ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার-পরে সেই জলস্থল আকাশের জালের মাঝ-খানে নিজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ মধ্যে জড়িত আবর্ত্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একে-বারে দিশেহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধূলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই ত রস। ইহাত সুধু বীণার কাঠ ও তার নহে—ইহাই বীণার সঙ্গীত। এই সঙ্গীতেই আনন্দের পরিচয়—সেই আনন্দরূপমমৃতম্!

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকা-শের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্র-রূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্ব্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া? এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছ-লিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড় রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে? না, পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হোক্ হোক্ কঠিন হোক্, কিন্তু ইহাকে ভরপূর করিয়া দাও; আনন্দ ছাপা-ইয়া উঠুক্।

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কি করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকার অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনো দিনই আনন্দলোকের ধ্রুব-দীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনই বলিয়া উঠে নাই—বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি—আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই? সেই দিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম," অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব! ইহা কি তর্কের বিষয়, ইহা কি আমাদের উপ-

লব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে—আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্ব্বলতাবশত খর্ব্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড় করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে ত তাহার নহে—সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের—কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্য্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্ব্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ। সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কি দিব, কি দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া ত তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্ খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কি করিয়া? এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার, বর্ষণ করিবার, প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড় অভিমান; এই খানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্য্যে আমার ঐশ্বর্য্যে যোগ—এই খানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্য্যনক্ষত্রখচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা। হঠাৎ যখন অর্দ্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে—তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি,—হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া

বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখ দুঃখ ত কেবলি নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই ত সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে, যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ মারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়, যেখানে রক্ত সরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্ত্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব হৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান্ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন মানুষের চিত্তে দুঃখও সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব সমাজে নূতন নূতন কর্ম্মলোক ও সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব সংসারের সমস্ত বায়ু-প্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্ব্বল ভাবে দেখিব না, আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থ ভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারা যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র স[illegible] পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেই জন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন

আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখিয়াছে· দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন—তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্য্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জ্জিত বলিতে পারি না—সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই;—ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত দাবী চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোন দলিল থাকে না;—আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব—মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মত এত বড় অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপো হতপ্যত, স তপস্তপ্‌্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড় দুঃখকে বহন করিবে কে? কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়, তাহার আনন্দও তত খানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞান লাভ, এবং প্রেমিকের প্রেম সাধনাও তাই।

খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসঙ্গমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃষ্টান ধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে মূর্ত্তিকে বাহ্যতঃ কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। সংহার-রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্য্যই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়ই সকরুণ, বড়ই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেই জন্যই এই সকল দুর্ব্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। তুমিই

> লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
> লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ
> তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
> ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ॥

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃতুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মত সঙ্কুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্ব্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না;—

তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ—সেই যে উদ্ধারের পথ সে ত আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও—হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ ত সহজ নহে! এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ! অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্ম্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এই রূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই! তোমাকে বলিয়াছেন, রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন্ দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে—যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্ম্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড় বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্য্যোগে, হে রুদ্র,তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ ও মৃত্যু, বিঘ্ন ও বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দ-ভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর, হে শঙ্কর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ কর! জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধন সম্পদকেই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে তখনি হে রুদ্র সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়ত্বে, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দ্দিনকে আমরা

যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্!

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হোক্, এবং শোক-আমাদের মুক্তির কারণ হোক্, এবং লোক-ভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হোক্। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে!

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

সহজ-জ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি গোড়ার সংস্কার।

প্রথম পরিচ্ছেদের

অনুবৃত্তি।

শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা এই দুই শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। এই দুই বিশ্বজনীন শব্দ অপক্ষপাতীভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহার মূলে কতকগুলি উচ্চভাব নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নিজের কাজে স্বাধীন নহে, যাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, ভাল কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এ কথা যে বুঝে না, সে কি শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে? মানিয়া লও, মন্দের সহিত ভালোর আসলে কোন প্রভেদ নাই; মানিয়া লও, এ সংসারে অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে উপলব্ধ স্বার্থ বই আর কিছুই নাই, প্রকৃত কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই, এবং মনুষ্য স্বাধীন জীব নহে;—এরূপ মানিয়া লইলে কেহ কি ন্যায্যরূপে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে?

শ্রদ্ধা তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করিলে, উহার মধ্যে একটি গভীর ও উদার তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধাভাবের দুইটি লক্ষণ সুনির্দ্দিষ্টঃ—প্রথম, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা অনুভব করে, তাহার মনের ভাবটি নিঃস্বার্থ; দ্বিতীয়, শুধু নিঃস্বার্থ কার্য্য সম্বন্ধেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্বার্থমূলক সংকল্পের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হয় না; কোন কার্য্য সফল হইয়াছে বলিয়াই তৎপ্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হয় না; কাহারও কার্য্যে সফলতা দেখিলে বরং আমাদের ঈর্ষার উদয় হইতে পারে; উহা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না; উহা আর এক দরের কাজ।

পরিমাণ বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে এই শ্রদ্ধাই ভক্তি হইয়া দাঁড়ায়; এই পবিত্র শব্দটিকে যতই সূক্ষ্মভাবে, যতই স্থূলভাবে বিশ্লেষণ কর না কেন, ইহাকে স্বার্থ ভাবের কোটায় কখনই আনিতে পারিবে না; ভাগ্যবানের সফল কার্য্যের সম্বন্ধেও উহার প্রয়োগ করিতে পারিবে না! ধর, আর দুইটি শব্দ,—গুণমুগ্ধতা (admiration) ও ধিক্কারবুদ্ধি (indignation)। শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা—কতকটা বিচারমূলক; গুণমুগ্ধতা ও ধিক্কারবুদ্ধি—এই দুইটি, ভাবের কথা; কিন্তু এই ভাবও বিচার বিবেচনার সহিত জড়িত। এই গুণমুগ্ধতার ভাবটি আসলে, নিঃস্বার্থ বিষয়ের সম্বন্ধে কিংবা

নিঃস্বার্থ ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধেই শ্লাঘা (admiration) জন্মাইতে পারে ; কিন্তু এরূপ সামর্থ্য কি কোন প্রকার স্বার্থের আছে ? তোমার যদি কোন স্বার্থ থাকে, তবে তুমি গুণমুগ্ধতার ভান করিতে পার, কিন্তু আসলে তুমি গুণমুগ্ধ হও না। কোন অত্যাচারী রাজা, মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাইয়া, তাঁহার প্রতি স্তবস্তুতি করিতে তোমাকে বাধ্য করিতে পারেন, কিন্তু আসলে তোমাকে গুণমুগ্ধ করিতে পারেন না। স্নেহ-অনুরাগ হইতেও গুণমুগ্ধতা উৎপন্ন হয় না ; এক-জন শত্রুর আচরণেও যদি আমরা কোন বীরত্বের লক্ষণ দেখি, তাহা হইলে আমরা মনে মনে তাহাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারি না।

এই গুণমুগ্ধতার উল্টা ধিকারের ভাব। এই গুণমুগ্ধতাকে যেমন বাসনা বলা যায় না, সেইরূপ তীব্র ধিকারের ভাবকেও ঠিক্ ক্রোধ বলা যায় না। ক্রোধ জিনিস্টা নিতান্তই ব্যক্তিগত; আমাদের নিজের স্বার্থের সহিত ধিকারবুদ্ধির অব্যবহিত সম্বন্ধ নহে ; আমাদের কোন বিশেষ অবস্থা ও কার্য্যের মধ্য হইতে এই ধিকার উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু উহার মূলে যে ভাব অবস্থিত তাহা নিঃস্বার্থ। ধিকারবুদ্ধির মধ্যেও একটা উদার ভাব নিহিত আছে। যদি আমার প্রতি কেহ অবিচার করে, তাহার উপর আমার ক্রোধ ও ধিকার উভয়ই উপস্থিত হয় ; আমার নিজের ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া তাহার উপর ক্রোধ হয়, এবং আমার স্বজাতি মনুষ্যের উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া তাহার উপর আমার ধিকার জন্মে। আমার নিজের উপরেও ধিকার জন্মিতে পারে। যাহা কিছু ন্যায় বুদ্ধিকে ব্যথিত করে তাহারই উপর ধিকার জন্মে।

আমাদের মর্য্যাদা—আমার নিজের মর্য্যাদা—মানবজাতির মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া যে কোন কাজ করা যায় তাহার জন্যই আমাদের ধিকার জন্মে। শুধু কাহা-রও কার্য্যের সফলতা দেখিয়াই যেমন আ-মরা তাহার শ্লাঘা করি না, সেইরূপ, শুধু অনিষ্টের পরিমাণ দেখিয়াই কাহার উপর আমাদের ধিকার জন্মে না। একটা প্রয়ো-জনীয় বস্তু লাভ করিলে, আমরা আনন্দিত হই ; কিন্তু তজ্জন্য, আপনার উপর কিংবা সেই জিনিসের উপর আমাদের শ্লাঘা জন্মে না। যে প্রস্তরখণ্ড হইতে আমরা আঘাত প্রাপ্ত হই, সেই প্রস্তরখণ্ড আমরা সরোষে ঠেলিয়া ফেলি, কিন্তু তজ্জন্য তাহার উপর আমাদের ধিকার জন্মে না।

এই গুণমুগ্ধতা আমাদের মনকে উন্নত করে—বড় করিয়া তোলে। মঙ্গল-আদ-র্শের সন্নিকর্ষে ও সংস্পর্শে মানবপ্রকৃতির মহৎ অংশগুলি যেন সমস্ত নীচতা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উন্নতভাব ধারণ করে। এই-কারণেই এই গুণানুরাগ স্বয়ং হিতকর হই-লেও, উহার পাত্রাপাত্র সম্বন্ধে কখন কখন আমরা ভ্রমে পতিত হয়। অবিচারের আঘাতে আমাদের মন যখন ব্যথিত হয়, তখনই মনের মহৎভাবগুলি বিদ্রোহী হইয়া সুতীব্র ধিকারের রূপ ধারণ করে, এবং প্রপীড়িত মানব-মর্য্যাদার দোহাই দিয়া, উহা উন্নত মস্তকে অবিচারের প্রতি-বাদ করে।

দেখ, কর্ম্মী পুরুষেরা, স্বজাতীয় রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য কত না ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। লোকমতের অসীম ক্ষমতা। ইহা নিছক অভিমানমূলক,—একথা বলিয়া ই-হার সম্যক ব্যাখ্যা করা যায় না। কতকটা ইহার মধ্যে অভিমান আছে বটে, কিন্তু

আসলে ইহার মূলে একটি গভীরতর উন্নততর ভাব নিহিত। আমরা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের ন্যায় সকল মনুষ্যেরই ভাল মন্দের জ্ঞান আছে, সকলেই পাপ পুন্যের প্রভেদ বুঝিতে পারে, সকলেই গুণের উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়, গুণের অপকর্ষে ধিক্কার বোধ করে। সকলেই পাত্র-বিশেষকে শ্রদ্ধা করে, ঘৃণাও করে। এই মনোবৃত্তিটি আমাদের মধ্যে আছে; এই মনোবৃত্তি-সম্বন্ধে আমাদের আত্মজ্ঞানও আছে; আমরা জানি, আমাদের ন্যায় এই মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান অন্য লোকেরও আছে, তাই এই মনোবৃত্তির সংহত শক্তির নিকটেই আমরা ভয়ে সঙ্কুচিত হই। আমাদের ব্যক্তিগত নিজের বিবেকবুদ্ধি স্থানান্তরিত হইয়া যখন সাধারণ লোকালয়ে প্রবেশ করে, তখনই উহা লোক-মত হইয়া দাঁড়ায়। এবং সেই খানে গিয়া, প্রসন্ন ভাব ত্যাগ করিয়া দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। আমাদের নিজের মনে যাহা আত্মগ্লানিরূপে দেখা দেয় তাহাই আমাদের স্বষ্ট দ্বিতীয় মনটিতে—অর্থাৎ লোক সাধারণের মনে, ধিক্কাররূপে আবির্ভূত হয়। ইহাই লোকমত। লোক-মত লোকের নিকট যে এত আদরনীয়, এত মধুর ইহাই তাহার কারণ। আমরা কোন ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আরও দৃঢ়নিশ্চিত হইতে পারি যদি আমাদের নিজের বিবেকবুদ্ধির অনুমোদনের সঙ্গেসঙ্গে, আমাদের স্বজাতির সাধারণ বিবেকবুদ্ধিও সেই সম্বন্ধে অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করে। লোকমতের বিরুদ্ধে কেবল একটা জিনিস আমাদিগকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে; কেবল একটা জিনিস আমাদিগকে লোকমতের উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে—উহা কি? না আমাদের বিবেকবুদ্ধির সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত সাক্ষ্য। কারণ, লোকসাধারণ কিংবা সমস্ত মানবমণ্ডলী শুধু আমাদের বাহ্য অনুষ্ঠান দেখিয়াই অগত্যা বিচার করে; পক্ষান্তরে, যাহা সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে ধ্রুবনিশ্চিত, আমরা সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা আপনাকে বিচার করি।

(ক্রমশঃ)

আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—অথচ এ ধর্ম্মের প্রচার যতটা প্রত্যাশা করা যায় তা হয় না কেন?

তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে আপনাকে সেই ধর্ম্মের উপযুক্ত করিবার জন্য যে সাধন চাই—যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহা আমাদের নাই। আমরা সে ধর্ম্মের ফললাভের জন্য আপনার হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারি নাই।

১। আমাদের আধ্যাত্মিকতার অভাব। ব্রহ্মপূজার দুই আদর্শ, এক হীনতর এক উচ্চতর আদর্শ; আমরা হীনতর আদর্শ গ্রহণ করি। হীনতর আদর্শ কি? অসীমকে সসীম ভাবে উপাসনা করা। সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা—"নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্" সেই এককে পৃথক্ ভাবে—বহু রূপে অর্চ্চনা করা সেই নিকৃষ্ট জ্ঞানের কার্য্য।

আমরা মনে করি যা দেখছি শুনছি—যা ধরতে ছুঁতে পারি তাই সত্য কিন্তু সাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা অন্যরূপ। গোড়ার কথা হচ্ছে—অদৃশ্য জগৎ—আধ্যাত্মিক জগৎ। সেই জগৎ আদি কারণ—মূল কারণ সেখান থেকে কার্য্যের উৎপত্তি। আগে অন্তরের ইচ্ছা পরে বাহিরের গতি।

র‍্যাকেলের চিত্র দেখিয়া আমরা বিমোহিত হই—তাজমহল প্রাসাদ দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করি। কালিদাসের কাব্যরসামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই। আমরা এই সকল কার্য্য দর্শন করি কিন্তু তার মূল কোথায়? মূল অধ্যাত্ম-জগতে। কাল্পনিক রাজ্য, সৌন্দর্য্যরসবোধ সে সবার আকর-স্থান।

এই যে দৃশ্যমান্ জগৎ এর মূল কারণ পরব্রহ্ম—তিনি অন্তরালে থাকিয়া রশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তাই এই জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে—তাঁর ইচ্ছাই মূলশক্তি। আমরা মোহবশতঃ দুর্ব্বলতা বশতঃ দেখিতে পাই না—আমাদের বিশ্বাসের বল নাই তাই সেই অতীন্দ্রিয় নিরাকার ঈশ্বর আমাদের জ্ঞাননেত্রে অপ্রকাশিত থাকেন।

যাঁহারা এই আদি সমাজের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা আমাদের সম্মুখে ঈশ্বরের সেই উচ্চ আদর্শ ধারণ করিতেছেন—হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সেই আদর্শ গ্রহণ কর। জীবনের পরীক্ষায় এই ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস কর—দেখিবে তোমাদের দৃষ্টান্তে কি সুফল প্রসব করিবে।

শুন মহর্ষি তাঁর আত্ম-জীবনীতে কি বলিতেছেন—

"আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় কামনা পরিতৃপ্ত হইল এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। আমি এতটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফল লাভ করিলাম। পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতাম না যে, তাঁর এত করুণা। তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাঁহাকে দেখিতে পাই, যতটুকু তাঁর কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। "যে ছেলে কত খায়, সে ছেলে তত লালায়।" হে নাথ তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আবার জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দেও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতররূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও। তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না। তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও। ইহা বলিতে বলিতে অরুণ কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃতদেহে, শূন্য হৃদয়ে, বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেমবারির অভ্যুদয়ে হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবনস্রোত বেগে চলিল,

প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেমপথের যাত্রী হইলাম, জানিলাম তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।”

২। ধর্ম্মবিষয়েও আমাদের দুই আদর্শ আছে—এক হীনতর আদর্শ, এক উচ্চতর আদর্শ। আমরা সাধারণতঃ হীনতর আদর্শই গ্রহণ করি, তাহা হইতেই আমাদের অধোগতি। হীনতর আদর্শ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম—হোম যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান। কিন্তু ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস, কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহার চরিতার্থতা হয় না। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে হোম যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে এই কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দাবাদ করিয়া উপনিষদের ঋষিরা বলিলেন

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি।

অষ্টাদশ কর্ম্মযুত এই সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম অদৃঢ়, অস্থায়ী—ইহারা কখনই শ্রেয় রূপে অভিনন্দনীয় নহে।

মনুষ্যের গন্তব্য পথ দুই, প্রেয় ও শ্রেয় —এক ভোগের পথ—অন্য যোগের পথ; এক আত্মসুখের পথ, অন্য কর্ত্তব্যসাধনের পথ। প্রেয়ের পথ সহজসেব্য, লোকেরা সেই পথে আকৃষ্ট হয়। শ্রেয়ের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কঠিন; তথাপি সেই পথে না গেলেই নয়—সেই আমাদের মুক্তির পথ। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা যদি ইহকাল পরকালের কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে শ্রেয়ঃপথের পথিক হও। সেই পথে চলিতে গেলে তোমাদের সঙ্গে যে পাথেয় চাই তাহা আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা; দয়া, নিন্দা প্রশংসা নিরপেক্ষ হইয়া ন্যায় রক্ষা—ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ, আত্মাভিমান বর্জ্জন, শত্রুর প্রতিও ক্ষমা বিতরণ, যে তোমার অনিষ্টাচরণ করে তাহারও মঙ্গলকামনা করা, অসীম করুণা—বিশ্বব্যাপী মৈত্রীভাব যাহা বুদ্ধদেব প্রচার করিয়া বেড়াইতেন—প্রেম যাহা সেই প্রীতির প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টিকে অভিষিক্ত করে;—যে প্রেমের নিকট জাতিবিচার নাই—মানুষে মানুষে পার্থক্য নাই—একতা সমতা স্বাধীনতা যাহার মূলমন্ত্র—যাহা ঘরে ঘরে বিতরণ করিবার জন্য চৈতন্যদেব মর্ত্ত্যভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

হায়! আমরা দুর্ব্বল, সেই অনন্ত প্রেমকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না; আমরা সেই উচ্চ ধর্ম্ম-মঞ্চে আরোহণ করিতে পারি নাই, যেখান হইতে মনুষ্য মাত্রকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দিতে পারি—আমরা আত্মাভিমানেই গর্ব্বিত, আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত, ব্যবসায়ীর মত কেবল লাভ-লোকসানের দিকেই দৃষ্টি করি। সে ঔদার্য্য, সে সৌহার্দ্দ্য, সে মমতা সহৃদয়তা আমাদের নাই। মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরে আমাদের বিশ্বাস নাই—ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই—আমরা অন্তরে অন্তরে পাপ-চিন্তা মলিনতা পোষণ করিতেছি—তাই আমাদের চিত্ত অশান্তির আলয়—তাই আমাদের অধোগতি—

হে পরমাত্মন্, আমাদের গতি কি হইবে?

বল দাও মোরে বল দাও
প্রাণে দাও মোর শকতি,

সকল হৃদয় লুটায়ে
তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে,
খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চিরবসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে
নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্ব ছবিতে
তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশি রবিতে
হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নানা কথা।

সমাধি।—মৃতদেহ ভস্মসাৎ করা হিন্দু জাতির সনাতন পদ্ধতি। নানা কারণে উহার উপকারিতা সন্দর্শনে ইউরোপের অনেক জাতি সমাধির পরিবর্ত্তে প্রাগুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। জর্ম্মান দেশের ১৯০৭ সালের Cremation Societyর বাৎসরিক বিবরণে প্রকাশ যে ঐ দেশে ঐ বৎসর তিন হাজার মৃত দেহ ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। ১৯০৬ সালের যতগুলি মৃতদেহ ভস্মসাৎ করা হয়, তাহা অপেক্ষা পরবর্ত্তী বৎসরে ভস্মসাতেরসংখ্যা শতকরা ৪৫ জন বাড়িয়াছে। বলা বাহুল্য খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের আপত্তি সত্বেও ভস্মসাৎ প্রথা ক্রমিকই তদ্দেশে বদ্ধমূল হইতেছে।

রাজনৈতিক। এ বৎসর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন পাবনায় হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা ভাবের মৌলিকতার ও ভাষার বিশেষত্বে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিজ ঐকান্তিকতায় বিভিন্ন দলের ভিতরে ঐক্যস্থাপনে অনেকদূর কৃতকার্য্য হন। বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতাদান রাজনৈতিক এরূপ বিরাট ব্যাপারে নূতন কাণ্ড বলিতে হইবে।

সামাজিক। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে নিজ বালবিধবা কন্যার শুভবিবাহ বিগত ১২ই ফাল্গুন সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মতে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হয়।

আনুগত্য। পাবনা প্রাদেশিক সমিতির অন্যতম নেতা খ্যাতনামা বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতার একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন "In Justice, Justice above every thing else, our loylty had it growth" আমাদের রাজভক্তির উৎস কোথায়—না সর্ব্বোপরি রাজার ন্যায় বিচারে। ধর্ম্মরাজ্যেও এই উক্তির বিশেষ সর্থকতা আছে। ঈশ্বরকে যদি আমরা ন্যায়বান রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি কিছুতেই তাঁহার দিকে প্রধাবিত হইতে পারিত না। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে—তাঁহার অক্ষয় ন্যায়ের প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস, তাই তাঁহার উপর আমাদের অবিচলিত নির্ভর। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্যের মূলে তাঁহার অক্ষয় ন্যায় সম্বন্ধে আমাদের স্থিরবিশ্বাস সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই জাগিতেছে।

বিলাতে মাঘোৎসব। ১লা ফেব্রুয়ারির খৃষ্টিয়ান লাইফ (Christian life)নামক পত্রে প্রকাশ যে লণ্ডন Essex Hall এসেক্স হলে—ব্রাহ্মসমাজের ৭৮ তম সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৬০ জন ভারতবাসীও কয়েকজন অনুরাগী সাহেব মিলিত হন। কয়েকটি ভারতীয় মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাসহ সুন্দর হিন্দু-পরিচ্ছদে আসিয়া সভাতলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ডাক্তার ঘোষ ১২ই মাঘ রবিবার বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। ১১ই মাঘ বৈকালে Rev George Critchley B. A. উপাসনা কার্য্য করেন। সকলধর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। তিনি হাফেজের কথায় বলেন "সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক; প্রতি মনুষ্যই তাহার প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; এই পৃথিবীই সেই প্রেমের মন্দির; তবে কেন আর মসজিদ ও গির্জ্জা লইয়া অকারণ তর্ক বিতর্ক করিতেছ।" উহার পরে ডাক্তার ঘোষের সভাপতিত্বে Rev John Page Hopps ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উহার পরে দুই একজন মহিলায় ক্ষুদ্র বক্তৃতান্তে বাঙ্গালা সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়া যায়।